পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

(ভ্রমণ কাহিনী)

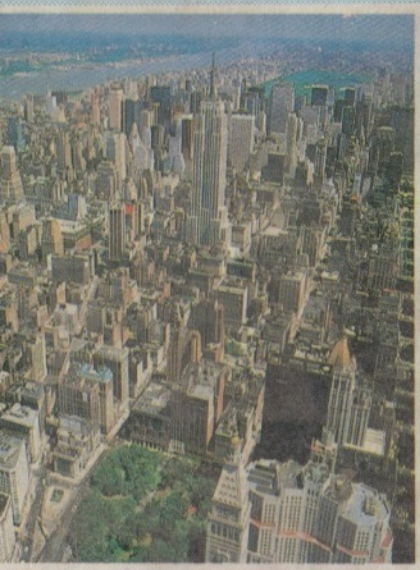

সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

(ভ্রমণকাহিনী)

'হাজ্জ মিন্ ফজ্‌লে রাব্বী'।

সরদার মোঃ আবদুল হামিদ
(অধ্যক্ষ, পাবনা ইসলামিয়া কলেজ)
পাবনা, বাংলাদেশ।

মূল্য ১২৫/- টাকা।

প্রকাশক ঃ

হাসান মাহমুদ (সোহেল)
ও
এস, এম, আনিসুজ্জামান
'সরদার ভবন'
পোঃ ও গ্রাম খুবজীপুর, জেলা নাটোর,
বাংলাদেশ।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৪
১৮ই পৌষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ
১৮ই রজব, ১৪১৪ হিজরী

মুদ্রনে ঃ আলহাজ্ব মোঃ আবুল হোসেন
মডার্ণ আর্ট প্রেস, পাবনা।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ও পরিকল্পনায় ঃ জনাব মোস্তফা হারুণ
সৌখিন প্রকাশনী ও কম্পিউটার,
পলওয়েল সুপার মার্কেট (৩য় তলা, কক্ষ—৫১)
ঢাকা—১০০০

কভারের ছবি ঃ (ডানে) বাকিংহাম প্যালেস, লণ্ডন,
(বামে) নিউইয়র্ক শহরের একাংশ (ইউ, এস, এ,)
(শেষ পৃষ্ঠায়) নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ আমাদের দেশ হোম, পৈলানপুর, পাবনা, (বাংলাদেশ)।

বিঃ দ্রঃ লেখকের অনুমতিক্রমে অথবা বিনা অনুমতিতে যে কেহ এই গ্রন্থ ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করতে পারবেন। এক কপি অনূদিত-গ্রন্থ বান্ছনীয়।

PASCHATYER BOISHISTA
(Travel-Book)
Author : SARDER M. A. HAMID. Principal, Pabna Islamia College, Pabna (Bangladesh).

Date of Publication : 1st January, 1994.

To be had of : Amader Desh Home
Poilanpur, Pabna (Bangladesh)

Price for U. S. A. $ 10·00
,, U. K. £ 6·00
& equivalent sum for other foreign countries.

N. B. Anybody with or without permission of the Author may retranslate the book into any language. A copy of re-translated book will be highly appreciated.

উৎসর্গ

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌ ও পাশ্চাত্যের জনগণকে

—গ্রন্থকার

উপহার

সূচী-পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আশীর্বাণী—দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	৬
২।	অভিমত—ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	৭
৩।	ভূমিকা—মওলানা মুহিউদ্দীন খান	৯
৪।	প্রাকবাক্—	১
৫।	প্রসঙ্গকথা	১০
৬।	লণ্ডনে দুই হপ্তা	
	(ব্যারিষ্টার আব্বাসের মৃত্যুবার্ষিকী ২১, ইসলাম ও মুসলিম ২৩, ত্রাণসংস্থা, শিক্ষা সম্পর্কে ১৪, জনসংখ্যা, সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা, আয়কর ২৫, মাথাপিছু আয়, রাজনীতি সমাচার ২৬, বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রভাব ২৭)	
৭।	আমেরিকায় তিন মাস	২৯
	(ফিলাডেলফিয়া ৩২, হারশী চকলেট ৩৪, হ্যারিসবার্গ ৩৬, গেটিসবার্গ ৩৮, লিংকন জীবনী ৪১, ওয়াশিংটন ডি, সি, ৪৪, নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা ৪৭, মার্টিন বেক থিয়েটার ৬২, প্রাক্তন ছাত্রীর সাক্ষাৎ ৬৩, ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি ৬৫)	
৮।	নিউইয়র্কে কয়েক দিন	৪১
	(জাতিসংঘ ৫০, ভেরাজানা ব্রীজ ৫৭, সেন্ট্রাল পার্ক ৫৯, আর্ট মিউজিয়াম ৬০, এলিস দ্বীপ ৬৭, নিউইয়র্কের শেষের দিনগুলো ৬৯)	
৯।	ফ্লোরিডায় এক মাস বাইশ দিন।	৭০
	(ডিজনী ওয়ার্ল্ড ৭৩, সী-ওয়ার্ল্ড, ম্যাজিক কিংডম ৭৪, ইউ-নিভারস্যাল ষ্টুডিও ৭৫, নায়েগ্রা জলপ্রপাত ৭৬, স্কাইক্রেপার ৭৭, বুশগার্ডেন ৭৮, গেটরল্যাণ্ড ৮০, ক্রোকোডাইল জু ৮১, কেনেডী স্পেস সেন্টার ৮২, আতিথেয়তা ৮৩)	
১০।	হারানো ব্যাগ সমাচার	৮৭
১১।	আমেরিকায় মুসলমান	৮৯
	(ইসলাম পরিচিতি ৯৪, ধর্ম পালনের গুরুত্ব, উপসংহার ৮৯, বিশ্ব-মুসলিম সংস্থা ১০০)	
১২।	আমেরিকায় বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী	১০১
	(বাংলা পত্রপত্রিকা ১০২, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ১০৩)	
১৩।	আমেরিকায় বর্ণবাদ দাঙ্গাহাঙ্গামা	১০৪
১৪।	কৃষ্ণাঙ্গগণ কেন অপরাধ প্রবণ ?	১০৬

বিষয় পৃষ্ঠা

১৫। আমেরিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০২
(প্রাকৃতিক বিপর্যয় ১২৬, বহিরাগত পুনর্বাসন ১২৭, গুপ্ত সংস্থা, বিশ্বশক্তি বলয় ১২৮, রাজনৈতিক গোষ্ঠি ১২৯, এক নজরে নিউইয়র্ক ১০৩, যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী প্রভাব, বিবিধ তথ্য ১৩১)
১৬। পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য ১৩৪
(যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৩৫, ঘুষপ্রথা, সত্যনিষ্ঠা ১৪১, স্পষ্ট বাদিতা, সৌজন্য ১৪২, জাতীয়তাবোধ ১৪৪, শ্রমের মর্যাদা, ঋণদান ১৪৫, পরিবেশ দুষণ ১৪৬, রাজনীতি, নির্মল বাতাস ১৪৭, কৃষি খামার ১৪৮, শিল্পকারখানা, গ্রাম ও শহর, সংস্কৃতি ১৪৯, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ১৫১, শিক্ষাব্যবস্থা ১৫২, নারীর মর্যাদা, শ্রমজীবি ১৫৩, ঝি-চাকর, অর্থনৈতিক মুক্তি ১৫৫, দারিদ্র্যসীমা ১৫৬, ক্রীড়াচর্চা ১৫৭, বিদুৎ সরবরাহ, বিক্রয় কর, সার্ভিস চার্জ, চুলছাটা ১৫৮, মদ্যপান ১৫৯, মাদক সেবন ১৬০, ধূমপান, খাদ্যের অপচয়, পৌত্তলিকতা ১৬১, অহমিকা, বিক্ষোভ মিছিল, কুকুরপ্রীতি ১৬২, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ১৬৩, যৌতুক প্রথা, গহনা ব্যবহার ১৬৪, অপরাধ প্রবণতা, মৃত্যুকর, চাইল্ডকেয়ার সেন্টার, বৃদ্ধ মাতাপিতা ১৬৫, গার্লফেণ্ড ১৬৬, পৃথক বাসের সুবিধা, চুম্বনপ্রথা, পতিতাবৃত্তি ১৬৭, গর্ভপাত ১৬৮, যৌন অনাচার ১৬৯,আত্মহত্যা ১৭০, সামাজিক ব্যাধি, শেষকথা ১৭২)
১৭। দেশে ফেরার পালা ১৭৮
(আরব আমিরাত ১৭৯, হিথ্রো এয়ার পোর্টে ১৮৩)

আবুজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, বর্তমানে
বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক, বিশিষ্ট দার্শনিক
আল্‌হাজ্ব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেবের

আশীর্বাণী

'পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্যের' লেখক জনাব এম, এ, হামিদের জন্ম নাটোর জেলার খুবজীপুরে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৫২ সালে) রসায়ন-শাস্ত্রে এম, এস-সি, পাশ ক'রে কয়েকটি কলেজে (সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, পাবনা এড্‌ওয়ার্ড কলেজ, যশোর এম, এম, কলেজ, পাঁচবিবি মহীপুর হাজী মহসীন কলেজ, বগুড়া আঃ হক কলেজ ও এম, আর, মহিলা কলেজ এবং খুবজীপুর এম, হক কলেজে) অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৮ সালে পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ড এবং ১৯৯১ সালে বর্তমান জগতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানজগতে উন্নত দেশ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন। তথায় ভ্রমণকালে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে তার ভক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। কী অপূর্ব দেশ! নানা জাতের ও বর্ণের লোক তথায় রয়েছে। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছেন। তাদের বহুবিধ উন্নত ও প্রশংসনীয় বিষয় বর্ণনার সঙ্গে তিনি তাদের নিন্দনীয় দিকসমূহ যেমন— বর্ণবিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, সমাজ জীবনে নানা কেলেঙ্কারীর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

এ-পুস্তকে তিনি আমেরিকার যে-সব বিষয় অকপটচিত্তে বর্ণনা করেছেন, তাতে পুস্তকখানাকে 'আমেরিকার দর্পন' বলা যায়। আমাদের দেশের যে-সব লোক আমেরিকায় শিক্ষা লাভের জন্য বা কর্মসংস্থানের জন্য যান, তারা এ-পুস্তক পাঠে আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জান্‌তে পারবেন। এজন্য বইটিকে একখানা গাইড বলে গণ্য করা যেতে পারে।

বইখানা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে বলে আমাদের ধারণা। লেখকের প্রয়াস সফল হয়েছে মনে ক'রে আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবাদী। তার দীর্ঘ জীবনের জন্য দোয়া করি এবং আমাদের জাতীয় জীবনে তিনি একজন গাইড হিসাবে অমর হয়ে থাকুন—এ কামনা করি।

২-১১-৯৩ ইং

অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, এম, এ, (ঢাকা), পি-এইচ, ডি, ভাষাতত্ত্ব (লণ্ডন), ১২৯, কলাবাগান, মীরপুর রোড, ঢাকা থেকে লিখেছেন ঃ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, লেখক ও সমাজসেবক, আমার ভ্রাতৃপ্রতীম অধ্যক্ষ এম, এ, হামিদ লিখিত 'পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থখানি আগ্রহ সহকারে পড়লাম। পড়ে আনন্দিত হ'লাম। দু'শতাধিক পৃষ্ঠার এ-বইখানিতে গ্রন্থকার পরম যত্নে তাঁর ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আন্তরিকতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। চলার পথে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি থেকে সামান্য বস্তুও বাদ পড়েনি। তাঁর অন্তদৃষ্টি সব কিছুকে নতুন ও জীবন্ত ক'রে তুলেছে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক তথা পাশ্চাত্যের বড় বড় শহরগুলি ও সে-সবের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাপীঠ, পাঠাগার, পার্ক, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সকল স্থানে বিভিন্ন বিষয় তিনি চোখ মেলে দেখেছেন এবং তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথা অকপটে বলেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল পাশ্চাত্যে মুসলিম উম্মার অবস্থা ও অবস্থান। তাঁর পিপাসু দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনধারা, চাল চলন, রীতি-নীতি, সংস্কার, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে অকপট-আলোচনা গ্রন্থখানিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

এ-শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর অধিকারী তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে অনেক চমকপ্রদ কথাবার্তা বলেছেন ; যেমন—ক্যালে বন্দরে বড় বড় হরফে 'পিয়ার্স' সাবানের বিজ্ঞপ্তি দূর থেকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, এটি বন্দর নগরীর নাম। তারপর সে-দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় এদেশ ও সেদেশের তুলনা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

অধ্যক্ষ আবদুল হামিদও অবাক বিস্ময়ে সকল কিছু দেখেছেন, তাঁর মনের কোণে নোট করেছেন এবং সে-সকল মনোজ্ঞ ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজ, সেখানে আমাদের দেশের লোকদের জীবন ও জীবিকা তাদের জীবনধারার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখিয়েছেন। সে-সকল দেশের লোকদের চরিত্র, কর্মস্পৃহা, দেশাত্মবোধ, আন্তরিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অতীত ও বর্তমানের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, অর্থ ও রাজনীতি প্রভৃতিক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মতৎপরতা ও অবদান তাঁকে মুগ্ধ

করেছে। সমাজের সর্বত্র তিনি সময়োপযোগী পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করেছেন; লক্ষ্য করেছেন-কীভাবে নিত্য বিবর্তিত হ'য়ে সে-দেশের সভ্যতা তিলে তিলে নতুন রূপ লাভ করেছে। শেষের দিকে প্রায় দুই কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্যের সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানীদের আগ্রহ নিবৃত্তি করতে সমর্থ হবে। গল্প বলার মত ঝরঝরে ভাষায় তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যেভাবে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনীমূলক সাহিত্যে 'পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য' নিঃসন্দেহে একখানি মূল্যবান সংযোজন। আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থকারকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কাজী দীন মুহম্মদ ৭.১১.৭৩

ভূমিকা

বিশ্বজাহান ভ্রমণ ক'রে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার হুকুম পবিত্র কোরআনে রয়েছে। বলা হয়েছে, 'ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং প্রত্যক্ষ কর—মিথ্যাচারীদের কি পরিণতি হয়েছে।'

জনাব অধ্যক্ষ এম, এ, হামিদ একজন জ্ঞানতাপস সুলেখক। জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের সাধনায় তাঁর জীবনের প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয়েছে। পরিণত বয়সে তিনি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে এসেছেন ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের এক বিরাট অংশ। তাঁর সে-পর্যবেক্ষণের ফসল পরিবেশন করেছেন 'পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য' নামক বইটিতে। তিনি ভ্রমণ ক'রে এসেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকগুলি শহর জনপদ। এতে তিনি যা দেখেছেন, তা সহজ সরলভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর এদেখা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক মুগ্ধতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেখা গেছে। বস্তুতঃ এটা অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী কিছু নয়। কারণ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এ ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীত রুচি, বিশ্বাস ও জীবনবোধের দু'টি দিগন্ত। এর এক অংশে আছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার হাহাকার, আর অন্য অংশে উপ্‌চেপড়া প্রাচুর্যের সমারোহ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই হাতাতে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের কেউ পাশ্চাত্যের অকল্পনীয় সমৃদ্ধির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করলে, তার চোখ কিছুটা ঝলসে উঠবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এটাই কি বর্তমান আলো ঝলমল পাশ্চাত্যের প্রকৃত রূপ? মোটেও না। কেননা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির যত শাখা আছে, তার প্রায় সব কয়টির আঁতুরঘর আজকের অনুন্নত রিক্ত প্রাচ্যভূমি। মানুষের উদ্ভব হয়েছে যেমন প্রাচ্যে, তেমনি জীবনের শালীনতা, ধর্ম, মানবতা প্রভৃতি উন্নত মূল্য-বোধের আদি শিক্ষাগারও প্রাচ্যের এ-ভূখণ্ড। কিন্তু তারপরও কেন আজ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও অর্থবিত্তে এত উন্নত? এ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করার জন্য খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। মাত্র পাঁচ শ' বছর পিছনে গেলেই দেখা যাবে, গোটা ইউরোপের মানুষ অসভ্য বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

প্রখ্যাত বৃটিশ পার্লামেন্টারিয়ান স্যার এডমণ্ড বার্ক বলেছেন,—'ষোড়শ শতাব্দীতেও ইউরোপের মানুষ মাছ-মাংস বিধিমত পাক ক'রে খেতে জানতোনা, বস্ত্র বয়নের কৌশল ছিল তাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাত।'

বর্তমান আমেরিকার বয়সই তো মাত্র পাঁচ-ছয় শ' বছর। ইউরোপের অসভ্য বর্বরেরা জীবিকার তাগিদে দলে দলে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল।

এহেন ইউরোপ-আমেরিকাকে সভ্যতার আলো দিয়েছে মুসলিম-প্রাচ্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ লুটেরার দল মুসলিম-বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ

লুণ্ঠন ক'রে সে-লুণ্ঠনের অর্থ দ্বারাই 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের' ভিত্তি স্থাপন করেছিল। মোটকথা, মুসলিম-প্রাচ্য যখন জাগতিক উন্নতির একটা চরম পর্যায়ে উপনীত হ'য়ে বিলাসী জীবনের অভিশাপে জড়িয়ে গেল, তখনই ভুখা-নাঙ্গা সভ্যতার পরশবর্জিত ইউরোপীয় জাতিগুলি একের পর এক মুসলিম প্রাচ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রায় দু'শ বছরকাল প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এবং তারপর পরোক্ষ শোষণের অবিরাম প্রবাহই যে আজ প্রাচ্যকে রক্তশূণ্য কংকালে পরিণত ক'রে পাশ্চাত্যের গায়-গতরে চেকনাই বর্দ্ধিত করেছে—এ তথ্য গবেষণার বিষয় নয়, একেবারে সাদামাটা বাস্তবতা।

সুতরাং প্রাচ্যের যে কোন মুগ্ধ দর্শকের উচিত পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো সমৃদ্ধি দেখে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে খোঁজ করা, ওরা আমাদের কতটুকু রক্ত শোষণ ক'রে এসব নির্মাণ করেছে।

যা হোক জনাব অধ্যক্ষ এম, এ, হামিদের পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্মতা আছে। আছে দেশগুলির সাধারণ জীবনযাত্রা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠককে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার মত পঠণ-সামগ্রী। বইটি পাঠক-নন্দিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

৩৮/২, বাংলা বাজার
ঢাকা—১১০০ (বাংলাদেশ)
১০/১১/৯৩

(মওলানা মুহিউদ্দীন খান)
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
মাসিক মদীনা, ঢাকা।

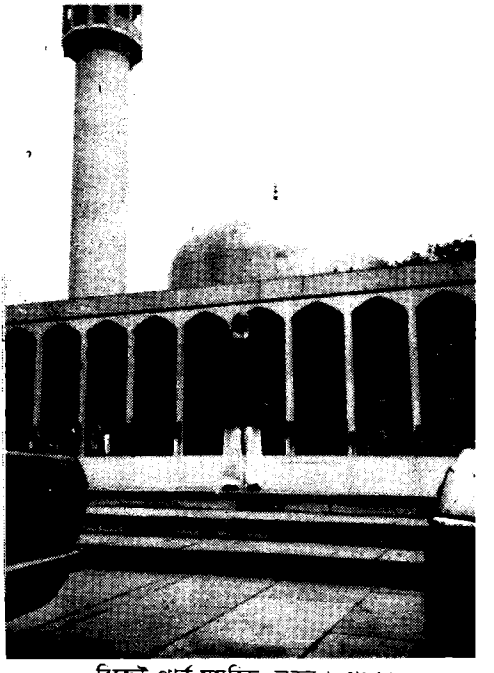

রিজেন্ট পার্ক মসজিদ, লন্ডন। পৃঃ ১৬

অষ্টোরিয়া পার্কে ঈদের জামাত, নিউইর্য়ক।

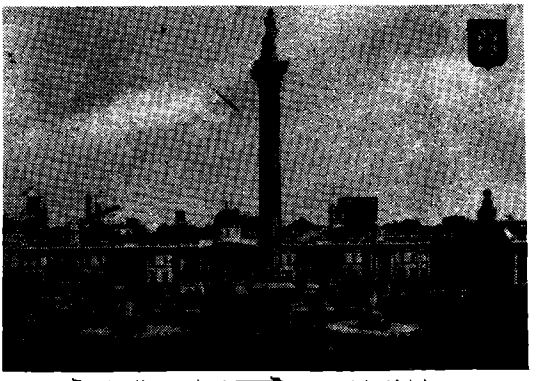

ট্রাফালগার স্কয়ার মনুমেন্ট, লন্ডন (পৃঃ ১৯)।

বিগবিন, লন্ডন (পৃঃ ১৯)।

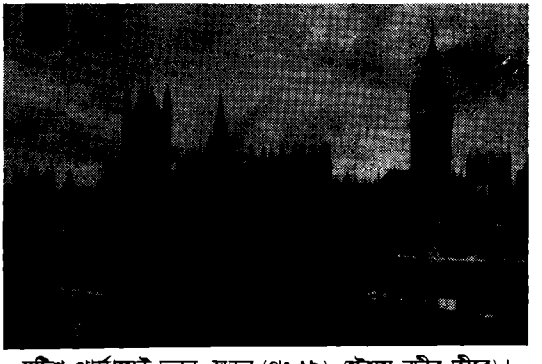

বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবন, লন্ডন (পৃঃ ১৯) (টেমস্ নদীর তীরে)।

গ্রাক-বাক্

আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু কোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন—'সিরূ ফীল্ আরদে'—তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। তাঁর অপরূপ সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ অপরিহার্য। কত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী! কত রকমের মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফল তিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর বুকে। কত বর্ণের, কত চেহারার মানুষ বাস করে বিভিন্ন দেশে; কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের চেহারার হুবহু মিল কোথাও দেখা যায় না। প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত পৃথক। পরিচিত লোকের চেহারা না দেখে শুধু কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যায় সে কে। বিভিন্ন দেশে হাজার রকম বৃক্ষলতা ও প্রাণী ছড়িয়ে আছে বনেজঙ্গলে, চিড়িয়াখানায়, পথে প্রান্তরে, পাহাড় পর্বতে ও সাগর বক্ষে। এমন বহু প্রজাতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে যা খালিচোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা কঠিন। তাদের জটিল সৃষ্টিকৌশল ও বংশ বিস্তারের বিষয় চিন্তা করলে কূল কিনারা মেলেনা। কে তাদের সৃষ্টি করেছেন? কে তাদের আহার যোগান? কার দয়ায়, কি খেয়ে তারা বেঁচে থাকে?

বিভিন্ন প্রকার ফুল শুধু দেখতেই বিভিন্ন রূপ নয়, তাদের গন্ধও বিভিন্ন। প্রত্যেক ফুলের গন্ধ ও ফলের স্বাদ আলাদা। কে করেছে এসব সৃষ্টি? নিশ্চয়ই কোন মানুষের এতে হাত নেই। বিশ্বের সকল বৈজ্ঞানিক মিলেও একটি দুব্বা ঘাসের সবুজ পাতা বা প্রাণবন্ত ফুল, ফল, উদ্ভিদ, প্রাণী সৃষ্টি করতে পারবেন না। সকল বৈজ্ঞানিকের মহাবিজ্ঞানী একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু। তাঁর ইচ্ছাতেই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে; আবার একদিন ধ্বংসও হবে। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে আমরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে চলি। ক্ষমতার দাপটে ধরাকে সরাজ্ঞান করি; স্রষ্টার ও সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে থাকি।

একবার ভেবে দেখা উচিত নয় কি—তুমি যত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সম্পদশালীই হও না কেন, স্রষ্টার অমোঘ বিধান—মৃত্যু রোধ করতে পারবে না। মৃত্যুর হাত থেকে যেমন পরিত্রাণ নাই, তেমনি পরকালের বিচারের হাত থেকেও নিস্তার নেই। এ বিশ্বাস যাদের মধ্যে নাই তারা দুনিয়ার বুকে সব রকম অপকর্ম, অন্যায় ও সন্ত্রাস করতে পারে। এতে তাদের বিবেক বাধা দেয় না। স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসী লোকদের দ্বারাই সৃষ্টি হয় যত অশান্তি ও অনাচার। কেননা তারা ভুলেও ভাবেনা পরকালের কথা।

স্রষ্টার অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে চিন্তা করো—সামান্য রক্ত-বিন্দু হতে কিরূপে মাংসপিণ্ড ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট মানবশিশু জন্ম লাভ করে। দেহে কিরূপে হাড়ের সৃষ্টি হয়—ভাবতে পারো কি? শিশুসন্তান চিরকাল শিশুই থাকে না, ক্রমে সে কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করে, পরিশেষে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। এ পরিবর্তন কারো নিজের ইচ্ছায় হয় না; পিতামাতা বা অপর কারো এতে হাত নেই। সবই হয় স্রষ্টার বিধানে।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদনদী, পর্বত, সাগর, অরণ্য, বারিধারা, খাদ্য, পানি, বায়ু—এ সব কার দান? প্রাণহীন মাটির বুকে সোনার ফসল, অগণিত খনিজ সম্পদ, বিভিন্ন রকম ফুল-ফল কে জন্মান? হয়তো বল্‌বে—প্রকৃতির দান। কিন্তু প্রকৃতির মালিক ও নিয়ন্ত্রা কে?

একবার চিন্তা করো তোমার দেহের গঠন ও আত্মা সম্পর্কে। নিজেকে নিজে চেনার চেষ্টা করো, তা' হলেই স্রষ্টাকে চিন্‌তে পারবে। 'মান আরাফা নাফ্‌ছাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' যিনি নিজের আত্মাকে চিনতে পারেন, তিনি তাঁর প্রভুকে চিনতে সক্ষম। কত কলকব্জা, যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত আছে প্রতিটি প্রাণীদেহে—ভাবতে অবাক লাগে। অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহের গঠন সৌকর্যও একইরূপ জটিল। যার যেখানে যা প্রয়োজন, মহান স্রষ্টা নিখুঁতভাবে দিয়ে রেখেছেন।

আমরা কিভাবে কার ইচ্ছায় বেঁচে আছি ভাবতে গেলে কূল কিনারা মেলে না।

যিনি আমাদের দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কথা ভাবা উচিৎ নয় কি? তাঁর আদেশ নিষেধ আমাদের জন্য শিরোধার্য নয় কি? একদিন তাঁর কাছে যেতে হবে এবং পরকালে মহাবিচারের সম্মুখীন হতে হবে—এটা বিশ্বাস করলে তাঁর আইন মানা হয় না কেন? সরকারের আইন না মানলে শাস্তি পেতে হয়,—অবশ্য ফাঁকি দিয়ে অনেকেই রেহাই পায়; কিন্তু অন্যায় ক'রে মহাবিচারের শাস্তির হাত হ'তে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

পৃথিবীতে আমরা কত রকমের ট্যাক্স দিয়ে থাকি, যেমন রোড ট্যাক্স, সেলট্যাক্স, ইন্‌কাম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, ইউনিয়ন ট্যাক্স ইত্যাদি; কিন্তু আল্লাহর দান—সূর্যের তাপ, আলো, বাতাস, বৃষ্টি, বর্ষা—এসবের ট্যাক্স কে দেয়? কেউ-ই দেয় না বলা ঠিক হবে না। যারা বোঝে এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে, তারা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর কাঙ্খিত ট্যাক্স পরিশোধ করেন—অর্থাৎ তাঁর হুকুম পূর্ণভাবে পালন করেন।

স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার যন্ত্রই হ'ল মানব অন্তর। আমরা আপন সন্তানদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সদাসর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করি।

কারো সন্তান সন্ন্যাসী হোক বা আগুনে পুড়ুক—এটা কোন পিতামাতাই চায় না। সন্তানকে পরকালের শাস্তি হতে রক্ষা করতে হলে শিশুকাল হতেই তাদের সৎভাবে গড়ে তুলতে হবে। বাল্যকালে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তার চরিত্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে না পারলে, যে কোন অসৎ প্রলোভন তাকে বশীভূত করতে পারবে কিন্তু সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে পারবে না। তাঁরা যে দেশে যে পরিবেশেই থাকুন না কেন, কখনো বিপথগামী হন না। ধর্মহীন ব্যক্তির পক্ষে হেন কাজ নেই, যা সে করতে পারে না। কবির ভাষায়ঃ

মায়াবিনী এ-সংসারে যে যেমন কাজ করে,
সে তেমন ফল তার পায়।
রোপিলে তেঁতুল বৃক্ষ, দেয় তা' তেঁতুল ফল,
সুমিষ্ঠ আম্রফল দেয় না কখনো।
আপন সন্তান তরে, সুশিক্ষা না দিলে পরে
সে-সন্তান যম হয়—জানিবে নিশ্চয়।

সন্তানকে আদর্শ চরিত্রবান ক'রে গড়ে তুলতে হলে বাল্যকাল হ'তেই তাকে ধর্ম অনুশীলনে বাধ্য করতে হবে। অন্যথায় আদর্শ মানবীয় গুণাবলী তার মধ্যে জন্মলাভ করতে পারবে না।

আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক কিছুই দেখা যায় না, যেমন—স্বাদ, গন্ধ, আনন্দ, ব্যথা, বিদ্যুৎ, বায়ু ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও আত্মা দ্বারা এ-সব উপলব্ধি করা যায়। তেমনি বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধার মহাসুন্দর বিশ্ব-প্রভুকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। সেজন্য সাধনার মাধ্যমে হৃদয় তৈরী করা প্রয়োজন। অন্ধ ব্যক্তির নিকট যেমন রাত আর দিন একই সমান, ঠিক তেমনি ধর্মান্ধ আত্মার নিকটাস্রষ্টার মহব্বতে অন্তর আলোকিত না হ'লে, সে অন্তরে কোনদিনও আল্লাহর নূর প্রতিভাত হতে পারে না। আমার আব্বাজান বলতেন—'তোরা সিনেমায় কী দেখিস? আল্লাহ্‌র দুনিয়াটাই ত' সর্বোত্তম সিনেমা,—সবচেয়ে বড় শিক্ষাক্ষেত্র। এখানে শেখার শেষ নাই।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলী' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

কে এই 'তুমি'? নিশ্চয়ই তিনি আমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিচার-দিনের মালিক। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা পৃথিবীর বুকে এসেছি, বেঁচে আছি, আবার একদিন শেষ বিদায় গ্রহণ করবো। সীমাহীন তাঁর ক্ষমতা ও কুদরত।

আমরা মানবতৈরী ব্রীজ, সাবওয়ে, টানেল বা গগনচুম্বী অট্টালিকা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হই। কিন্তু স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমাদের মনে কেন চিন্তার উদ্রেক হয় না ?

কোরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন রয়েছে।' —সূরা আল্ ইমরাণ, ১৯০ আয়াত।

এক আল্লাহ্‌ সমগ্র সৃষ্টির মালিক। তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে তাঁকে জানা অত্যন্ত সহজ। তিনি আমাদের মধ্যে যে হৃদয় দিয়েছেন, তাই কি আমরা চিনি বা দেখেছি ? দেখি নাই ; কিন্তু অনুভূতি দ্বারা বোঝা যায় যে, হৃদয় বলে একটা কিছু আমাদের মধ্যে আছে। হৃদয় দিয়ে যেমন অপরের হৃদয়কে বোঝা যায়, তেমনি একমাত্র হৃদয়ই স্রষ্টাকে বুঝতে পারে। তিনি সব সময় আমাদের হৃদয় জুড়েই থাকেন। আমরা যাকে হৃদয়হীন বলি, তার মধ্যেও হৃদয় আছে। কিন্তু তার হৃদয় অন্ধ। স্রষ্টাকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই সে স্রষ্টার সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ না ক'রে চলে বিপথে।

কারো কঠিন কথায় বা দুর্ব্যবহারে হৃদয়ে ব্যথা লাগে, চোখে কান্না আসে ; আবার অনেকের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার হৃদয় স্পর্শ করে, নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়। বিশ্বের বুকে এমন বহু কিছু আছে, যা দেখে অন্তর পুলকিত হয়, আবার অনেক কিছু দেখে মনে দুঃখ লাগে, হৃদয় বিষণ্ণ হয়।

মানুষের রক্তের সম্পর্কই একমাত্র আত্মীয়তার মাপকাঠি নয়। একের সঙ্গে অপরের আত্মার সম্পর্কই প্রকৃত আত্মীয়তা। অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠতার ফলে গড়ে উঠে আত্মীয়তা। এভাবেই পর আপন হয়। তুলতে পারে না একে অপরকে। অন্যদিকে নিজের ঘনিষ্ঠ আপনজনও পর হ'য়ে যায়, যদি তার সঙ্গে না থাকে যোগাযোগ বা সম্পর্ক।

বিশ্বজোড়া সমগ্র মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তা' হ'ল মানব সম্প্রদায়। তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সবাই বিশ্বপ্রভু একমাত্র স্রষ্টার পরিবারভুক্ত। সে-পরিবারকে বলা যায় বিশ্ব পরিবার। মানব ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ একই পরিবারের সদস্য। আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন জগৎ আবিষ্কৃত হ'লে, তা-ও একই সৃষ্টিকর্তার পরিচালনাধীন ও পরিবারভুক্ত থাকবে। তাঁর সৃষ্টিতে স্বার্থের সংঘাত বা হানাহানি নেই। তাঁর অমোঘ বিধান মত চলছে সবকিছু—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তথা বিশ্বজগৎ। বিশ্বের সকল মানব একই বিশ্বপরিবারের সদস্য ; পরস্পর ভাই ভাই—একথা মনে

রাখলে আমাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, হিংসা, হানাহানি মাথাচাড়া দিতে পারে না। বরং দেশে দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে গড়ে উঠবে সৌহার্দ ও মমত্ববোধ।

বিদেশ ভ্রমণকালে বোঝা যায় ভিনদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে হৃদয়ের সজীব স্পর্শ ও আন্তরিকতা। যাকে শুধু ভদ্রতা বলে খাট করা চলেনা। সবাই একই বিশ্বপিতার সন্তান—এ ধারণা বিদেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে জন্ম লাভ করে। ফলে সমগ্র মানব জাতি ভাই ভাই—এ কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা সহজ হয়। প্রতিটি মানব একই সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বেচ্ছায় বিনা প্রয়োজনে নিজের অঙ্গচ্ছেদ করতে চায়—এমন বোকা পৃথিবীতে কেউ আছে কি? না থাকলে, মানব সমাজে কেন থাকবে যুদ্ধ, হানাহানি, খুনাখুনি ও প্রবঞ্চনা?

সমগ্র বিশ্ব একটি ফুল স্বরূপ। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, মাকড়সা বিষ সংগ্রহ করে, অথচ ভ্রমর কিছুই পায়না। তেমনি বিশ্বের যে দেশেই যাওনা কেন, ভালমন্দ উভয়ই দৃষ্টিগোচর হবে। প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি মৌমাছির ন্যায় বিদেশের ভালটাই গ্রহণ করেন এবং মন্দ বর্জন করেন। তা' না ক'রে যারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে অপসংস্কৃতি গ্রহণ এবং ইয়াংকী চাল চলনে অভ্যস্ত হ'য়ে অহমিকা প্রকাশ করে, তারা মাকড়সার ন্যায় বিষ সংগ্রহ করে। বিদেশ সফরকালে উন্মুক্ত দৃষ্টি ও অন্তঃকরণ দিয়ে অনুধাবন করতে হবে—কিরূপে তাঁরা তাঁদের দেশকে উন্নত করতে এবং বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের গুণাবলী গ্রহণীয় এবং বদ স্বভাব বর্জনীয়।

দেশ বিদেশ ভ্রমণকে 'শিক্ষা সফর' বা শিক্ষার অঙ্গ জ্ঞান করা উচিত। পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে দেখে শেখা অনেক বেশী বাস্তব, হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিদেশ ভ্রমণ হৃদয়কে প্রশস্ত ও উদার করে, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতা গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রমণ সৃষ্টি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মহব্বত সৃষ্টির মাধ্যমেই গড়ে তোলা সম্ভব বিশ্বপরিবার। তা' গড়ে উঠবেও একদিন। কেননা মানুষ বর্বরতার যুগ পেরিয়ে আজ আলোর পথের দিশারী। স্রষ্টার নূরের আলোকে তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অবশ্যই একদিন দূরীভূত হবে। তখন তারা বুঝতে সক্ষম হবে—সত্য মিথ্যা, আলো আঁধার, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য। দুনিয়ার বুকে ভুল পথে চলে কেউ শান্তি পেতে পারে না। বরং ভুলের মাশুল—শাস্তি তার জন্য অবধারিত। পরকালের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা বহুগুণ ভয়াবহ। একথা ধর্মশাস্ত্র হতে জানা যায়।

মানবদেহ ধ্বংসশীল। মৃত্যুর পর দেহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও আত্মা থাকে অমর। আত্মার উপর বর্তাবে পরকালের আজাব। আমরা অনেক সময় স্বপ্নে দেখি—বাঘে বা সাপে তাড়া করেছে, প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছি। ফলে

ঘুমঘোরে অবচেতন দেহের মধ্যে আত্মার ধুকধুকি শুরু হয়। শরীর ঘেমে যায়। এটা আত্মার উপর শাস্তি নয় কি? অপর দিকে, স্বপ্নে আনন্দদায়ক কোন ঘটনা দেখলে স্বভাবতঃই মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে।

আল্লাহ্‌র বিধানে মহাবিচারের দিন আত্মা নিজ নিজ দেহ ধারণ করে সৃষ্টা সমীপে বিচারের সম্মুখীন হবে। সারাজীবনের কৃতকর্মের রেকর্ড প্রত্যেকের দেহ টেপে ও আমলনামায় পাওয়া যাবে। কোন অন্যায় অস্বীকার করার সাধ্য কারো থাকবেনা। যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তিকে অবিশ্বাস করে নিজের খাহেশ মত চলে, তার শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। অন্যায়কারী শুধু পরকালেই শাস্তি ভোগ করবে না, দুনিয়ার বুকেও পাপের শাস্তি কিছুটা অন্ততঃ পেয়ে থাকে। মৃত্যুকালে পাপীর শাস্তির নমুনা মানুষ পৃথিবীতেই দেখতে পায়। আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন—'ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যু হয় অত্যন্ত শান্তির সঙ্গে—যেমন মায়ের স্তন পানরত শিশু ঘুমিয়ে পড়ে, আর পাপীর মৃত্যু হয় অত্যন্ত আজাবের সঙ্গে।' এর প্রমাণ মৃত্যুকালে বেশ বোঝা যায়।

মানব সমাজে বিভিন্ন দেশে অনেক নাস্তিক ও আস্তিক লোক থাকে। কার্যকলাপ দেখে তাদের চেনা যায়। নাস্তিকেরা ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে বিদ্রূপ করে; আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন বিধানকে খেল-তামাসার বস্তু মনে করে; অন্যায় অপকর্ম তারা বিনা দ্বিধায় করতে থাকে; মানব সমাজে অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে; পরিশেষে দোজখের খড়ি হয়। দেশে-বিদেশে এরূপ দু' চারজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাদের ভুল করা দেখে, নিজে সাবধান হওয়া উচিত। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বুজুরচ্‌ মেহেরকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন—'আপনি কার কাছে এত জ্ঞান পেয়েছেন?' তিনি উত্তরে বলেন,—'অজ্ঞানের কাছে। অজ্ঞানরা যে ভুল করে, আমি তা' পরিহার করে চলি।'

আস্তিক ও নাস্তিক দুই বন্ধুর মধ্যে বিতর্কে নাস্তিক বন্ধু আস্তিককে বলে—'ভাই, তুমি অযথা ধর্মকর্ম করে কষ্ট ও সময় নষ্ট করছো? আজও আধুনিক প্রগতিশীল হতে পারলে না! বাদ দাও তোমার পুরানো বস্তাপচা রীতিনীতি।'

উত্তরে আস্তিক বন্ধু বলেন, 'ভাই তোমার বিশ্বাস—পরকাল বলে কিছু নাই; এটা যদি সত্য হয়, তোমার আমার কারোই মৃত্যুর পরে কোন শাস্তি হবে না। আর পরকাল থাকলে তোমার কি অবস্থা হবে—ভেবে দেখেছো কি? আমি মহান সৃষ্টাকে বিশ্বাস করি, তাঁর প্রতিটি হুকুম মেনে চলি, সুতরাং পরকালের বিচারে আমি নাজাত পাব; কিন্তু তুমি ত' অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়বে। প্রগতি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেন চলবো ক্ষতির পথে? যে পথে চললে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই লাভ—আমি সেই পথের পথিক।' অকাট্য যুক্তিতর্কে নাস্তিকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘরের বাইরে যেতেই হবে, অন্যথায় পূর্ণত্ব লাভ সম্ভব নয়। হাঁস-মুরগীর ছানা ডিম থেকে বের না হ'লে পূর্ণত্ব

পেতে পারে না। মথ নিজেকে কেন্দ্র করে গুটি রচনা করে, তারপর একদিন গুটি ভেদ করে বেরিয়ে রঙীন পাখায় আকাশে উড়ে বেড়ায়। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই ত' মহান প্রভুর আদেশ—তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। কোরআন মজীদে সূরা আল্ ইমরাণ ১৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ক্বদ খালাত মিন্ কাব্লেকুম ছুনান, ফাসিরূ ফীল আরদে, ফান্জুরু কাইফা কানা আকিবাতুল্ মোকাজ্জিবীন।'—নিশ্চিত জেনো, তোমাদের পূর্বে বহু গোষ্ঠি অতীত হয়েছে ; পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং অবলোকন করো—মিথ্যা-বাদীদের শেষ পরিণতি কী হয়েছে।

বাল্যাবধি আমার বেড়ানোর সখ ছিল। ছাত্রজীবনে আমার বসত এলাকা পথ-ঘাটবিহীন জলমগ্ন ও কর্দমাক্ত চলনবিলের বিভিন্ন গ্রাম এবং আশেপাশের শহর নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, আদিনা এবং মহানগর কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং দেখেছি। কর্মজীবনে সমগ্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, ও সৌদি আরবে সফর করি। সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর থাইল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরে যাই।

পাশ্চাত্যের স্বপ্নপুরী ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমনের ইচ্ছা দীর্ঘকাল যাবৎ মনের কোণে লালন করে আস্ছিলাম। আমেরিকা বসবাসরত আমার ছোট ভাইদের বদৌলতে সে-আশাও আল্লাহ্ পাক পূরণ করেছেন। ইচ্ছা ছিল ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা ভ্রমনের সুযোগে জার্মান, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দেখে আসবো ; কিন্তু তথাকার ভিসা কর্তৃপক্ষ ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতির ফলে আশাটি অপূর্ণই রয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ডের ভিসার জন্য আমাকে স্পনসরশিপ পাঠায় আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মোঃ আলী আসগার। দীর্ঘকাল যাবৎ সে লণ্ডনে চাকুরীরত আছে। নাটোরের ওরুদাসপুর থানার হরদমা গ্রামে তার বাড়ী। আমেরিকার ভিসার জন্য স্পনসর-শিপ পাঠায় আমার ছোট ভাই ডাঃ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। সুই-জারল্যাণ্ড হ'তে আমার স্নেহভাজন মোঃ আবদুর রশিদ (শ্রীপুরের) এবং জার্মান হতে অপর এক আত্মীয় ডঃ মোখলেছুর রহমান (ঠাকুরগাঁর) স্পনসর-শিপ পাঠানো সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর ভিসা পাওয়া যায় না।

তারা আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করায় আমার প্রতি তাদের আন্তরিকতা চিরদিন স্মরণ থাকবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁদের সবার মঙ্গলের জন্য দোয়া করি।

আমাকে ভিসা পেতে ঢাকা থেকে সাহায্য করেন আমার স্নেহাস্পদ মোঃ আব্দুর রহিম (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত যুগ্ম সচিব, রেলপথ বিভাগ), ঢাকার নিউ নেশান পত্রিকার সম্পাদক স্নেহাস্পদ আলমগীর মহীউদ্দিন (বড়াই-গ্রামের), ভ্রাতৃ-প্রতিম সুসাহিত্যিক জনাব মোস্তফা হারুন ও তাঁর জামাতা এস, এম, নূরুল ইসলাম (দুলাল) প্রমুখ। এঁদের সবার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক তাঁদের মঙ্গল করুন।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় মাত্র সাড়ে তিন মাসের সংক্ষিপ্ত সফরে আমার যতটুকু উপলব্ধি জন্মেছে এবং যা কিছু দেখেছি, এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাশ্চাত্যের জনগণের চারিত্রিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সবিশেষ আলোকপাত করায় গ্রন্থটির নামকরণ করেছি 'পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য'। কলিকাতার স্বনামধন্য বিশ্বপরিব্রাজক শ্রী রামনাথ বিশ্বাস ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে মন্তব্য করেন—'আমার কিছুই দেখা হয়নি।' তাঁর তুলনায় আমার দেখা ত' চোখ খোলার সামিল। গ্রন্থটির ভুল ভ্রান্তির জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কোন ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকলে, দয়া করে আমাকে জানালে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

ইংল্যাণ্ড একটি ঐতিহ্যবাহী দেশ। দীর্ঘ দিনের রাজতন্ত্র এখানকার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান রাণী শাসনতান্ত্রিক প্রধান হলেও সাবিক ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদের হাতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশ্বজনীন দেশ। বিশ্বের সকল জাতির জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত। বিশ্বের সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল জাতির লোক এখানে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেন। তাঁরা অধিকাংশই এদেশের নাগরিক। আমেরিকায় কেউ পাঁচ বছর স্থায়ীভাবে বাস করলে 'গ্রীণকার্ড' পেতে এবং নাগরিক হতে পারেন। তখন তাঁরা রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হন।

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনশালী দেশ আমেরিকা। এ-দেশকে বিশ্বের কর্ণধার বলা যায়। আজ সবার দৃষ্টি আমেরিকার প্রতি। এখানে এলে অনেকেই নিজ দেশে ফিরতে অনীহা প্রকাশ করে। এখানকার সুখ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের মোহ তাদিগকে নিজের দেশ, আত্মীয় স্বজন, সব কিছু বিস্মৃত করে রাখে। মায়াবিনী এই দেশের মায়া ছেড়ে অনেকেই নিজের দেশে ফিরতে পারে না। তারা চিরদিনের জন্য রয়ে যায় বিদেশের মাটিতে। তাঁদের জন্য দুঃখ হয়। কেননা আত্মসুখকেই তারা বড় ক'রে দেখে; ভুলে যায় আপন দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেকেই বিদেশে অর্থ উপার্জন ক'রে দেশের জন্য অনেক কিছুই ক'রে থাকেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন টাংগাইলের আকুর টাকুর নিবাসী প্রবীণ সাহিত্যিক জনাব মফিজ-উল-হক, চাঁন্দাইকোনার কবিশেখর ডাঃ আজিজুর রহমান ফিরোজী, সলঙ্গার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম, আব্দুল আজীজ মিয়া, বিশিষ্ট সমাজকর্মী মোঃ আব্দুল মান্নান (তালবাড়িয়া), পাবনার কবি ও সাহিত্যামোদী স্নেহাস্পদ জয়নুল আবেদীন মাহবুব প্রমুখ।

গ্রন্থটি রচনাকালে আমেরিকা থেকে তথ্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছে আমার স্নেহাস্পদ অনুজ মোঃ সোহ্‌রাব হোসেন, এম, এস, (ইঞ্জিনিয়ার), ডাঃ আল্‌হাজ্ব সিরাজুল ইসলাম এবং এস, এম, শরীফুল আলম (ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টর) ও বৌমা মালেকা পারভিন। লণ্ডন হ'তে সাহায্য করেছে স্নেহাস্পদ আলী আসগার ও তার পত্নী মাজেদা আস্‌গার।

পাণ্ডুলিপি তৈরীতে ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে পাবনা জেলা গণ-গ্রন্থগারের সহকারী লাইব্রেরীয়ান স্নেহাস্পদ নিয়ামতুল্লাহ্‌ (রাজা), আমার ভাগ্নে শাহাদৎ আলম, জামাতা আলহাজ্ব মোঃ জাহিদ আলম, নাতী হাসান মাহমুদ (সোহেল), ভাতিজা আতিকুজ্জামান, রফিক ও জাহিদ।

মুদ্রনে সাহায্য করেছেন পাবনার মডার্ণ আর্ট প্রেসের স্বত্তাধিকারী জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল হোসেন এবং প্রেসের মেশিনম্যান খোরশেদ আলম খুশী, কম্পোজিটার নজরুল ইসলাম ও মহিদুল ইসলাম (মহিদ)। সবাইকে অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ।

গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের অভিমত ও উপদেশ সাদরে গৃহীত হবে। লেখকের বিনা অনুমতিতে যে কেহ এই গ্রন্থ ভাষান্তরিত ক'রে প্রকাশ করতে বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারবেন।

লেখক।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

আমাদের দেশ হোম,
পৈলানপুর, পাবনা।
বাংলাদেশ।

প্রসঙ্গ কথা

প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে ভ্রমণের পর পাশ্চাত্যে সফরের ইচ্ছা মনের কোণে দানা বেঁধে উঠে। আমার তিন কণিষ্ঠ ভ্রাতা অনেক দিন যাবৎ সপরিবারে আমেরিকায় থাকে। তা'ছাড়া লণ্ডনে আমার ছাত্র ও আপনজন অনেকেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং স্বনামধন্য দেশ ইংল্যাণ্ড, আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী ও সমৃদ্ধশালী দেশ আমেরিকা দেখা এবং তথাকার মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল আমার আন্তরিক অভিলাষ। সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের আশে-পাশের আরো কয়েকটি দেশ—বিশেষ ক'রে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানী দেখে আসারও একান্ত ইচ্ছা ছিল।

একজন সফরকারী হিসেবে বিদেশ ভ্রমণে অতীতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হই নাই। ভেবেছিলাম, এবারেও কোন অসুবিধা হবে না। আমার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আগে থেকেই ছিল। তার নবায়নও কয়েকবার ক'রে নিয়েছিলাম।

আমার চতুর্থ ভ্রাতা ডাঃ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম আমেরিকার ফ্লোরিডা ষ্টেটের কিসিমির একজন ডাক্তার। বছর দুই আগে সে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার কথা লিখেছিল। ১৯৯১ সালের প্রথম দিকেই সে আমাকে মে-জুন মাসের মধ্যে আমেরিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লেখে। আমার আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মেয়াদ ১৯৯১ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত ছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী রাজশাহী গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য পাসপোর্ট নবায়ন করে আনি।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকা থেকে ভাই সিরাজুল ইসলাম এবং লণ্ডন থেকে আমার প্রাক্তন ছাত্র আলী আসগার স্পনসরশিপ পাঠায়। কালবিলম্ব না ক'রে ঢাকায় যাই ভিসার জন্য।

৯ই জুন আমেরিকান দূতাবাসে ভিসার জন্য দরখাস্ত করি। প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর আমার ডাক পড়ে। প্রশ্ন করা হয়, কেন আমি একা বিদেশ ভ্রমণে যেতে চাই? আমার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে নিচ্ছি না? উত্তরে জানাই আর্থিক অসুবিধা আছে, তা'ছাড়া তাকে আমাব মেয়েদের দেখাশোনার জন্য বাড়ীতে থাকা প্রয়োজন। উত্তরে কর্তৃপক্ষ খুশী হন না। ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়ে সিল দিয়ে পাসপোর্ট ফেরৎ দেন। আমি আদৌ ভাবি নাই যে, আমার মত একজন বৃদ্ধ লোককে, তদুপরী সরকারী কলেজের একজন অবসর-প্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ভিসা দিতে আপত্তি করবেন!

পুনরায় ভিসার দরখাস্ত করার জন্য ফরম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাই। পরদিন যথাসময়ে আবার দরখাস্ত করি। সেদিনও ভিসা দিতে অপারগতা

প্রকাশ ক'রে সিল মেরে আমার পাসপোর্ট ফেরৎ দেন। মন অনেকটা দমে যায়। মনে আশঙ্কা জাগে—আমার সব আশা-আকাঙ্খা বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়! ছোট ভাই সিরাজকে ঢাকা থেকে টেলিফোনে সব খবর জানাই। সে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসে ট্যালেক্স পাঠায় আমাকে অবিলম্বে ভিসা দিবার জন্য।

আমেরিকান দূতাবাসে কর্মরত জনাব এন, এম, নূরুল ইসলাম (দুলাল) আমার জনৈক ছাত্র যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে ডিভিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার এম, আবদুর রহীম এবং ঢাকাস্থ 'নিউনেশন' পত্রিকার সম্পাদক স্নেহাস্পদ আলমগীর মহীউদ্দিন আমাকে পরিচিত-পত্র লিখে দেয়—দূতাবাসে দাখিল করার জন্য। এক সপ্তাহ পর ১৮ই জুন পুনরায় আমেরিকান দূতাবাসে যাই এবং আমার পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করি। সেদিন প্রশ্ন না ক'রে বিনাবাক্যব্যয়ে ভিসা মঞ্জুর করা হয়।

পরদিন বৃটিশ হাই কমিশন অফিসে যাই ইংল্যাণ্ডের ভিসার জন্য। যথারীতি দরখাস্ত করি। আমেরিকার ভিসা হয়েছে দেখে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ভিসা মঞ্জুর করেন। তাঁদের সহানুভূতিশীল ব্যবহারে মুগ্ধ হই।

সমস্যা দেখা দেয় ফ্রান্স, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের ভিসার ব্যাপারে। পাসপোর্ট ও স্পনসরশিপসহ ভিসার জন্য দরখাস্ত দাখিল করলে তারা আমার কাছে তাঁদের দেশে যাবার টিকিট চেয়ে বসেন। আমি আমার লণ্ডন ও নিউইয়র্ক যাবার টিকিট দেখাই এবং বলি, লণ্ডনে গিয়ে আপনাদের দেশের টিকিট করবো। এখান থেকে ত' সব দেশের টিকিট কেনা সম্ভব নয়! তাঁরা উপদেশ দেন, আপনি লণ্ডনে ভিসা করবেন—কোন অসুবিধা হবে না। কয়েকদিন দূতাবাস তিনটিতে ধর্ণা দিয়েও কোন ফল না হওয়ায় বাড়ী ফিরে আসি।

২৪শে জুন নিজ গ্রামে (খুবজীপুরে) ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করি। নামাজের পূর্বেই বিদেশে যাচ্ছি বলে ঈদমাঠে সবার কাছে দোওয়া চাই।

পরদিন বাড়ী থেকে সপরিবারে পাবনায় ফিরি এবং নৈশকোচে ঢাকার পথে রওনা হই। ২৭শে জুন সকাল পৌনে সাতটায় গাল্‌ফ এয়ার লাইনসের বিমানে আমার লণ্ডনের পথে যাত্রার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। তার পূর্ব দিন সকালে ঢাকায় পেঁৗছে শিশু হাসপাতালে মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় উঠি। জামাতা ডাঃ আনিসুর রহমান খসরুর সঙ্গে কিছু কেনাকাটা ও কয়েক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করি।

পরদিন ভোরে বিমান ছাড়ার অন্ততঃ এক ঘন্টা পূর্বে আমাকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পেঁৗছা চাই। ঢাকা হতে শেষরাতে বিমান বন্দরে যাবার অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে মেয়ে ডাঃ গুলশান আরা, জামাতা বাবাজী, নাবিল নানু ও অন্যান্যদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টের সন্নিকটে প্রেম বাগানে জনাব জহুরুল ইসলাম মামার বাড়ীতে যাই রাত্রি যাপন করতে। ভোর সাড়ে চারটায় তিন নাতী সবুজ, বিপ্লব ও বাবুসহ দু'খানা রিক্সায় ৫-৪০

মিনিটে এয়ারপোর্টে পৌঁছি। সকাল ৬-৪৫ মিনিটে বিমান ছাড়ার কথা থাক্‌লেও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ছাড়ে ৭-১৫ মিনিটে। গাল্‌ফের ঈগল মার্কা বিমান দু' শতাধিক যাত্রী নিয়ে লণ্ডনের পথে পাখা মেলে।

সকাল সাড়ে সাতটায় বিমানে নাস্তা পরিবেশন করা হয়—চেরীফল, পারুটি, মাংসের সস, টম্যাটো, সেরিলা, জেলী, চীজ, মাখন ইত্যাদি। এমনকি একটা করে দাঁত খিলালও দেয়া হয়। অতঃপর যার যার অভিরুচি মোতাবেক চা ও কফি পরিবেশিত হয়। গাল্‌ফ (ভূমধ্যসাগরীয়) এয়ার হোস্টেসদের মাথা ওড়নায় ঢাকা, পরণে লম্বা কামিজ, তার উপর এ্যাপ্রন। অত্যন্ত শালীন পোষাক পরিচ্ছদ। তাদের ভদ্র ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ সময় এগারটা বিশ মিনিটে আমরা দোহা (কাতারের রাজধানী) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি। তখন সেখানকার স্থানীয় সময় ছিল ৮-৫০ মিনিট (সকাল)। অতএব, বাংলাদেশের সঙ্গে সময়ের পার্থক্য ছিল আড়াই ঘন্টা।

দোহায় দেড় ঘন্টার অধিক অপেক্ষার পর বিমান বদল ক'রে ইউনাইটেড এয়ার লাইন্‌সের বিমানে লণ্ডনের পথে যাত্রা করি। দোহায় কালো বোরখা পরিহিতা অনেকগুলো মহিলা আমাদের বিমানে আরোহণ করেন। তাঁদের চোখবাদে সমস্ত মুখমণ্ডল কাল পর্দায় ঢাকা। জনৈক যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তাঁরা আরবদেশীয় মুসলিম মহিলা। সেখানকার বয়স্কা মুসলিম মহিলাগণ সবাই পর্দা এস্তেমাল করেন।

বিমানে দেড়টায় খানা পরিবেশন করা হয়। পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছিলাম, "আমি ভেজিটেরিয়ান" (সব্জীভোজী)। আমাকে যেন কোন মাংস না দেওয়া হয়। কিসের মাংস, হারাম কি হালাল, কিভাবে জবাই করা—সন্দেহ থাকায় 'সব্জীভোজী' বলে যাই।

খাবার শেষে বিপদ দেখা দেয় আমার বাম পাশের যাত্রী এক ইংরেজ মহিলাকে নিয়ে। তিনি তাঁর অভ্যাসমত মদ পান করতে থাকেন। মদের ঝাঁঝালো বিট্‌কেলে গন্ধ সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে কিছু বলাও যায় না। অগত্যা রুমালে নাক মুখ চেপে বসে থাকি। মহিলাটি আমার অসুবিধা বুঝতে পেরে পরবর্তী সময়ে মদপানের জন্য সিট ছেড়ে উঠে যেতেন।

বিমান কর্তৃপক্ষ যেমন ধূমপায়ীদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা করেন, তেমনি যদি মদ্যপায়ীদের জন্য পৃথক বসার বন্দোবস্ত করতেন, তা' হলে কতই না ভাল হোত।

লণ্ডন সময় বিকেল চারটায় আমরা লণ্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বাংলাদেশের সঙ্গে লন্ডনের সময়ের পার্থক্য পাঁচ ঘন্টা। আমার ঘড়িতে বাংলাদেশের সময় রাখায় তখন বেজেছিল ন'টা (রাত)। অথচ লন্ডনে তখনও বেলা অনেক ছিল। তখন সূর্যাস্ত হোত স্থানীয় সময় সাড়ে নটায়।

লণ্ডনে দুই হপ্তা

আমার প্রাক্তন ছাত্র আলী আসগার আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কারসহ হিথ্রো বিমান বন্দরে লাউঞ্জের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বিমান বন্দর থেকে লাগেজ উদ্ধার এবং কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্স নিতে বেশ সময় লাগে। যাদের কোন মালপত্র থাকে না, তাঁরা বিমান হতে অবতরণের পর অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাড়া পান।

আমি লাগেজের জন্য গাল্‌ফ বিমান অফিসের নীচের তলায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সাড়ে পাঁচটার দিকে আলী আসগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাকে আমার লাগেজ দু'টা এখনও পাই নাই বলায় সে আমাকে খোঁজ নিতে বলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কারণ যাত্রী ছাড়া অন্যদের ভিতরে থাকা নিষিদ্ধ। দু'ঘন্টার অধিক সময় অপেক্ষা করা সত্ত্বেও ঘূর্ণায়মান বেল্টে আমার লাগেজ এসে না পৌঁছায় এবং সব লাগেজ পৌঁছা শেষ হলে আমি গাল্‌ফ এয়ারের অফিসার জনাব হাফিজ সাঈদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁকে আমার লাগেজ না পাওয়ার কথা বললে তিনি আমাকে পরদিন সকাল দশটায় এয়ার-পোর্টে আস্‌তে বলেন।

লাগেজ ছাড়াই আলী আসগারের বাসায় (১৯৬, ক্যাল্টারবাড়ী-রোড লিটন, লণ্ডন) পৌঁছি অপরাহ্ণ আটটায়। আলী আসগারের বেগম মাজেদা এবং তাদের একমাত্র কন্যা রেবেকার সঙ্গে দীর্ঘকাল পর সাক্ষাৎ হওয়ায় তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। মাজেদাও পাবনা এড্‌ওয়ার্ড কলেজে আমার ছাত্রী ছিল। রেবেকা কলেজে পড়ে, আইনের ছাত্রী।

তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর কথাবার্তা চলতে থাকে। এক ফাঁকে মাজেদা চা-নাস্তা পরিবেশন করে। দেখে ত' চক্ষু স্থির! এতো কিছু! সবাইকে নিয়ে খাই। ঘন্টাটেক আলাপের পর আমাকে খাবার টেবিলে নিয়ে হাজির করা হয়। সেখানে মহোৎসবের ব্যাপার! চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় কোনটাই বাদ নাই। আমার জন্য বাঙ্গালী খানা, ইউরোপীয়ান খানা কত কি যে তৈরী করা হয়েছিল, তার নামই জানি না। বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি। আমরা সবাই মিলে অর্দ্ধেকটাও খেতে পারি না। আমাকে বেশী করে খাওয়ানোর জন্য তাদের মধ্যে দস্তুর মত পরিবেশনের প্রতিযোগিতা চল্‌তে থাকে। আমি বেচারা নেস্তনাবুদ হয়ে পড়ি। যাক, কোন মতে ভোজন পর্ব সমাধা করে তাদের জুলুম (?) থেকে রেহাই পাই।

আলী আসগার নিজের বাড়ীতে সপরিবারে বাস করে। দ্বিতল ভবন। সঙ্গে বাগান। নীচ তলায় গৃহ মেরামতের কাজ চল্‌ছিল। জিনিষপত্র বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তারা আমার জন্য একটা সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ তৈরী রেখেছিল। অল্প দূরে তাদের আরো একটি বাড়ী আছে ভাড়া দেয়া। আমি যতদিন লণ্ডনে

ছিলাম, তারা আমাকে অন্য কারো বাড়ীতে থাকতে দেয়নি। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরী করা সত্ত্বেও আমার জন্য সাধ্যমত সময় দিতে কার্পণ্য করেনি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পরিশ্রান্ত থাকায় আমাকে অধিক রাত জাগতে দেয়া হয় না। বারটার পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করি।

পরদিন প্রাতঃরাশের পর সকাল আটটায় আলী আসগারের সঙ্গে হিথ্রো এয়ারপোর্টে রওনা হই। তার গাড়ীতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথে অসম্ভব গাড়ীর ভীড় থাকায় পথ অতিক্রম করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে একস্থানে গাড়ী রেখে আমরা ট্রেনে যাই।

বিমান বন্দরে পৌঁছে জনাব হাফিজ সাঈদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি একজন পাকিস্তানী। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি আমার লাগেজের খোঁজে গোডাউনে যান। দশটা থেকে তিনটা পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষার পর দেখা গেল তিনি আমার সুটকেসটি হাতে ক'রে আসছেন। ওটি আমাকে দিয়ে তিনি বললেন, আপনার কাপড়ের হ্যাণ্ডব্যাগটি পাওয়া গেল না। পেলে আপনাকে পৌঁছে দেব। তিনি আরও বললেন, আপনি লাগেজের জন্য কষ্ট করে আজ, এয়ারপোর্টে আসায় আপনাকে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড দেয়া হবে। তাঁর উপদেশ মত ব্যাগের জন্য একটা অভিযোগ পত্র দাখিল ক'রে আমরা ঘরে ফিরি।

ফেরার পথে এক মার্কেটের মধ্যে অবস্থিত পোস্ট অফিস হ'তে কিছু এরোগ্রাম ও ডাকটিকিট কিনি বাংলাদেশে চিঠি লেখার জন্য।

বিকেলের দিকে আলী আসগারের সঙ্গে সেন্ট্রাল লণ্ডন এবং ইংল্যাণ্ডের রাণীর বাড়ী 'বাকিংহাম প্যালেস' দেখতে যাই। লণ্ডন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুসজ্জিত শহর। ইমারতগুলো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কোনটির সঙ্গে সামান্য কালির আঁচড় পর্যন্ত নেই। আলী আসগারকে বললাম, এ-দেশে কি নির্বাচন হয় না? কোন বিল্ডিং-এর গায়ে লেখা পোস্টার কিছুই দেখি না? সে বললো, এ-দেশের লোকের রুচি অনেক উন্নত। তারা বিল্ডিং-এর গায়ে লিখে বিল্ডিং নোংড়া করে না। নির্বাচনী প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, সেখানে পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা আছে। প্রধানতঃ রেডিও-টিভিতে নির্বাচনী প্রচারণা চলে।

লন্ডনের সব রাস্তা খুব বেশী প্রশস্ত নয়। পথের ধারে ছোট বড় অনেক পার্ক রয়েছে। 'বাকিংহাম প্যালেস' একটি মনোরম প্রাসাদ। ভবনটির সম্মুখ গেটে অতীতকালের রাজনীতিবিদ ও নামজাদা সামরিক কর্মকর্তাদের অনেক-গুলো প্রস্তরমূর্তি উচু বেদীর উপরে সন্নিবেশিত রয়েছে। ভবনটির সম্মুখস্থ সবুজ চত্বরে অসংখ্য পুষ্পরাজি ভবনটিকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে।

বাকিংহাম প্যালেসের সন্নিকটে বিখ্যাত হাইড পার্ক অবস্থিত। আমরা পার্কের সিটে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করি। হাতে সময় না থাকায় পার্কটি ঘুরে দেখা সম্ভব হয় না! বিরাট পার্ক। ঘুরতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন। এক পাশ থেকে যতদূর দেখা যায় দেখলাম। বহু লোক পার্কটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেকেই সিটে বসে বিশ্রাম করছেন। কেউবা খবরের কাগজ বা বই পড়ছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় আমরা বাসায় ফিরি।

পরদিন ভিক্টোরিয়া রেল স্টেশনে যাই জার্মানীর ব্রিমেন ও সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভা যাবার ট্রেন-ভাড়া ও ট্রেনের সময় জানার জন্য। ট্রেনে যেতে ১৫/১৬ ঘন্টা সময় লাগে শুনে বিমানে যাব স্থির করি। ব্রিমেনে আমার মেজো জামাতা ডঃ জাফরুল্লাহ্‌র ভগ্নি সালেহা ও তার স্বামী ডঃ মোখলেছুর রহমানের সঙ্গে লণ্ডন থেকে টেলিফোনে আলাপ করি। এক সপ্তাহ পর ব্রিমেনে আসছি বলে তাদের জানাই। তখন ভাবিনি যে, ভিসা পেতে কোন অসুবিধা হ'তে পারে।

রাত্রে আলী আসগারের বাসা থেকে টেলিফোনে আমেরিকায় ছোট ভাইদের ও জেনেভায় আব্দুর রশিদের সঙ্গে আলাপ করি; লণ্ডনে ব্যারিস্টার এ, এম, আজহারের সঙ্গেও কথা বলি। সে আমার অনুজতুল্য। পরবর্তী দিন সে আমাকে তার বাড়ী নিয়ে যাবে বলে।

পরদিন বিকেলে ব্যারিস্টার আজহার তাঁর বন্ধু আজিজুল হককে গাড়ীসহ পাঠায় আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। মিঃ হক একজন একাউন্টস অফিসার। তাঁর পুত্র নাদিম সঙ্গে আসে। পিতা-পুত্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। নাদিমের মা বোম্বাইয়ের মেয়ে এবং তাঁর পিতার বাড়ী বরিশালের মাহদীগঞ্জ। ছেলেটি বেশ চটপটে। ব্যারিস্টার আজহার সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার চাঁন্দাইকোনা গ্রামের বাসিন্দা। সে যখন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বি, এ, পড়তো, তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি তখন অধ্যাপনা করতাম। পরিচয়ের সূত্র তার বড় ভাই ব্যারিস্টার এ, এম, আব্বাস। তিনি ১৯৪৫ সাল হতে লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ব্যারিস্টার আব্বাস ছিলেন লণ্ডন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি লণ্ডন থেকে 'আওয়ার হোম' নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। আমি পত্রিকাটির পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলাম। সেই সুবাদে আমি তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলাম। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের ন্যায় স্নেহ করতেন। যখনই তিনি দেশে আসতেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি ১৯৫৮ সালের আগষ্ট হতে 'আওয়ার হোম' পত্রিকার বাংলা সংস্করণ মাসিক 'আমাদের দেশ' পাবনা শহর হতে প্রকাশ করতে থাকি। পত্রিকাটির উর্দু সংস্করণ 'হামারা ওয়াতন' পাঞ্জাবের লয়ালপুর থেকে প্রকাশিত হোত। তিনটি পত্রিকারই প্রধান সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার আলী মোহাম্মদ আব্বাস। তিনি পাকিস্তান জন্মের দু'বছর পূর্বেই লণ্ডনের ৩৩, ষ্ট্যাভিস্টক স্কয়ারে অবস্থিত তাঁর বাসভবনের নাম রেখেছিলেন 'পাকিস্তান হাউস'। পাকিস্তান জন্মের পর লণ্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের নাম 'পাকিস্তান হাউস' করার প্রস্তাব তাঁর আপত্তির কারণে নাকচ হ'য়ে যায়। তাঁর বাড়ীর নাম 'পাকিস্তান হাউস' অপরিবর্তিত থাকে।

আলী আসগারের সঙ্গে 'পাকিস্তান হাউস' দেখতে গিয়েছিলাম। বাড়ীটি চারতলা। ব্যারিস্টার আব্বাস নীচ তলার এক ফ্ল্যাটে বাস করতেন। তিনি

ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন। বর্তমানের বাড়ীটি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কিনে নিয়েছে। বাড়ীর বহির্দেয়ালে একটি বৃত্তের মধ্যে লেখা রয়েছে 'Erected by Camden Borough Council. Ali Mohammad Abbas (1922-1979), Barrister and one of the founders of Pakistan lived here 1945—1979 —অর্থ ঃ ক্যামডেন বুরো কাউন্সিল কর্তৃক স্থাপিত (এই লিপি)। ব্যারিষ্টার আলী মোহাম্মদ আব্বাস (১৯২২-১৯৭৯) পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এখানে বাস করতেন ১৯৪৫—১৯৭৯ পর্যন্ত।

ব্যারিষ্টার আব্বাস আমৃত্যু পাকিস্তানী ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সালের ২৫শে জুন লন্ডনের চারিংক্রস হস্‌পিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ করাচীতে এনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধির পাশে সমাধিস্থ করেন পাকিস্তান সরকার।

মিঃ আজিজুল হকের সঙ্গে ব্যারিষ্টার আজহারের বাসায় পৌঁছে বগুড়া জেলার ধুনটের ব্যারিষ্টার হামিদুর রহমান এর সাথে পরিচয় ঘটে। তিনি ব্যারিষ্টার আব্বাস সাহেবের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ব্যারিষ্টার আজহার, তাঁর বেগম বেলী, কন্যা রুবিনা ও সাবিনার সঙ্গেও আলাপ হয়।

ব্যারিষ্টার এ. এম. আব্বাস তাঁর জীবনী লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের কিছুকাল পর আমি কাজটি শুরু করি। ব্যারিষ্টার আজহারকে দেখাবার জন্য জীবনী গ্রন্থটির খসড়া পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরা গ্রন্থটির আংশিক শোনার আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি প্রথম তিন অধ্যায় পাঠ করি। অতঃপর আহার অন্তে ১৯৮৮ সালের ২৫শে জুন ব্যারিষ্টার আব্বাসের নবম মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্যাসেট দেখি। রাত দু'টা বেজে যাওয়ায় আমার ইচ্ছাক্রমে আমাকে আলী আসগারের বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়। তখন ফজর নামাজের ওয়াক্তের বাকি ছিল মাত্র এক ঘন্টা।

পরদিন ৩০শে জুন সকাল ন'টার দিকে আলী আসগার ও মাজেদার সঙ্গে লণ্ডন শহর ও বাজার দেখতে যাই। ভিক্‌টোরিয়া মার্কেট থেকে ১ পাঃ ৪৬ সেন্টে ১৭ খানা ভিউ কার্ড কিনি। মাজেদা বাজার সওদা সেরে বাসে বাসায় ফিরে যায়। আমরা সেন্ট্রাল লন্ডন, সেন্টপল ক্যাথাড্রল (গীর্জা), রিজেন্ট পার্ক, ভিক্‌টোরিয়া পার্ক ও লন্ডন মিউজিয়াম দেখি। এ দু'টি পার্কও হাইড পার্কের ন্যায় বেশ বড়। লন্ডন শহরে ছোট বড় বহু সংখ্যক পার্ক আছে। সেন্ট্রাল লন্ডনে একটি পার্কের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তরমূর্তি উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত দেখেছি।

যোহর নামাজের সময় হওয়ায় আমরা রিজেন্ট পার্ক মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাই। মসজিদটি 'সেন্ট্রাল লণ্ডন মস্ক' নামে অভিহিত। এ-টি লণ্ডনের সবচেয়ে বড় মসজিদ বলে জানা গেল। অতি সুন্দর কারুকার্য খচিত মসজিদ। মসজিদের সম্মুখে ও পাশে গাড়ী রাখার জন্য পাকা পার্কিং লন রয়েছে। নানাবিধ পুষ্প ও বৃক্ষ লতায় মসজিদ প্রাঙ্গণ সুশোভিত। মসজিদটির অভ্যন্তরে প্রতি সারিতে ৪০ জন নামাজী দাঁড়াতে পারেন। মোজাইক করা

মেঝেতে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নামাজের স্থান অঙ্কিত আছে। আভ্যন্তরিণ প্রধান কক্ষে ২১ সারিতে (২১ × ৪০) ৮৪০ জন মুসল্লী জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন। বারান্দা ও বাইরে অনুরূপ সংখ্যক মুসল্লীর স্থান রয়েছে। মেয়েদের নামাজের স্থান মসজিদটির দ্বিতলের শেষাংশে। কার পার্কিংলনে শতাধিক কার রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রায় ১৭০০ পুরুষ ও ৭০০ মহিলা মসজিদটিতে একত্রে জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন। যোহর ওয়াক্তের জামাতে প্রায় তিনশত মুসল্লী ছিলেন। মহিলাগণ দ্বিতলে নামাজ আদায় করায় তাদের সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

নামাজ শেষে ষ্ট্যাভিংটক স্কয়ারে অবস্থিত 'বৃটিশ মিউজিয়াম' দেখতে যাই। এ-টি লণ্ডনের সর্ববৃহৎ জাদুঘর। ভবনটি সাত তলা এবং একশত কক্ষ বিশিষ্ট। মিউজিয়ামটির কয়েক তলা শুধু হেঁটে আসতে কমপক্ষে চারঘন্টা প্রয়োজন। আমাদের হাতে সময় কম থাকায় মাত্র আড়াই ঘন্টায় জাদুঘরটির আংশিক দেখি। মমি করা মানুষের মূর্তি দেখে প্রতীয়মান হয়, ঠিক যেন তরতাজা মানুষ। বিভিন্ন জীব জন্তুর শিলায় রূপান্তরিত দেহ, বিভিন্ন ধাতবপাত্র, কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, যুদ্ধাস্ত্র, মাটির ও পিতলের পাত্র এবং আরও অনেক কিছু জাদুঘরটিতে দেখি। বিলাত ফেরৎ জনৈক ভদ্রলোক বাংলাদেশে এসে গল্প করেছিলেন, বৃটিশ মিউজিয়ামে নাকি বাংলাদেশের বাবুই পাখীর বাসাও রয়েছে। মগ্ন মিউজিয়াম না দেখতে পারায় বাবুই পাখীর বাসা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পরদিন আলী আসগারের কন্যা রেবেকা (আইন বিভাগের ছাত্রী) ও তার বান্ধবী অরুনার (মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী) সঙ্গে টিউব ট্রেনে ১২-৪৫ মিনিটে সুইজ এ্যাম্বেসীতে যাই জেনেভায় যাবার ভিসার জন্য। অফিস পনর মিনিট আগেই বন্ধ হওয়ায় কাজ হয় না। তাদের অফিস ছিল সাড়ে বারোটা পর্যন্ত —এটা আমাদের জানা ছিল না।

অতঃপর লণ্ডন চিড়িয়াখানা (London Zoo) দেখতে যাই। সেখানে এ্যাকোরিয়াম, সাপের ঘর, বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখী ইত্যাদি দু'ঘন্টার মধ্যে দেখে শেষ করে লণ্ডন প্ল্যানেটরিয়ামে (জ্যোতিষ্ক মিউজিয়ামে) প্রবেশ করি। প্রবেশ ফি জনপ্রতি ৫ পাউণ্ড ২০ সেন্ট (বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪২৫/০০ টাকা)। নভঃমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ, উল্কাপিণ্ড, সুটিংস্টার ইত্যাদির বিচরণ তাদের অবস্থান ও আচরণ কৃত্রিম ব্যবস্থাপনায় প্রদর্শিত হয়। নক্ষত্রপুঞ্জে অগণিত নক্ষত্র মধ্যাকর্ষণ শক্তিতে একত্র পুঞ্জীভূত, কোনটির আকার চেপ্টা, কোনটি গোল, কোনটি ডিম্বাকৃতি। ছায়াপথ সুদূর প্রসারিত নক্ষত্রপুঞ্জ। 'নেবুলা' নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ধূলোবালি ও গ্যাসের সমাহার। তার আংশিক নক্ষত্রের আলোকে উজ্জ্বল, কোন অংশ কয়লা কণার কারণে অন্ধকার দেখায়। কৃত্রিম আকাশের নীচে সিটে বসে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আধঘন্টাটেক দেখার পর প্ল্যানেটরিয়াম থেকে বের হয়ে ম্যাডামটুসাডের মিউজিয়াম দেখি। ম্যাডামটুসাড্ একজন ফরাসী মহিলা। তিনি মোমের সাহায্যে মানুষের অবিকল মূর্তি তৈরী ক'রে তার জাদুঘর

সুসজ্জিত করে রেখেছেন। মূর্তিগুলো দেখে চেনার উপায় নাই—এগুলো সত্যিকার জ্যান্ত মানুষ, না মূর্তি। জাদুঘরটিতে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সময়ের রাজা, রাণী, জেনারেল, বৈজ্ঞানিক, কবি ও গুণী-জ্ঞানীদের মূর্তি রয়েছে। বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রায় একঘণ্টা জাদুঘরটি দেখি। আমি ইচ্ছা ক'রে একটা মূর্তি স্পর্শ করতেই শব্দ করে উঠে। মনে হয় মূর্তির ভিতরে রেকর্ড জাতীয় কোন কিছু আছে। তা'ছাড়া মোমের তৈরী মূর্তি শব্দ করবে কি করে! জাদুঘরটি অপূর্ব। ম্যাডামট্যুসাডকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁর এই বিস্ময়কর শিল্প সংস্থাপনার জন্য।

সন্ধ্যায় ট্রেনযোগে আমরা বাসায় ফিরি। সমগ্র লণ্ডন শহরে মাটির নীচে টিউব লাইন জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। ট্রেনসমূহ বিদ্যুতের সাহায্যে দ্রুত গতিতে চলে। প্রতি ষ্টেশনে মাত্র এক মিনিটের জন্য ট্রেন থামে। থামার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের সকল কম্পার্টমেন্টের দরজা আপনা আপনি খুলে যায়। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনের দেয়ালে একটি লেখার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ঃ 'Please offer your seat to an elderly or disabled passenger.' অর্থাৎ 'আপনার সিটটি বৃদ্ধ বা অক্ষম লোককে দয়া করে ছেড়ে দিন।' কোন বৃদ্ধ বা পঙ্গুলোক ট্রেনে উঠলে যুবক বা জোয়ান লোকেরা নিজেদের সিট থেকে উঠে তাঁদের সাদরে বসান। কতিপয় যাত্রীকে এরূপ করতে দেখি। মনে আনন্দ পাই তাদের উদারতা ও ভদ্রতা দেখে। এরূপ যাঁদের ভদ্রতাজ্ঞান, তাঁরা গুণে-জ্ঞানে, ধনে-মানে বড় হবে না কেন? যারা অপরকে সম্মান দিতে জানে না, তারা জীবনে সম্মান পায় না। ইংরেজ জাতি অপরকে সম্মান করতে জানে জন্যই সারা বিশ্বে সম্মানের পাত্র।

ট্রেনে একজন ইংরেজকে বুকে 'Homeless' লেখা প্লাকার্ড নিয়ে সাহায্য সংগ্রহ করতে দেখি। এটি আমার দৃষ্টিকটু লাগে।

পরদিন আলী আসগারের সঙ্গে আবার সুইজ এ্যাম্বেসীতে যাই ভিসার জন্য। পূর্বাহ্নেই ভিসার দরখাস্ত ফরম পূরণ করে রেখেছিলাম। আমার পাসপোর্টসহ দরখাস্ত দাখিল করি; সবকিছু দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, 'আপনি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার আমন্ত্রণে আসেন নাই, সুতরাং ভিসা দেয়া যাবে না।' আমি আমার আত্মীয় আবদুর রশিদ প্রদত্ত পত্র ও স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট দেখাই। দেখে বললেন, এতে হবে না, কেননা ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার সিল ও স্বাক্ষরসহ অনুমোদন থাকতে হবে। অনেক অনুরোধ করেও ফল হয় না। আমি তাঁকে ঢাকার সুইজ এ্যাম্বেসীর কর্মকর্তার কথা বলি; আপনাদের এ্যাম্বেসীর অফিসার ঢাকা থেকে ভিসা দেন নাই; তিনি বলেছেন—লন্ডন থেকে সহজেই ভিসা করতে পারবেন। তাতেও বরফ গলে না। বাসায় ফিরে টেলিফোনে জেনেভায় আবদুর রশিদকে সকল খবর জানাই। বিষয়টি জেনে সে দুঃখ প্রকাশ করে। দুঃখ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক, কেননা সে আমাকে সুইজারল্যান্ডে নেবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চিঠিপত্রে

যোগাযোগ রাখে লন্ডনে আমাকে টেলিফোনে জানায় সে কোথায় কি, কি, দেখাবে। আমার জন্য তার খরচও কম হয়নি। ভিসা না পাওয়ায় সব আশা-আকাঙ্খা নির্মূল হয়ে যায়। ভিসা দিতে তাঁদের এত কার্পণ্যের কারণ কি বুঝি না!

দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে টেমস্ নদী, নদীর সুরঙ্গ পথ, বৃটিশ পার্লামেন্ট হাউস, ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজ, ওয়েস্ট মিনিস্টার ষ্টেশন, বিগবিন (Bigbin) ট্রাফালগার স্কয়ার ইত্যাদি দেখি। টেমস্ নদীবুকে বহুসংখ্যক লঞ্চ ও ষ্টিমার দেখা গেল। গীর্জার মাথায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘড়ি 'বিগবিন'। চতুর্দিক থেকেই ঘড়িটিতে সময় দেখা যায়।

পরদিন রেবেকা ও অরুনার সঙ্গে ট্রেনে জার্মান এ্যাম্বেসীতে যাই ১-১৫ মিনিটে। তাঁদের অফিসের সময় ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত থাকায় আমরা পৌছাঁর সোয়া ঘন্টা পূর্বেই অফিস বন্ধ হয়েছিল। অবাক হলাম, মাত্র তিন ঘন্টা অফিস খোলা থাকে জেনে। একটা উন্নত সভ্য জাতি মাত্র তিন ঘন্টা অফিসের কাজ করেন—এ কেমন কথা। অবশ্য বিশেষ কোন কারণেও বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। কারণ জানা গেল না।

ট্রেনে বাসায় ফিরি। ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে প্ল্যাটফরমে সাহায্য সংগ্রহ করতে দেখি। তাকে ভিক্ষুক বলা যায় না। লোকটি অনুমান ৩৫ বৎসর বয়স্ক সাদা-চামড়ার (ইউরোপিয়ান); সামনে একটি ব্যাগ রেখে গিটার বাজাচ্ছিলেন। অনেকেই তার ব্যাগের উপরে বিভিন্ন মানের মুদ্রা ফেলছিলেন। চাওয়ার কারবার নাই। ব্যাগ রাখা দেখেই তারা বুঝতে পারেন, লোকটি অভাবগ্রস্ত। তাই মানবতার খাতিরে অনেকেই সাহায্য প্রদান করছেন। আমাদের দেশের সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষুকদের ন্যায় আহাজারী বা করুণ কাকুতি মিনতি নেই। এদেশে ভিক্ষার মধ্যেও একটা ভদ্রতা বা শালীনতা দেখা যায়।

আমাদের গন্তব্য ষ্টেশনে নেমে দেখি এক মহিলা তার মাথার কাছে একটি চামড়ার ব্যাগ রেখে সটান শুয়ে আছেন। এখানেও লোকে সাহায্য দিচ্ছেন। এ দেশে বেকার ও অভাবগ্রস্তদের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন তারা এভাবে সাহায্য নিচ্ছে—জিজ্ঞেস করে জানলাম, এদের কোন ঘরবাড়ী নাই। তাই সরকার থেকে কোন ভাতা পায় না। পরের সাহায্যের উপরই জীবিকা নির্বাহ করে। একটি সভ্য জাতির দেশে এরূপ সাহায্য ভিক্ষা করা বিসদৃশ মনে হ'ল। এরূপ ঠিকানা বিহীন অভাবী লোকদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্য ষ্টেট থেকে সাহায্য বা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরদিন সকালে আবার জার্মান এ্যাম্বেসীতে যাই, ভিসার জন্য। যথারীতি দরখাস্ত দাখিল করলে ভিসা কর্মকর্তা আমার পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে আমাকে ছয় সপ্তাহ পর আসতে বলেন। তাঁকে জানাই, এক সপ্তাহ পর আমি আমেরিকায় যাব। তার পূর্বেই আমি জার্মান ঘুরে আসতে চাই। আমাকে মাত্র দুই দিনের জন্য ভিসা দিলে আমি আপনাদের দেশটা দেখে আসতে পারি। কিন্তু

তিনি ভিসা দিতে সম্মত হন না। 'ছয় সপ্তাহ পর আসুন' বলে চুপ থাকেন। বুঝলাম, এঁরা এককথার মানুষ। একবার যা বলেন, কোন মতেই তার অন্যথা হয় না। মানুষের প্রয়োজন এবং সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করা যেন তাদের নীতি বহির্ভূত। অযথা বাক্য ব্যয় না ক'রে ঘরে ফিরে ব্রিমেনে ডঃ মোখলেসুর রহমানকে টেলিফোনে বিষয়টি অবহিত করি। সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর ভিসা লাভে ব্যর্থ হয়ে ফ্রান্সের ভিসার জন্য আর চেষ্টা করি না।

একদিন ডাকযোগে গাল্‌ফ এয়ার লাইন্‌সের জনাব হাফিজ সাঈদ প্রেরিত পয়ত্রিশ পাউণ্ড (বাংলাদেশী ২৪৫০ টাকা) ঘরে বসে মণি অর্ডারে পেয়ে যাই। আমার হারানো লাগেজের জন্য লণ্ডন পৌঁছার পরদিন আমাকে হিথ্রো এয়ার-পোর্টে যেতে হয়েছিল, তার জন্য এ টাকা। সামান্য দু'তিন পাউণ্ড খরচ করে এয়ারপোর্টে যাওয়ায় এত অধিক অর্থ পাব—এটা কল্পনাও করিনি। ভাবলাম, বাংলাদেশে হলে কি এত সহজে বিনা তদবীর তাগাদায় এরূপ ক্ষতিপূরণ মিলতো? এঁদের সৎ ও উদার মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই।

একদিন ট্রেন ভ্রমণকালে বগির গায়ে একটি আসনের উপরে লেখা দেখলাম ঃ Please give up this seat to an elderly or handicapped passenger, if he needs it. অর্থাৎ এই আসনটি কোন বয়ঃবৃদ্ধ বা পঙ্গু যাত্রীকে ছেড়ে দিন, যদি তাঁর প্রয়োজন থাকে। আমি একজন শক্তি সামর্থ্যবান বৃদ্ধ হলেও উক্ত সিটে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি আমাকে সিটটি ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আপত্তি করলাম; তবু তিনি শুনলেন না। তিনি বললেন, আপনি বৃদ্ধ লোক, আপনার জন্য সিট দেয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব। যাত্রীটির ব্যবহারে প্রীত হই। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনার বাড়ী কোথায়? তিনি উত্তর দেন—করাচী। ভদ্রলোক আমাকে পাল্টা বলেন,—আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? আমি বললাম, জী হাঁ। তাঁর ব্যবহারে ও আলাপে বুঝতে পারলাম, এখনও কোন কোন পাকিস্তানীর মনে বাংলাদেশীদের প্রতি মমত্ববোধ রয়েছে।

বাসে বা ট্রেনে বৃদ্ধ বা দুর্বলের জন্য নিজের সিট ছেড়ে দেবার মত উদার মানসিকতা আমাদের দেশে আজও গড়ে ওঠেনি। তবু দু'চারজন ছাত্র বা যুবককে এরূপ করতে দেখা যায়।

ট্রেন থেকে নেমে বাসে শহরে যাবার পথে বাসের গায়ে লেখা দেখি ঃ 'No Smoking on London's Buses. Smoking is not allowed anywhere on London's Buses. Your co-operation is appreciated. Maximum penalty £ 400·00'—লণ্ডনের বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ। লণ্ডন সিটিতে বাসে কোথাও ধূমপানের বিধান নাই। এ—ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা কাম্য। কেউ ধূমপান করলে সর্বোচ্চ জরিমানা চার শ' পাউণ্ড (বাংলাদেশী ২৮ হাজার টাকা)।

লণ্ডনে যতদিন ছিলাম বাসে বা ট্রেনে কাউকে ধূমপান করতে দেখিনি। আইনের শাসন এখানে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিপালিত হয়। আমাদের দেশে বাসে

ধূমপান নিষিদ্ধ না করায় ধূমপায়ী যাত্রীদের সিগারেটের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। অনেকে দুর্গন্ধে বাসের মধ্যেই বমি করে ফেলে; তবু ধূমপায়ীরা বেপরোয়া। বাংলাদেশে সিনেমা হলে ধূমপান নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও 'বিশ্রাম' সময়ে অনেকেই হলের মধ্যে ধূমপান করে। আইন প্রয়োগের শিথিলতার জন্যই তারা অন্যায় করতে প্রশ্রয় পায়। বাংলাদেশ সরকার বিবাহে যৌতুক প্রথা বেআইনী করেছেন, অথচ কয়জন মেয়ের পিতা যৌতুক ছাড়া মেয়ে বিদায় করতে পারেন? এমন কি কৃষক শ্রমিক পরিবারেও এই দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি অনুপ্রবেশ করেছে। যৌতুক প্রদানে অসমর্থ পিতা-মাতা তাদের কন্যাকে আইবুড়ো রাখ্‌তে বাধ্য হচ্ছেন। এ ব্যাপারে মহিলা সমাজের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লণ্ডনে যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ থাকলেও শহরের বিভিন্ন পার্কে ও রাস্তায় বহু মহিলা ও পুরুষকে ধূমপান করতে দেখেছি। অনেক স্থানে বোর্ডে হুঁশিয়ারী বাণী লেখা আছে—'গর্ভবতী মহিলাগণ ধূমপান করলে তাদের পেটের সন্তানের ক্ষতি হ'তে পারে, এমনকি সন্তান মারা যেতে পারে'। এরূপ সতর্কবাণী সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে মনে হয় এদেশে পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই সংখ্যায় অধিক ধূমপায়ী। ধূমপানে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফুসফুসে ক্যান্সার রোগ জন্মে, অকালে মৃত্যু ঘটে; এসব কথা জানা সত্ত্বেও উন্নত সভ্য সমাজের সুশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলারা কেন ধূমপান করেন? তাঁরা কি ইচ্ছা করলে ধূমপানের বদঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না? ইচ্ছাটারই তাদের মধ্যে অভাব। জনস্বাস্থ্যের খাতিরে বিশ্বের সকল দেশেই ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ। ইরান সরকার ধূমপায়ীদের জন্য সরকারী চাকুরী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৭ই জুলাই লণ্ডনের হ্যাক্‌নি টাউন হলে বিকেল তিনটায় ব্যারিস্টার আব্বাসের দ্বাদশতম 'মৃত্যু-বার্ষিকী' অনুষ্ঠান ছিল। স্নেহভাজন ব্যারিস্টার আজহার আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পূর্বাহ্নেই দাওয়াৎ ক'রে রেখেছিল। লণ্ডনস্থ পাকিস্তান সমিতি অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

আমাকে দ্বিপ্রহরে ব্যারিস্টার আজহারের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কেটে যায় এবং আমার আপত্তি সত্ত্বেও কমপ্লিট সেট, কয়েকটি সার্ট, মোজা ইত্যাদি উপহার স্বরূপ কিনে দেয়। তার বেগম আমার গৃহিনীর জন্য শাড়ী, জামা, চাদর উপহার দেয়। আমি কোট, প্যান্ট, সার্ট পরি না—বলা সত্ত্বেও 'সামান্য কিছু স্মৃতি, না নিলে দুঃখিত হব'—বলায় না নিয়ে পারি না। অবশ্য বাংলাদেশে ফিরলে স্নেহভাজনেরা স্মৃতিগুলো দখল ক'রে নেয়; কারণ তারা ভাল করেই জানে এ-সব দামী পোষাক একদিনের জন্যও আমার কাজে আস্‌বে না।

ব্যারিস্টার আজহারের বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে যথাসময়ে হ্যাকনি টাউন হলে পৌঁছি। প্রশস্ত সুন্দর সুসজ্জিত হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রধান অতিথি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র প্রাইভেট সেক্রেটারী

জনাব জেড, এ, সুলেরী। তিনি তখনও এসে পৌঁছাননি। হল প্রায় পূর্ণ। আমার জন্য নির্ধারিত বিশেষ অতিথির আসনে আমাকে বসানো হ'ল। অনেকেই নিজ নিজ আসন ছেড়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মিলালেন এবং আত্মপরিচয় দিলেন। ঠিক তিনটায় কোরআন মজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হ্যাকনি কাউন্সিলের মেয়র জনাব শেখ সুজা। বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল হাই, জনাব আজিজুল হক, ব্যারিষ্টার হামিদুর রহমান, ব্যারিষ্টার আলী আজহার, গোলাম নবী, ব্যারিষ্টার—ইউসুফ আখতার, সেলিম কোরায়শী, ফজলুর রহমান, সুলতান আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শুরুর অল্পক্ষণ পরই প্রধান অতিথি জনাব সুলেরী এসে আসন গ্রহণ করেন। তাঁর আগমনে অনুষ্ঠান আরো আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠে। একটি আনন্দ গুঞ্জরণ পরিশ্রুত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য পেশের পর আমাকে বক্তব্য রাখার আহবান জানানো হয়। আমার বক্তৃতার প্রথমেই আমাকে অদ্যকার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করায় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। অতঃপর আমার সঙ্গে মরহুম ব্যারিষ্টার আব্বাসের সম্পর্ক এবং তার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনান্তে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করি। আমার পরে প্রধান অতিথি জনাব সুলেরী তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও ব্যারিষ্টার আব্বাসের অবদান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন। সভাপতির সারগর্ভ ভাষণ দানের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। অনুষ্ঠানটির ভিডিও ক্যাসেট করা হয়। পাঁচ ঘন্টা অনুষ্ঠানটি চলে।

শেষপর্বে ছিল আপ্যায়ন। এই অবসরে অনেকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ ঘটে। ব্যারিষ্টার গোলাম নবী এককালে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পাকিস্তানীদের শিক্ষার জন্য লণ্ডনে শতাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। লণ্ডনে এই ধরণের শিক্ষা আন্দোলনের হোতা ছিলেন ব্যারিষ্টার আলী আব্বাস। বর্তমানে তাঁর উত্তরসূরী অনেকেই কাজটি চালু রেখেছেন। পাবনার ফজলুর রহমান, সিলেটের মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ও আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেকেই আমার ঠিকানা লিখে নেন এবং তাঁদের ঠিকানা আমাকে দেন। আমি আমার নোট বইয়ে জনাব সুলেরীর অটোগ্রাফ গ্রহণ করি। সুলেরী সাহেবের বর্তমান বয়স ৮৭ বৎসর। তিনি বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম লীগের সভাপতি।

অনুষ্ঠান পর জনাব আজিজুল হক বিকেল আটটায় আমাকে আলী আসগারের বাসায় পৌঁছে দেন। রাতে হঠাৎ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। পরবর্তী দুইদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী আসগার আমার জন্য অনেক ঔষধ পথ্য এনে দেয়। ক্রমে সুস্থ হই। আমাকে বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেওয়ায় আর বাইরে বের হই না। ভেবে আশ্চর্য হই বিলেতী 'ফ্লু' এত ভয়ঙ্কর!

দু'দিন ঘরে বসে থাকায় আমার বরং একদিক দিয়ে ভালই হয়। হাতে প্রচুর সময় পাওয়ায় লণ্ডনের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও বই পড়ার সুযোগ পাই। লণ্ডনের বাংলা নিউজ উইকলি 'সুরমা' পত্রিকায় (৫ | ৭ | ৯১) আমার লণ্ডনে উপস্থিতির খবর প্রকাশিত হওয়ায় কয়েক জন বাংলাদেশী আমার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেন।

ইসলাম ও মুসলিম

সাউথ আফ্রিকার বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, যুক্তিবিদ, তার্কিক ও সুবক্তা জনাব আহমেদ দীদাত লিখিত 'What the Bible says about Mohammed (sm.) বইটি পড়ি। খুব ভাল লাগে। অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি সমগ্র বিশ্বে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য Islamic propagation centre International প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির ইংল্যাণ্ডের ঠিকানা ঃ 481, Conventry Road, Small Heath, Barmingham B10 OJS, U. K.

এই সংস্থা থেকে ইসলাম সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তা' বিনামূল্যে বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা হয়। আমি সাতটি বইয়ের জন্য চিঠি লিখি। ছয় দিনের মধ্যেই বইগুলো পেয়ে যাই। সব বই ইংরেজী ভাষায়। যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাঁদের জন্য সংস্থাটির ঠিকানা উল্লেখ করলাম।

ইসলাম প্রচারের এই মহৎ কাজে শরীক হবার জন্য যে কোন ইসলাম দরদী মুসলিম ভ্রাতাভগ্নি যে কোন দান, জাকাত ইত্যাদি সাহায্য স্বরূপ পাঠাতে পারেন। সংস্থাটির প্রচারপত্রে বলা হয়েছে ঃ

Islamic propagation centre is devoted to the cause of Islam. It is an independent charity Trust. It is not affiliated to or allied with any other establishment, Sect or School of thought. It organises lecture and talks, distributes free literature to non-muslims and educated Muslims on Islam and comparative religions.

It does not receive help or grant from any other country or Govt.. It relies on your support to carry out its activities.

IPCI needs your help. To please, wan't you help us ?

এই সংস্থা হতে জনাব আহমেদ দীদাত-এর বক্তৃতাসমূহের অডিও টেপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণে বিক্রী হয়। টেপ বিক্রীত অর্থে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ইসলামী সাহিত্যসমূহ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত জুলু ও আরবী ভাষায় কোরআন মজীদ ও বহু ইসলামী গ্রন্থ মুদ্রণ ক'রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারিত এবং বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের উপর সপ্তাহ বা মাসব্যাপী শিক্ষা কোর্স পরিচালিত হয়।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের মুসলমানের সংখ্যা বিশ লাখের অধিক। তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লণ্ডনের বাসিন্দা। শুধু মাত্র লণ্ডন সিটিতে বার শত মসজিদ আছে। তন্মধ্যে ৮০০টি মসজিদে তবলীগ জামাত রয়েছে। ১৯৯১ সালের রমজান শেষে লণ্ডন শহর হতে ৮০০টি জামাত লণ্ডনের বাইরে তবলীগে বের হয় এবং একশত জামাত লণ্ডন সিটির মধ্যে তবলীগরত থাকে।

ত্রাণ সংস্থা ঃ

লণ্ডনে বহু সংখ্যক ত্রাণ সংস্থা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮৭ ও '৮৮ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য দানের জন্য আন্তর্জাতিক বাঙ্গালী সংস্থা, ওয়ালথাম ফরেস্ট বাংলাদেশী মহিলা সমিতি ও আরো বহু প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

লণ্ডন মহিলা সমিতি মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক সেমিনারের আয়োজন করেন। উদ্যোক্তাগণ বলেন, আমরা মেয়েরাই আমাদের পরিবারের সবাইকে দেখাশোনা ও সেবাযত্ন করি। তাই আমাদিগকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুকল্যাণ ও সেবাযত্ন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই এ-সেমিনারের আয়োজন।

ইসলামী সংস্থা ঃ বৃটেনবাসীদের কাছে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার জন্য রয়েছে—'ইসলামিক পার্টি অব বৃটেন' ইসলামিক সোসাইটি, ওকিং মস্ক ইসলামিক সেন্টার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ সেন্টার এবং আরো অনেক ইসলামী প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের সংগঠিত করা এই সব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান।

শিক্ষা সম্পর্কে

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাব্যবস্থা মোটামুটি পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। (১) ৪—৭ বৎসর বয়স্ক শিশুরা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। (২) ৭—১১ বৎসর বয়স্কগণ প্রাইমারী স্কুলে, (৩) ১১—১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেকেন্ডারী বা মাধ্যমিক স্কুলে, (৪) ১৬—১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত এ-লেভেল (উচ্চ মাধ্যমিক) এবং (৫) ১৮—২১ বৎসর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লেখাপড়া করে। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সরকারী স্কুল হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার বহণ করেন। কিছুসংখ্যক প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তন্মধ্যে বার্মিংহামের দারুল উলুম ইসলামিয়া স্কুল ও কলেজ (৫২১ কভেন্ট্রি রোডে) বাংলাদেশীদের প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ষ্টেট কারিকুলাম অনুযায়ী 'এ' লেভেল শিক্ষার সাথে কোরআন, হাদিস, ফেকা, উসুল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীগণ শুধু মাত্র পাঠ্য বই-ই পড়ে না ; জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তারা লাইব্রেরীতে বসে নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন বই পড়ে থাকে। যারা পরীক্ষায় ভাল ফল করে সরকার তাদিগকে গ্রান্ট প্রদান করেন। এটা এক ধরণের বৃত্তি। কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কোন ছাত্রছাত্রীকে

প্রাইভেট পড়ান না। তাদের প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয় না। অন্যান্যদের প্রাইভেট পড়ানোর জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। তাঁরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করেন। এদেশে পরীক্ষায় নকলের প্রচলন নাই। হঠাৎ কেউ নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা হয়। কোথাও ছাত্র-রাজনীতি নাই। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ও খেলাধুলাই প্রধান কাজ।

ইংল্যান্ডে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার মাসিক বেতন ১২০০ পাউন্ড (বাংলাদেশী ৮৪,০০০ টাকা) এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ৫,০০০ পাউণ্ড।

জনসংখ্যা

বৃটেনের জনসংখ্যা ৬০ মিলিয়ন (৬ কোটি); তন্মধ্যে খৃষ্টান ৫ কোটি ৩০ লক্ষ, ইহুদী ৪০ লক্ষ, মুসলমান ২০ লক্ষ ও অন্যান্য জাতি ১০ লক্ষ (১৯৯২)। লন্ডন শহরের লোকসংখ্যা ১২ মিলিয়ন (১ কোটি বিশ লক্ষ); তন্মধ্যে শতকরা নব্বই-জন খৃষ্টান এবং শতকরা দশজন অন্যান্য জাতি।

এখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশংসনীয় সম্প্রীতি বিরাজমান। প্রত্যেক সম্প্রদায় যার যার ধর্ম নিবিঘ্নে পালন ক'রে থাকেন। এদেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ, সংঘাত বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা কোন দিনও ঘটেনি বলে জানা গেল।

সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা

লণ্ডন সিটি হতে সরমা, নতুন দিন, জনমত, নতুন দেশ, দেশবার্তা, জাগরণ প্রভৃতি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের অনেক খবর পরিবেশিত হয়। কয়েকটি পত্রিকার ঠিকানা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

১। সাপ্তাহিক সুরমা, সম্পাদক ঃ নজরুল ইসলাম বাশন।
৪০, ওয়েসেক্স স্ট্রিট, লণ্ডন ই-২, ও-এল-বি, ইউ, কে,।

২। সাপ্তাহিক জনমত · সম্পাদক ঃ সৈয়দ সামছুল হক।
৪০, সেলকার্ক রোড, লণ্ডন-এস-ডব্লিউ-১৭, ও-ই-এস, ইউ, কে,।

৩। সাপ্তাহিক নতুন দিন
১৩০, শারল্যাণ্ড রোড, গার্ডেন ফ্লোর, লণ্ডন ডব্লিউ-৯, ২ বি, টি, ইউ, কে,।

৪। সাপ্তাহিক নতুন দেশ
২১৮, উইকহাম হাউজ, ১০ ক্লিবল্যাণ্ড ওয়ে, লন্ডন ই-১, ৪ টি, আর, ইউ, কে,।

অন্যান্য পত্রিকার ঠিকানা না জানায় উল্লেখ করা গেল না।

আয়কর

বৃটেনে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের জন্য কোন আয়কর দিতে হয় না। ৫০০১-২০,০০০ পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের জন্য আয়কর ২৫%, ২০,০০১-৩০,০০০ পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জন্য আয়কর ৩০% এবং ৪৫,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত আয়ের জন্য আয়কর ৫০%। চাকুরীজীবীদেরক্ষেত্রে প্রতি মাসের বেতন প্রদানকালে হিসেবমত আয়কর কর্তন ক'রে রাখা হয়।

মাথাপিছু আয়

ইংল্যাণ্ডে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের গড়পরতা সাপ্তাহিক আয় ১৫০ পাউণ্ড (বাংলাদেশী মুদ্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা)।

বৃটেন, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় নিম্নরূপ (১৯৯২ সালের তথ্য) ঃ

বৃটেন	১৭,৭৫৪	মার্কিন ডলার
সিঙ্গাপুর	১৩,৬০০	,, ,,
বাংলাদেশ	২০৮	,, ,,

(এশিয়া উইক, ২৮ | ২ | ১৯৯২)

বাংলাদেশের স্থান কোথায় এ-তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যায়।

বেকার ভাতা

ইংল্যান্ডে বেকারদিগকে নিম্নোক্ত হারে সরকার 'বেকার ভাতা' প্রদান ক'রে থাকেন ঃ

স্বামী, স্ত্রী ও এক সন্তানের পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে ৮০ পাউণ্ড, একক ব্যক্তির (পুরুষ বা মহিলা) জন্য ৪০ পাউন্ড এবং ১—১৬ বৎসর বয়স্ক প্রতি ছেলে / মেয়ের জন্য সপ্তাহে ৮ পাউন্ড হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয়।

মদ্যপান

বৃটেনের অধিবাসীগণ শতকরা ৯৯ জন মদ্যপায়ী। তারা মদকে পানির ন্যায় বা পানীয় বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেন। এদেশে বসবাসকারী স্থানীয় ও বিদেশী মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ধর্মভীরু তাঁরা মদকে হারাম (নিষিদ্ধ) জেনে পরিহার ক'রে চলেন। ধর্মের প্রতি আস্থাহীন মুসলমানগণ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। তারা হারাম হালালের পরোয়া করে না। অবশ্য তাদের সংখ্যা নগণ্য।

রাজনীতি সমাচার

ইংল্যান্ডের ২টি রাজনৈতিক দল ঃ (১) শ্রমিক দল (Labour Party) ও (২) রক্ষণশীল দল (Conservative Party) জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। বৃটিশ পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) দুই স্তরে বিভক্ত ঃ নিম্ন পরিষদ—'হাউজ অব কমনস' এবং উচ্চ পরিষদ—'হাউজ অব লর্ডস'।

আবহমানকাল হতে এখানে রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞী। রাণী প্রশাসনিক প্রধান হলেও সর্বময় ক্ষমতা মন্ত্রী পরিষদ ও পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকে।

ইংল্যান্ডের সংবিধানে আছে—দেশের রাজা বা রাণীকে অবশ্যই প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টান হতে হবে। ক্যাথলিক খৃস্টান রাজা বা রাণী হতে পারবেন না।

বৃটিশ নাগরিকগণ রাজারাণীকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকেন। তাদের মতে 'King can do no wrong'—অর্থাৎ রাজা (বা রাণী) কোন অন্যায় করতে পারেন না। কিন্তু রাজপরিবারের কিছু অপ্রীতিকর কার্যকলাপের দরুণ এই ধারণা কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বৃটিশ রাজপরিবার বর্তমানে অনেকটা বিপর্যয়ের মুখে। আয়করমুক্ত রাজপরিবারের জৌলুষ ও অপরিমিত ব্যয় অনেকের নিকট সমালোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছে।

রাজপরিবারের কোন কোন সদস্যের অপরিণামদর্শিতার কারণে যেভাবে রাণীর মর্যাদাহানি হতে চলেছে, তাতে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেকের মনে সংশয় দানা বেঁধে উঠ্ছে।

বৃটেন পার্লামেন্ট সদস্যগণ অবসর গ্রহনকালে যে পরিমাণ বাৎসরিক পেনশন পান তা' নিম্নরূপ ঃ

$$\text{পেনশন} = \frac{\text{মূল বেতন} \times \text{যত বৎসর এম, পি, ছিলেন}}{৫০} \text{ (পাউণ্ড)}।$$

বৃটেনে পার্লামেন্ট সদস্যগণ দুর্নীতির জন্য শাস্তির হাত থেকে রেহাই পান না। লিভারপুলের লেবার পার্টির এম, পি, মিঃ টরী ফিল্ড পোলট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে দু'মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। চরিত্রহীনতা অপরাধে দু'জন এম, পি,-র সংসদ-সদস্যপদ বাতিল করা হয়।

বৃটেনস্থ বাংলাদেশীগণ সম্যক রাজনীতি সচেতন। কেবল মাত্র লণ্ডনের বিভিন্ন বোরোতে আট জন বাংলাদেশী নির্বাচিত কাউন্সিলর আছেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশী কোন সদস্য না থাক্লেও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশীগণ স্থান ক'রে নিতে পারবেন।

বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রভাব

আমাদের দেশ দু' শ' বছর ইংরেজের অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় আমাদের মন মগজে, বেশভূষায় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয়তা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। তাদের শাসন আমলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সামন্তবাদী শাসকদের প্রয়োজনে ছাপোষা কেরাণী, মুসুদ্দী তৈরীর শিক্ষা—যা আদর্শ চরিত্র গঠণের পরিবর্তে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী সৃষ্টি করতো। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘকাল পরও সেই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হওয়ায় চরিত্রহীনতার কারণে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দেশকে গ্রাস করতে বসেছে। আদর্শ চরিত্র গঠণমূলক বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় চরিত্রের উন্নতি আশা করা যায় না।

শুধু মাত্র দুর্নীতি ও সন্ত্রাসই কোন জাতিকে ধ্বংস করে না, অপ-সংস্কৃতির আগ্রাসনে জাতির যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা' সর্বাধিক মারাত্মক। এটিকে পারমাণবিক বোমার চেয়েও অধিক শক্তিসম্পন্ন জাতি-বিধ্বংসী অস্ত্র বলা যেতে পারে।

জাতীয় ঐতিহ্য জাতির গর্বের বস্তু। বেশভূষা ও আচার আচরণে আমরা বিশেষ ক'রে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ বনে উঠেছি। কোট, প্যান্ট, নেকটাই গরম দেশেও আমরা উচ্চ মর্যাদার মাপকাঠি মনে করি। ইসলামী পোষাক পরিধান করাকে উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম সমাজের অনেকেই হীনমন্যতাজ্ঞান করেন। কারণ তাঁদের অন্তরে ইংরেজের সংস্কৃতি গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। ইসলামের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের অভাবই এর মূল কারণ।

ইংরেজ শাসকদের কল্যাণে ইসলামী লেবাস, আসকান, পাজামা, টুপি, পাগড়ী আদালতের চাপরাশীদের পোষাকে পরিণত হয়েছে। এখনও তা' বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখিনা, ইংরেজ জাতি মুসলমানদের রাজ্যচ্যুত ক'রে তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত করার জন্যই বাদশা, আমির, নবাবদের পোষাক পরিয়েছে খানসামা চাপরাশীদেরকে।

আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে দুর্নীতির মূল কারণ ধর্মীয় চরিত্রের অভাব। ধর্মের প্রতি যাদের অন্তরে এতটুকু বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাবোধ নেই, তারা বিনাদ্বিধায় অম্লান বদনে দুর্নীতির সাগরে অবগাহন করে।

আজও উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম সমাজে কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এটাও ইংরেজের প্রথা—আমাদের মধ্যে চোরাপথে অনুপ্রবেশ করেছে। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে কেন আমরা কুন্ঠিত হই?

বিভিন্ন মাজারে, স্মৃতিসৌধে, সমাধিতে ফাতেহা শরীফ পাঠ ক'রে মোনাযাত করার পরিবর্তে পুষ্পস্তবক, পুষ্পাঞ্জলী বা পুষ্পমাল্য দান মুসলমানদের জন্য শেরেকী নয় কি? এরূপ বহু অপসংস্কৃতি আমাদের কোন পথে নিয়ে চলেছে, তা' আমরা আদৌ চিন্তা করি কি? অপসংস্কৃতির কবল হতে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা কি জাতীয় কর্তব্য নয়?

একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ইংরেজ শাসকগণ আমাদের কিছুটা হলেও জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করেছেন। তাদের কল্যাণে আমরা ইংরেজী ভাষা শিখ্‌তে পেরেছি, দেশের অনেক রাস্তা ঘাট, রেল লাইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাঁদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হলেও আমরা তা' দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। এ জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতার্থ।

●

আমেরিকায় তিন মাস

দশই জুলাই সকাল ৯-৫৫ মিনিটে লণ্ডন থেকে ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের বিমানে রওনা হ'য়ে বিকেল দেড়টায় নিউইয়র্কে পৌঁছি। ছোট ভাই সোহ্‌রাব হোসেন পেনসেল্‌ভেনিয়া ষ্টেটের ফেয়ারলেসহিলস থেকে আসে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। সে তার কারসহ নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। নিউইয়র্কে অবস্থানরত ছোট ভাই শরীফুল আলম ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টর পদে নতুন চাকুরীতে যোগদান করায় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যস্ত থাকায় তারপক্ষে বিমান বন্দরে আসা সম্ভব হয় না। তাই সে টেলিফোনে যে-ভাই তার নিকটবর্তী (৭৫ মাইল দূরে) থাকে, তাকেই আস্‌তে বলেছিল। অপর ভাই ডাঃ আল্‌হাজ্ব সিরাজুল ইসলাম সহস্রাধিক মাইল দূরে ফ্লোরিডায় থাকে।

বিমান বন্দরে আমার হারিয়ে যাওয়া লাগেজের (হ্যাণ্ডব্যাগের) স্লিপখানা ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের অফিসে জমা দিলে আমাকে আর একখানা রশিদ লিখে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার বলেন, 'ব্যাগটি পাওয়া গেলে আপনার নিউইয়র্কের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া হবে।' কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের পর আমরা বিমান বন্দর থেকে বের হই এবং ৩০ মাইল দূরে নিউইয়র্কের ভার্জিনিয়া এভিনিউতে শরীফের বাসায় উঠি। সেখানে পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় শরীফের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। বৌমা পারভিন ও ভাতিজা পিয়ালের সঙ্গে গল্পে ও খানাপিনায় সময় কেটে যায়।

সাতটায় শরীফ অফিস থেকে বাসায় ফেরে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমরা পেনসেল্‌ভেনিয়ার পথে রওনা হই। দু'ঘন্টায় ৭৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রাত দশটার পূর্বেই আমরা ফেয়ারলেসহিলসে সোহ্‌রাবের বাড়ী পৌঁছি। বৌমা মেরিলী, ভাতিজী আশা ও ভাতিজা ওমর, এরিক ও রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায় সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হই। ভাতিজী আশা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ে। ওমর ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। অপর দুই ভাতিজা যমজ সন্তান, তারা উভয়েই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর খাবার টেবিলে যাই এবং সবাই একত্রে আহার করি। অতঃপর আমার জন্য নির্দ্ধারিত দ্বিতলের এক কক্ষে গিয়ে শয়ন করি।

পরদিন সোহ্‌রাবের বাড়ী থেকে অল্পদূরে লোয়ার বাক্স কাউন্টির ফ্যামিলি ওয়াই এম সি এ (Y M C A) ক্লাব দেখ্‌তে যাই ভাই-ভাতিজাদের সঙ্গে। এটি একটি উন্নত মানের সংস্থা। এখানে বিভিন্ন প্রকার খেলা, শরীরচর্চা, সাঁতার শেখা প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের সাঁতার শেখা স্কুলে প্রি-স্কুল সুইম প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। অতঃপর ফেয়ারলেসহিলসে দীর্ঘ চিমনি বিশিষ্ট উইলিয়াম পেন হাই স্কুল দেখি। শীতকালে স্কুলগৃহ গরম রাখার জন্য চুল্লীর ব্যবস্থা থাকায় ধূম্র উদ্‌গীরণের জন্য চিমনি রয়েছে।

ট্রেনটন

সোহ্‌রাবের সঙ্গে প্রাচীন শহর ফলসিংটন ও ইয়ার্ডলি অতিক্রম ক'রে ওয়াশিংটন ক্রসিং পার্কে যাই। পার্কটি নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত।

আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যখন ইংরেজদের গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ ছিল, তখন এই স্থানের সন্নিকটে ট্রেনটন নামক স্থানে বৃটিশ সৈন্যদের একটি ঘাটি ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন ডেলোয়ারা নদী অতিক্রম করে তাঁর সেনা-বাহিনী নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এখানকার প্রথম ও প্রধান যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যগণ পরাজয় বরণ করেন।

ট্রেনটন নিউজার্সি ষ্টেটের রাজধানী। এখানে বসত শুরু হয় ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হতে। ডেলোয়ারা নদীর অববাহিকায় সর্বপ্রথম একটি মিল ভবন নির্মিত হয়। এই অঞ্চলে জলজাহাজ যাতায়াত ও শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ফিলাডেল-ফিয়ার শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করে। মিঃ উইলিয়াম ট্রেন্ট নামে জনৈক শিল্প-পতি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত মিলটি ক্রয় করেন এবং তথায় তিনি একটি শহর গড়ে তোলেন। তাঁর নাম অনুসারে শহরটির নাম হয় ট্রেনটন। সেনাধ্যক্ষ কাওয়ালিশের পরিচালনাধীনে ইংরেজ সৈন্যগণ নিউজার্সি অতিক্রম ক'রে পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটে প্রবেশ করে এবং আমেরিকান সৈন্যদের বিতাড়িত ক'রে শহর পুনর্দখল করে। একই বৎসরের শেষভাগে ২৬শে ডিসেম্বর বরফ জমা ডিলোয়ারা নদী অতিক্রম করে এক হাজার কয়েদীসহ জর্জ ওয়াশিংটনের সহসা আক্রমণ ইংরেজ সৈন্যদের হতবাক করে। ১৭৭৭ সালের ২রা জানুয়ারী ট্রেনটনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন পুনরায় বিজয় লাভ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ট্রেনটনে নিউজার্সি ষ্টেটের পাকাপোক্ত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সর্বপ্রথম সুসজ্জিত ষ্টিমবোট জনফিশ (John Fitch) ট্রেনটন থেকে প্রত্যহ ফিলাডেলফিয়া চলাচল করতে থাকে। ফিলাডেলফিয়া পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের সর্ববৃহৎ শহর। ট্রেনটনে দ্রুত শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। রাবার, ইস্পাত নির্মিত ক্যাবল, চিনামাটি ও পোরসিলিন শিল্প বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়ে। দেশবিদেশ থেকে এখানে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম ও বহুসংখ্যক উন্নত মানের অট্টালিকা।

আমরা ট্রেনটনের অফিস ভবনসমূহ, গভর্ণর হাউস, পার্লামেন্ট ভবন, নিউজার্সি ষ্টেট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটরিয়াম দেখি। মিউজিয়ামটি নিউজার্সি কালচারাল সেন্টারের ত্রিতল ভবনে প্রতিষ্ঠিত। তিন তলাতেই দর্শনীয় বস্তুসমূহ সুসজ্জিত রয়েছে। এখানে প্রত্নতত্ত্ব, সূচীশিল্প, কারুশিল্প, ফাইন আর্ট, সংস্কৃতি-মূলক ও ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক কিছু দেখি। অতঃপর ডাইনোসর ও বিভিন্ন জীবজন্তুর কংকাল এবং প্রস্তরীভূত দেহ দেখে জ্যোতি-বিজ্ঞান (Planetorium) গ্যালারীতে যাই। এখানে 'গ্রীষ্মের আকাশ' প্রত্যক্ষ করি। এ থেকে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মে। আমেরিকা মহা-দেশের মধ্যে এই স্থানেই (ট্রেনটনে) সর্বপ্রথম ডাইনোসর আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়।

আমরা বিকেলে ট্রেনটন মসজিদে জামাতে আছরের নামাজ আদায় করি এবং নামাজ পর উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা রাখি। তাঁরা প্রায় সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। মনে হয়, তাঁদের পূর্ব পুরুষ আফ্রিকা হতে আগত অথবা তাঁরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। তাঁদের সঙ্গে আলাপে বুঝতে পারলাম, ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের ভাল জ্ঞান আছে। এমনকি তাঁদের অধিকাংশই নামাজে যে-সব সূরা পড়া হয় তার অর্থ বোঝেন। আমাদের দেশের (বাংলাদেশী) সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে তাঁরা উন্নত মানের মুসলমান। আমাদের শতকরা একজন নামাজী সূরা সমূহের ও দোয়া কালামের অর্থ জানেন কিনা সন্দেহ।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেশে মুসলমানগণ ধর্মের প্রতি অধিক আগ্রহী বলে বোধ হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশেই তার প্রমাণ পেয়েছি। এ-সব দেশে অনেক মসজিদে নিয়মিত কোরআন ক্লাশ হয়। অনেকেই আগ্রহ সহকারে উপস্থিত থেকে তফ্‌সীর শোনেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান—এ সম্পর্কে তাঁদের ভাল জ্ঞান আছে। তাঁরা যে সত্যিকার ঈমানদার তা' তাঁদের ইসলামকে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখেই বোঝা যায়।

একদিন বিকেলে সোহরাবের সঙ্গে পল্লী এলাকা বা গ্রাম দেখতে যাই। স্থানটি ছিল পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের বাক্‌স কাউন্টির এলাকাভুক্ত। ফেয়ারলেস-হিল্‌স থেকে অল্প দূরে। বাংলাদেশের থানা বা ইউনিয়নের ন্যায় এ দেশের কাউন্টি—কতিপয় গ্রাম বা মহল্লা নিয়ে গঠিত। আমাদের দেশের পল্লীর সঙ্গে এ দেশের পল্লীর ঘর বাড়ীর আদৌ কোন সাদৃশ্য নাই। শহরবাসীদের ন্যায় গ্রামের লোকেরাও পাকা ভবনে বাস করেন। পার্থক্য এদের বাড়ীগুলো সাধারণতঃ একতলা বা দ্বিতল। আর শহরে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত অনেক রয়েছে। গ্রামের লোকদেরও প্রতি বাড়ীতে কার, ফ্রীজ, এয়ারকুলার, টেলিফোন ওয়াশিং মেশিন, কোল্ড ওয়াটার—হট ওয়াটার ট্যাপ—এককথায় সংসার জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। তার উপর তাদের আছে বড় বড় কৃষি খামার বাগান ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ট্রাক, ট্রাক্টর, কাটিং মেশিন, থ্রাশিং মেশিন ইত্যাদি। এদের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত।

প্রায় অর্ধ মাইল দৈর্ঘ্য একটি আপেলের বাগান দেখলাম। বৃহদাকার ঝুড়ি-সমূহ আপেলে ভর্তি করে রাখা হয়েছে। অনেকে গাছ থেকে আপেল পাড়ছে। সোহ্‌রাব গাড়ী ড্রাইভ ক'রে যাচ্ছিল আপেলের জমির পাশের রাস্তা দিয়ে। আমাদের বিদেশী দেখে একজন হাতের ইসারায় ডাক্‌লেন আপেল দেবার জন্য। কিন্তু আমরা তাঁর আহবানে সাড়া না দিয়ে গন্তব্য পথে চলে গেলাম। এ রকম আপেল, আঙ্গুর ও কমলার বাগান বহু রয়েছে। পথের দু'ধারে আবাদী জমিতে গম, ভুট্টা ও বিভিন্ন তরিতরকারীর চাষও দেখ্‌লাম।

অতঃপর আমরা রীড্‌ম্যান কার ডিলার কোম্পানী দেখ্‌তে যাই। এ-টি আমেরিকার মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় মটর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বহুসংখ্যক নতুন ও পুরাতন কার বিরাট বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিক্রীর জন্য মজুত রাখা আছে।

পথে অক্সফোর্ড ভ্যালীমল ও ল্যাংঘোরনির সিসেম প্লেস (শিশু পার্ক) দেখি। সেখানে বহুসংখ্যক শিশু-কিশোর মনের আনন্দে খেলা করছে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেশের গ্রাম-গঞ্জে অনেক শিশুপার্ক দেখা যায়। সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে এইসব পার্ক গড়ে উঠেছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি দেশের সরকার ও জনগণ অত্যন্ত যত্নশীল। তাই এদেশে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের লোক আদৌ চোখে পড়ে না।

ফিলাডেলফিয়া

একদিন বাসার সবাইকে নিয়ে ট্রেনে ফিলাডেলফিয়া শহর দেখতে যাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইংরেজ শাসনের কবল থেকে আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করলে পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের বৃহত্তম শহর ফিলাডেলফিয়ায় আমেরিকান ফেডারেল ষ্টেটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তড়িঘড়ি রাজধানী ভবন নির্মাণ করা হয়। এখানে বহুসংখ্যক করপোরেশন ভবন ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস বিদ্যমান। ছয় বছর কাল এখানে রাজধানী ছিল। ওয়াশিংটন ডি, সি-তে রাজধানী ভবনসমূহ নির্মিত হবার পর তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ছোট ভাই সোহরাব যে-কোম্পানীতে কর্মরত 'ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল' এর প্রধান কার্যালয় ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত। বিরাট ভবন। আমরা লিফ্‌টের সাহায্যে তার অফিসে উঠে সেক্রেটারী ও কর্মরত মহিলাদের দেখলাম। আমাকে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। প্রায় সবাই মহিলা। অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে তাঁরা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন। সবাই কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী। অফিসের কাজে ফাঁকি কাকে বলে তা' তাঁদের অভিধানে নাই। এদেশে বিভিন্ন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টোল আদায় কেন্দ্র ও দোকানে সাধারণতঃ মহিলাগণ কাজ করেন। মিল ফ্যাক্টরীতে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন পুরুষেরা। যাঁদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করান হয়, তাঁরা করমর্দন করে 'ধন্যবাদ' বলেই নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করেন। অযথা গল্প করে এক মিনিট সময়ও কেউ নষ্ট করেন না। আমাদের দেশের বিভিন্ন অফিসে অনেকেই কাজে ফাঁকি দিয়ে পত্রিকা বা বই পড়েন, চিঠি লেখেন অফিসের বাইরে চা পান করতে বা অন্য কাজে যান—আমেরিকায় কোন অফিসে এমনটি হবার যো নেই। সবাই কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলেন।

প্রত্যেক অফিসেই কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। কোন কোন অফিসে একজন বা দু'জনকে দেখেছি। তাঁরা কম্পিউটারের সাহায্যে একজনই দশজনের কাজ করেন। আট ঘন্টা অফিসের সময়ে তাঁরা সবাই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসেন এবং অফিস টাইমের পর বাড়ী যান। অফিসে কাউকে আপ্যায়ন করা বা এক কাপ চা বা কোক পরিবেশন করা নিষিদ্ধ। তাই অফিস দেখে বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা চা পান করি। সোহরাব আমাকে সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিন এবং প্রয়োজনে ছুটি নিয়ে বিভিন্ন স্থান দেখায়।

আমরা প্রাক্তন রাজধানী ভবন, লিবার্টি বেল, সুরহৎ লিবার্টি ভবন (১, ২) ইত্যাদি দেখি। লিবার্টি বেল একটি বিরাট ঘন্টা। এই ঘন্টা ধ্বনী দ্বারা কংগ্রেস সদস্যদের সেসনে বা অধিবেশনে ডাকা হোত। ঘন্টাটির সন্নিকটে জনৈক ব্যক্তি আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, প্রথম রাজধানী ও ঘন্টা সম্পর্কে ধারা-বর্ণনা দিচ্ছিলেন। অনেকেই সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুন্‌ছিলেন। আমরাও কিছুক্ষণ শুন্‌লাম।

এরপর ভূগহবরস্থ ফিলাডেলফিয়া রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত 'গ্যালারী মল' নামক একটি দোকানে যাই। সেখানে কিছু কেনাকাটা করা হয়। এদেশে কোনকিছু কেনার নিয়ম আমাদের দেশের মত নয়। এক একটি দোকানের আয়তন প্রায় ফুটবল মাঠের মত। দোকানের বিভিন্ন সারিতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ সাজানো থাকে। কিন্তু কোন বিক্রেতা থাকে না। যার যে জিনিষ প্রয়োজন নিজ হাতে তুলে নিয়ে দোকান থেকে বের হবার দরজার পাশে মূল্য গ্রহণের কাউন্টারে এক মহিলা কম্পিউটারসহ বসে থাকেন, তাঁর টেবিলে জিনিষ-গুলো রাখ্‌তে হয়। তিনি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করে মূল্য গ্রহণ করেন। অনেক রকমের বা বেশী পরিমাণ জিনিষ কিনলে দোকানের মধ্যে রাখা ট্রলিতে তুলে নিয়ে 'সেল কাউন্টারে' যেতে হয়। এক সঙ্গে দশ বিশখানা ট্রলি নিয়ে কাউন্টারে গেলে ক্রেতাগণ সুশৃঙ্খলভাবে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকেন। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই দাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। কম্পিউটারে প্রত্যেকের জন্য দশ বিশ সেকেণ্ডের বেশী লাগেনা। এ দেশে শতকরা নব্বইটি কিংবা তারও অধিক দোকানে কম্পিউটার থাকে। যিনি যত মূল্যের জিনিষই কিনুন না কেন, তার জন্য বিক্রয় কর (Sale Tax) অবশ্যই দেয়। এক ডলার বা তারও কম মূল্যের জিনিষ কিনলে তার জন্যও বিক্রয় কর দিতে হয়। ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির যে ভাউচার বা দামের ফর্দ কম্পিউটার থেকে পাওয়া যায়, তাতে দ্রব্যমূল্যের যোগফলের নীচে পৃথকভাবে বিক্রয় কর যোগ করা থাকে। বিক্রয় করের পরিমাণ শতকরা ছয় ডলারের অধিক নয়। ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স ফাঁকি দেবার মনোবৃত্তি নাই। তবুও মানুষের মধ্যে শতকরা দু'এক জন বিরূপ মনোভাবের থাকা অসম্ভব নয়। তার পক্ষেও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, কেননা সমস্ত বিক্রয় করের অংক কম্পিউটারে যোগ হতে থাকে। সেই হিসাবের ফর্দসহ ট্রেজারীতে বা ব্যাংকে আদায়কৃত বিক্রয় কর জমা দিতে হয়। কত সুন্দর ব্যবস্থা। ফাঁকি দেবার সুযোগ না থাকলে মানুষ সৎ না হয়ে পারে না। লাগামহীন সুযোগ মানুষকে অসৎ করে। মনে হয় ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় ও পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বিক্রয় কর সরকারের সর্বাধিক মোটা অংকের আয়।

আমাদের দেশে ইলেকট্রিক বিলে বিরাট ঘাপলার কথা শোনা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এক জনের দশটা বাল্‌ব, ফ্রিজ, ফ্যান, টিভি, হিটার ব্যবহার করা সত্ত্বেও হয়তো প্রতিমাসে তাকে দু'তিন শ' টাকা বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়, আবার কাউকে শুধু পাঁচটা বাল্‌ব জ্বালানোর জন্য সমপরিমাণ বা তারও অধিক বিদ্যুৎ

বিল দিতে হয়। মিটার রিডিং রদবদল করতে অনেকেই ওস্তাদ। যদি প্রত্যেক মিটারে নম্বরসহ কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটা লিখিত হিসাব স্লিপ বের হয়ে আস্‌তো, তা হলে ফাঁকির সুযোগ থাকতো না। মিটার মালিকগণ উক্ত স্লিপসহ ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারতেন। যত ঘাপ্‌লা হয় মিটার রীডার-দের দ্বারা। সরকারের অফিসে প্রকৃত বিদ্যুৎ খরচের অর্ধেক টাকাও জমা হয় কিনা সন্দেহ। টেলিফোন বিলের ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক ঘাপ্‌লার কথা শোনা যায়। ফাঁকিদেয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন যাত্রীরা ট্রেনে কোনদিনও টিকিট কাটে না। দু'এক টাকা হাতের মধ্যে গুজে দিলে যদি রেহাই পাওয়া যায়, টিকিট করার প্রয়োজন কোথায়? ফাঁকিবাজদের দৃষ্টিতে যারা সৎ তারাই বোকা। অবশ্য এরূপ বোকার সংখ্যা অনেক কম। তাই আমাদের দেশে ট্রেনের ভাড়া যতবারই বৃদ্ধি পাক না কেন লোকসান লাভে পরিণত হচ্ছে কৈ?

দিন শেষ হয়ে আসায় আমরা রিটেন হাউস স্কয়ার পার্ক এক নজর দেখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। পার্কটি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত।

একদিন সোহ্‌রাব ও রৌমা মেরিলী হোসেন আমাকে হারশী চকলেট টাউন, পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের রাজধানী হারিসবার্গ ও প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সময়ের আমেরিকান সিভিল ওয়ারের স্থান গেটিস্‌বার্গ দেখাতে নিয়ে যায়। স্থানসমূহ ফেয়ারলেস হিল্‌স থেকে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে অবস্থিত।

হারশী চকলেট ওয়ার্ল্ড

প্রথমে আমরা যাই হারশী চক্‌লেট ওয়ার্ল্ডে। এখানে ট্রামে চল্‌তে চল্‌তে চকলেট তৈরীর পদ্ধতি দেখি। কোকা ফলের বীজ এবং চক্‌লেট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ থেকে শুরু করে অনেক যন্ত্রের মাধ্যমে কিরূপে চকলেট তৈরী এবং প্যাকেট হয়ে বের হচ্ছে—বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করি। ফ্যাক্টরী থেকে বাইরে আসাকালে আমাদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট হারশী চকলেট উপহার দেয়া হয়। শুধু আমাদেরই নয় প্রত্যেক দর্শককেই দেয়া হয়। চক্‌লেট ওয়ার্ল্ড দেখতে কোন টিকিট লাগে না, উপরন্তু এক প্যাকেট চকলেট লাভ হয়।

ফ্যাক্টরী সংলগ্ন হারশী পার্কে কোকা গাছ, কলা গাছ, ফুল বাগান, খেলার মাঠ, চিত্তবিনোদনের স্থান, চিড়িয়াখানা, ডলফিন শো প্রভৃতি দেখে তৃপ্তি লাভ করি। এখানকার ফুল বাগানে সাদা, লাল, হলুদ বিভিন্ন রংয়ের জবা ফুল, বিগোনিয়া ও অসংখ্য অচেনা ফুল দর্শন করি। ৮৭ একর জমি নিয়ে হারশী পার্ক। ৭৩০০ দর্শক সিটে বসে হকি, ক্রিকেট, আইস স্কেটিং, কনসার্ট ও মিউজিক ইত্যাদি শো দেখ্‌তে পারেন। চিড়িয়াখানা ১১ একর জমিতে অবস্থিত। আমরা পার্কের আংশিক দেখে হারশী মিউজিয়ামে প্রবেশ করি। মিউজিয়ামের জন্য প্রবেশ ফি পূর্ণ বয়স্কদের ৩'৫০ ডলার ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (৪-১৮ বছর) জন্য ১'২৫ ডলার এবং চার বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের জন্য টিকিট লাগে না।

এখানে ৩২ ফুট লম্বা স্কী-ডেঙ্কে স্কী-খেলা এবং তার পাশে আইস স্কেটিং শিক্ষা দেয়া হয়। মিউজিয়ামটিতে অতীতকালের আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের জীবন প্রণালী, বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র, কাঠের ঘরবাড়ী, এস্কিমোদের জীবনধারা, বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল, পোলার ভল্লুক, বন্যপ্রাণী পার্ক ইত্যাদি দেখি। মিউ-জিয়ামে একটি থিয়েটার হলও রয়েছে। এখানে হারশী ওয়ার্ল্ডের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মিল্টন এস, হারশীর সন্তানকোলে একটি পোর্টেটের নীচে ইংরেজীতে লেখা আছে—"আমি একজন গরীব সন্তান ছিলাম। জনসেবার মনোবৃত্তি নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে মানবসেবা।"

করিৎকর্মা পুরুষ মিঃ হারশীর জীবনী সংক্ষেপে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। মানুষ আপন সাধনা বলে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হ'তে কিরূপে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করে বিশ্বের বুকে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন, এই মহান ব্যক্তির জীবনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মিল্টন স্যাভ্লী হারশী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পেনসেল্‌ভেনিয়া ষ্টেটের হকারভিল পল্লীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি বর্তমান হারশী শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। তাঁর পিতার ছোট্ট একটি কৃষি ফার্ম ছিল। বালক হারশীকে উক্ত ফার্মে কঠিন পরিশ্রম করতে হোত। তা' ছাড়া নিজেদের পশু পালন, জমি চাষ, জমির শষ্যাদির পরিচর্যা, কর্তন, মাড়াই, বস্তাবন্দী করা সকল কাজ তাঁকে করতে হোত। এসব দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কক্ষবিশিষ্ট একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁকে সাতটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়; কিন্তু লেখা-পড়ায় মোটেই অগ্রগতি না হওয়ায় পিতা তাঁকে স্কুল থেকে বের ক'রে এনে জার্মান ভাষার এক পত্রিকার প্রেসে কাজে লাগান। ছাপাখানার কাজ তাঁর ভাল লাগে না। অল্পদিন পরই তিনি ল্যাঙ্কাস্টার শহরে জোসেফ এইচ, রয়ারের চক্‌লেট তৈরীর কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানে চার বৎসর কাজ করার মাধ্যমে তিনি চকলেট তৈরীর নিয়ম কানুন রপ্ত করেন। অতঃপর চাকুরী ত্যাগ ক'রে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি স্বাধীনভাবে চক্‌লেট তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন। ফিলাডেলফিয়া শহরের ৯৩৫ স্প্রিং গার্ডেন ষ্ট্রিটে তিনি একটি ছোট্ট চকলেট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এই ব্যবসায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রভূত উন্নতি করেন। কিন্তু বিভিন্ন খরিদ্দারের নিকট অনেক বাকি পড়ায় এবং নগদ দামে চকলেট বিক্রী না হওয়ায় তিনি চকলেট কারখানাটি বিক্রী করেন। অতঃপর তিনি চিনি থেকে ক্যারামেল তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন। ক্যারামেল তৈরীর পদ্ধতি তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরীতে প্রচুর ক্যারামেল প্রয়োজন। তাই ব্যবসাটিতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাঁর মাতা ও আন্টির নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য নিয়ে তিনি নিউইয়র্ক শহরে পুনরায় চকলেট ব্যবসা শুরু করেন। প্যাডেল করা গাড়ীতে সারাদিন অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে তিনি বিভিন্ন এলাকায় চকলেট বিক্রী করতেন। পর্যাপ্ত পুঁজি

অভাবে নিউইয়র্কের ব্যবসা গুটিয়ে তিনি ল্যাঙ্কেশায়ারে যান এবং ক্যারামেল ও চকলেট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। তাঁর তৈরী চকলেট ও ক্যারামেল গুণে মানে শ্রেষ্ঠ হিসেবে সর্বত্র সুনাম অর্জন করে। তিনি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে একচেটিয়া বাজার পান। ফলে তাঁকে মাউণ্টজয়, নিউইয়র্ক, শিকাগো, রিডিও প্রভৃতি শহরে শাখা ব্যবসায়কেন্দ্র খুলতে হয়।

তিনি চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার চকলেট তৈরী করতে থাকেন। চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডে হারশী চকলেট প্রচুর চাহিদা অর্জণ করে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানে চকলেট তৈরী মেশিনের জন্য তিনি চুক্তি সম্পাদন করেন। প্রথম মেশিনটি স্থাপিত হয় ল্যাঙ্কেশায়ারে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ১১৪ প্রকারের হারশী চকলেট উৎপাদনে সমর্থ হন। চকলেট তৈরীর কাজে একাগ্র মনোনিবেশ করায় ক্যারামেল কারখানাটি তিনি আমেরিকার এক ক্যারামেল কোম্পানীর নিকট এক মিলিয়ন ডলারে বিক্রী করেন এবং হারশী শহর গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন মত জমি কিনে একটি বড় ধরণের চকলেট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।

১৯০৩ সালের ২রা মার্চ তিনি ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠাকল্পে জমি তৈরী করতে থাকেন। বিদেশ হতে প্রচুর যন্ত্রপাতী আমদানী করে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন চকলেট ওয়ার্ল্ড। তিনি অন্য কোন ব্যবসার প্রতি মন না দিয়ে একমাত্র চকলেট তৈরীতেই মণপ্রাণ ঢেলে দেন।

মিঃ হারশী তাঁর উপার্জিত অর্থে বহু জনহিতকর কাজ করেন। হারশী শহরের পথঘাট, গীর্জা, হারশী হাই স্কুল, পার্ক, মিউজিয়াম ইত্যাদি তাঁর অমর কীর্তি। বর্তমানে হারশী আমেরিকা মহাদেশের অন্যতম দর্শণযোগ্য শহর। দৈনিক হাজার হাজার দর্শক হারশী শহরে পদার্পণ ক'রে থাকেন। এখান থেকে 'চকলেট টাউন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মহামতি হারশী বিশ্বের বুকে অমর স্বাক্ষর রেখে ১৯৪৫ সালের ১৩ই অক্টোবর ধরাধাম ত্যাগ করেন। তাঁর অসংখ্য অবদান তাঁকে চির অমর করে রাখ্‌বে।

হ্যারিসবার্গ

পেনসেল্‌ভেনিয়া ষ্টেটের রাজধানী হ্যারিসবার্গ একটি শহর। এখানকার বিশ ত্রিশ তলবিশিষ্ট অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুসজ্জিত দোকানপাট স্বভাবতঃই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোলাকার গম্বুজবিশিষ্ট সু-উচ্চ রাজধানী ভবনটি দর্শনযোগ্য।

আমরা হ্যারিসবার্গে 'ষ্টেটট মিউজিয়াম অব পেনসেলভেনিয়া' দেখি। মিউজিয়ামটি চারতলা ভবন দখল করে আছে। এস্কেলেটরের সাহায্যে বিভিন্ন তলায় উঠানামা করতে হয়। মিউজিয়ামটি ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬৫ সালে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ষ্টেটটে প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, প্রস্তর, প্রস্তরাজি, নানাবিধ শিল্পকর্ম, ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান,

শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত নানান যন্ত্রের নমুনা মিউজিয়ামটিতে সংরক্ষিত আছে। মিউজিয়ামের সর্বনিম্ন তলায় চারটি গ্যালারী, অডিটরিয়াম, তথ্যকেন্দ্র, কাফে, ফ্রেন্ড্স ষ্টোর, শিশুদের মনোহারী দোকান ইত্যাদি রয়েছে। কিছু-সংখ্যক চেয়ার ও বসার আসনও একপাশে রক্ষিত দেখলাম। মিউজিয়ামের জন্য যেসকল দ্রব্য সংগৃহীত হয়, তা' কিছুদিন এখানে রক্ষিত থাকে দর্শকদের অবগতির জন্য। পরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়। সর্বনিম্ন তলার হলে মিটিং-সিটিং, আলোচনা সভা, বিতর্ক, সিম্পোসিয়াম, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতলে উইলিয়াম পেনের সময় থেকে পেন্সেলভেনিয়ার কৃষ্টিগত ইতিহাস, প্রস্তরযুগ ও লৌহ যুগের (১৮০০ খৃঃ) মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, বৃক্ষ ছালে তৈরী ঘরবাড়ী (৭০০—৮০০ খৃঃ পূঃ) মৃৎপাত্র, বিভিন্ন রকম পাইপ, পাথরের অস্ত্র, শীত নিবারণের জন্য ভল্লুকের চামড়ার জামা ও টুপি, বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার, খাদ্য হিসেবে মৎস্য ও বন্যপশু শিকার, কাঠ খোদাই করে তৈরী নৌকা (১৬০০ খৃঃ) মৃতদেহ মাটিচাপা দেয়া কবর, শিকারের অস্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখলাম। খৃষ্ট পূর্ব ১০,০০০—৭,০০০ অব্দে আমেরিকান ভারতীয়গণ এখানে বাস করতেন। তারা প্রধানতঃ এশিয়া মহাদেশ থেকে এদেশে আগমন ক'রে স্বাধীনভাবে বসত কায়েম করেন। তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর বহণ করছে।

তৃতীয় তলায় বিভিন্ন সময়ের প্রকৌশলগত উদ্ভাবন, বিভিন্ন প্রকার যানবাহণ—ঘোড়াটানা পাল্কী থেকে শুরু করে মটর গাড়ী, বিমান ও সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের অগ্রগতির নিদর্শন, ১৯০৩ সালে নির্মিত প্রথম মটর গাড়ী, ১৭৯১ সালে এ্যালেন রামেজ নির্মিত প্রথম কাঠের ছাপা মেশিন, ক্রমোন্নত বিভিন্ন সময়ের মুদ্রণ যন্ত্র, আধুনিক যুগের প্রিন্টিং মেশিন, মানুষ ও মেশিনের বিবর্তন, বিভিন্ন যুগের মানুষ, আমেরিকান, ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোদের প্রতিকৃতি, জীবন প্রণালী বিভিন্ন কক্ষে সজ্জিত রয়েছে।

চতুর্থ তলায় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ফসিল, ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন, খনিজপদার্থ, বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর, বৃক্ষ ও মাটির প্রস্তরে রূপান্তর, বৃক্ষের এ্যানথ্রাসাইট ও কয়লায় রূপান্তর, মাটি থেকে পাথর, বিভিন্ন ধরণের পাথর, পাথরের বৃদ্ধিলাভ, সরীসৃপ, মৎস্য, বিরাটকায় হস্তী, ব্যাঘ্র, শৃগাল, পার্বত্য সিংহ, হরিণ, ভল্লুক, জলচর, বিভার, বাইসন, স্কাঙ্ক, প্রাগৈতিহাসিক জলচর পাখী ও অন্যান্য জীবজন্তুর ফসিল রক্ষিত আছে। উড়ন্ত গিরগিটি এবং কুমীরের ন্যায় বিরাট আকারের গিরগিটির ফসিলও দেখা গেল।

মিউজিয়ামটিতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম জাতীয় পতাকা (১৩টি তারকা গোলাকারে সজ্জিত ও ১৩ ষ্ট্রিপ-বিশিষ্ট) রক্ষিত আছে। তৎকালে মাত্র তেরটি অঙ্গ রাষ্ট্র সমন্বয়ে 'ফেডারেল ষ্টেট্স অব আমেরিকা' গঠিত হয়।

মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ স্বল্পব্যয়ে এলিস আইল্যাণ্ড, আন্দালুসিয়া, গ্লেন ফিওর্ড, পেন্‌সবাড়ী, পেনসেল্‌ভেনিয়া একাডেমী, এনাপলিস প্রভৃতি স্থান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য নিয়মিত শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করেন।

পেনসেল্‌ভেনিয়া ষ্টেটে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ ক'রে এখানকার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

এখানে কয়লা ও লোহার খনি আছে এবং প্রচুর আপেল, পীচ ও তুট্টা জন্মে।

গেটিসবার্গ

আমেরিকান সিভিল ওয়ারের ক্ষেত্র হিসেবে গেটিসবার্গ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। গেটিসবার্গ শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার চিহ্নসমূহ এখানে সংরক্ষিত আছে। এই স্থানে একটি সিমেটারী (মৃত সৈন্যদের সমাধিক্ষেত্র), ন্যাশনাল মিলিটারী পার্ক, ন্যাশনাল মনুমেন্ট, লিংকন্‌স মনুমেন্ট, আইসেন হাওয়ার জাতীয় ইতিহাস সংরক্ষণ ভবন, যুদ্ধক্ষেত্র, সাইক্লোরামা কেন্দ্র (ক্যানভাসে অঙ্কিত যুদ্ধচিত্র) প্রভৃতি বিদ্যমান।

আমরা জাতীয় ইতিহাস সংরক্ষণ ভবনে ইলেকট্রিক ম্যাপ শো অবলোকন করি। এতে দেখান হয় কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ব্যাপ্তি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করা ধারাবাহিক বর্ণনাও প্রচারিত হয়। এখানে আরো আছে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাধ্যক্ষদের প্রতিকৃতি, যুদ্ধ পোষাক ও সমরাস্ত্রসমূহ। কিয়দ্দূরে আইসেন হাওয়ার কৃষিফার্ম ও ফরেষ্ট অবস্থিত। ২৩১ একর কৃষি ফার্মটির মাঝে প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের বাড়ী, শয়ন কক্ষ, আসবাব পত্র, তৈলচিত্র, তার স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রসমূহ ও উপঢৌকন সামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে।

ন্যাশনাল মিলিটারী পার্কে মহামতি আব্রাহাম লিংকনের প্রসিদ্ধ গেটিসবার্গ ঘোষণা এবং তাঁর একটি প্রস্তর প্রতিকৃতি সংস্থাপিত আছে। পঁচিশ বর্গ মাইল এলাকাব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্র। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ম্যাসন ডিকসন লাইনের উত্তরাংশের ষ্টেটসমূহ—ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া, মিসৌরী, কেন্টাকি, মেরীল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট, ইলিনয়েজ, রোড আইল্যাণ্ড, নিউজার্সি, ওহিও, ম্যাসাচুসেট্‌স, পেনসেলভেনিয়া আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নের পক্ষে এবং দক্ষিণাংশের—সাউথ ক্যারোলিনা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, টেকসাস, জার্জিয়া, লুসিয়ানা ইত্যাদি এগারটি ষ্টেট যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়ন ত্যাগ ক'রে সাউদার্ণ ফেডারেশন গঠন পূর্বক পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইউনিয়ন ও ফেডারেশন পৃথক কারেন্সী নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে।

এই যুদ্ধের প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ক্রীতদাস প্রথা। উত্তরাঞ্চলের কৃষকগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্মে নিজেরাই কাজ করতো, অপরপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থাশালী ব্যক্তিদের বিরাট বিরাট কৃষিফার্ম ক্রীতদাসের সাহায্য ব্যতীত পরিচালনা করা সম্ভব হোত না। ক্রীতদাসের প্রতি মালিকদের অন্যায়

অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদে আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট পদ লাভের পূর্ব হতেই ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করেন।

১৮৬১-৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ১৮৬১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মিসিসিপির জেফারসন ডেভিড সাউদার্ণ কনফেডারেশনের এবং ৪ঠা মার্চ আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উত্তর ও দক্ষিণের সংঘর্ষ দীর্ঘ দিনের ঘটনা। ১৮৬১ সালের ১৫ই এপ্রিল নতুনভাবে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। উভয় পক্ষ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘ দিন যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে ইউনিয়ন পক্ষের ৫১,০০০ সৈন্য এবং কনফেডারেশন আর্মীর ৯২,০০০ সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধ জয়ের পর প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর গেটিসবার্গ সেমিটারী উদ্বোধনকালে দু'মিনিট ব্যাপী যে ভাষণ দান করেন তা' গেটিসবার্গ ঘোষণা নামে বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এই ভাষণে তিনি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দান করেন তা' রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে। তিনি বলেন : This Nation under God, shall have a new birth of freedom—and that Govt. of the people, by the people, for the people, shall not Perish form the earth.—ঈশ্বরের অধীনস্থ এই জাতি স্বাধীনতার এক নবজন্ম লাভে ধন্য হবে এবং জনগণের সরকার, জনগণ দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার পৃথিবীর বুক হতে কোনদিনও ধ্বংস হবে না।

আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ

(Address delivered by President Abraham Lincoln on November, 19, 1863 at the dedication of the Cemetery at Gettysburg.)

Four scrore and seven years ago our fathers broughtforth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great Civil War, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle field of that war, we have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we cannot dedicate —we cannot consecrate—we cannot hallow—this ground. The brave men, living and

dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from those honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God shall have a new birth of freedom—and that Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

সাতাশি বৎসর পূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই মহাদেশে এক স্বাধীনতা-কামী নতুন জাতির জন্ম দেন—যাদের বিশ্বাস ছিল, সৃষ্টির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান।

আমরা বর্তমানে এক বিরাট অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত। এ-পরীক্ষায় প্রমাণিত হবে—যে কোন জাতি আত্মোৎসর্গে পরাঙ্মুখ না হলে, তাঁরাই দীর্ঘ স্থায়ীত্ব লাভে সক্ষম।

আমরা আজ মিলিত হয়েছি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। তার এক অংশ সেই মহান বীরদের সর্বশেষ বিশ্রামস্থলের জন্য উৎসর্গ করতে এসেছি, যাঁরা একটি জাতিকে রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন দান ক'রে গেছেন। তাঁদের জন্য এ উৎসর্গ আমাদের সামগ্রীক জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বৃহত্তর উপলব্ধিতে এই উৎসর্গ দ্বারা আমরা তাঁদের স্বর্গীয় কল্যাণ বা পবিত্রতর করতে পারি না। সেইসব বীর পুরুষ যাঁরা জীবিত আছেন বা মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁরা এখানে সংগ্রাম করেছেন, আজ সবাই একত্রীত। তাঁরা সুনাম ও দুর্নামের উর্ধে। আমরা তাঁদের সম্বন্ধে যাই বলি না কেন, পৃথিবী অতি অল্পদিনই তা' স্মরণ রাখবে; কিন্তু একথা চিরসত্য, তাঁরা যে অবদান রেখে গেছেন তা' অবিস্মরণীয়। আমরা যারা জীবিত আছি, আমাদের কর্তব্য তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপন দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নিজেদেরকে উৎসর্গ করা। তাঁরা যে উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং অগ্রণীর ভূমিকা পালন ক'রে আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তাই হোক আমাদের প্রেরণার উৎস।

এখন আমাদের কর্তব্য হবে সম্মুখে যে দায়িত্ব রয়েছে, তা' পালনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করা। এইসব শ্রদ্ধাভাজন মৃত ব্যক্তিদের ত্যাগ ও তিতিক্ষ থেকে আমাদের অধিকতর ত্যাগের দীক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে—তাঁদের জীবনদান বৃথা হতে পারে না, আরও স্মরণ রাখতে হবে—স্রষ্টার আজ্ঞাবহ এই জাতি স্বাধীনতার মাধ্যমে নবজন্ম লাভ করবে এবং জনগণের

সরকার, জনগণ দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার পৃথিবীর বুক থেকে কোনদিনও নিশ্চিহ্ন হবে না।

আব্রাহাম লিংকনের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী

মহামতি আব্রাহাম লিংকনের বৈচিত্র্যময় জীবন একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার কেনটাকী ষ্টেটের অন্তর্গত হডজেন ভিলের এক কাঠের কেবিনে অতি সাধারণ অশিক্ষিত পরিবারে লিংকনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন কৃষক ও কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। তাঁদের ছোট্ট একখণ্ড জমি ছিল। জমির আয়ে কোনমতেই সংসার চলতো না। তাই তাঁর পিতা কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। বাল্যকালে লিংকন তাঁর পিতাকে জমি চাষ-আবাদে ও কাঠের কাজে সাহায্য করতেন। এতদ্ব্যতীত সংসারের অন্যান্য কাজ—যেমন খড়ি ফাঁড়াই, মাটিকাটা, মাছধরা, পশু পালন, নৌকা চালনা প্রভৃতিও তাঁকে করতে হোত। কাজ থেকে অবসর মিললে তিনি স্কুলে যেতেন। বাড়ী থেকে দু'মাইল দূরে জানালাবিহীন একটি কাঠের ঘরে তাঁদের স্কুল বসতো। লিংকন তাঁর দু'বছরের বড় ভগ্নি সারার সঙ্গে পরস্পর হাত ধরে হেঁটে স্কুল করতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি মা'র সঙ্গে প্রার্থনায় বসতেন এবং মা'র কাছে বাইবেলের গল্প শুনতেন। সংসারে অভাবহেতু বই কেনার সামর্থ তাঁর ছিল না। অন্যের বই ধার নিয়ে পড়তেন। শ্লেটের অভাবে কোদালের পীঠে মাটি দিয়ে লিখতেন। তেল কেনার পয়সা অভাবে তিনি রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বই পড়তেন। অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যদিয়ে তিনি মানুষ হ'তে থাকেন।

তাঁর পিতা ভাগ্যের অন্বেষণে সপরিবারে শতাধিক মাইল দূরে ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তখন লিংকনের বয়স আট বৎসর। নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তাঁর সৎ মা অত্যন্ত দয়ালু ও ভদ্র মহিলা ছিলেন। তিনি মাতৃহারা শিশুদের আপন ক'রে প্রাণঢেলে মানুষ করতে থাকেন। সৎমার গুণে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তণ সচিত হয়।

লিংকন বয়সের তুলনায় অনেক লম্বা হ'য়ে উঠেন। তিনি কাঠমিস্ত্রীর কাজে পারদর্শিতা অর্জন করায় পিতার সহকারীরূপে বিভিন্ন স্থানে মিস্ত্রীর কাজ করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কূপ খনন, বৃক্ষ কর্তন, খড়ি ফাঁড়াই প্রভৃতি কাজ ক'রে দৈনিক ২৫ সেন্ট রোজগার করতেন। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই তিনি স্কুলে যেতেন। লিংকন পরবর্তীকালে বলেন, তিনি যতদিন স্কুল করেছেন তা' যোগ করলে এক বছরও হবে না। শিশু লিংকন বাড়ীতে মন দিয়ে লেখাপড়া করতেন। বন্ধু বান্ধবদের নিকট হতে বই ও খবরের কাগজ চেয়ে এনে গভীর মনোযোগসহ পড়তেন। তিনি রবিনসন ক্রুসো ও আরব্য উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসতেন। জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী পড়ে তিনি উল্লসিত হন এবং তারমধ্যে বড় হবার আকাংখা জাগে। তিনি সেক্সপিয়ার, রবার্ট বার্ণ প্রমুখের লেখা বই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়তেন। একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি যথেষ্ঠ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

লিংকন ষোল বৎসর বয়সে ছয় ফুট লম্বা হ'য়ে উঠেন। এই সময়ে বিভিন্ন খেলায় ও কুস্তিতে কেউ তাঁকে হারাতে পারতো না। গল্প বল্‌তে ও কমিক করতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

লিংকন সতের বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ ক'রে কিছুদিন ওহিও নদী পারাপারের কাজে একজন পাটনীর সহকারীরূপে কাজ করেন। লিংকনের আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর ভগ্নি সারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন লিংকন পাটনীর চাকুরী ছেড়ে জেমস জেন্ট্রি নামক জনৈক সওদাগরের সন্তান এ্যালেনকে নিয়ে বারশত মাইল নৌকা চালায়ে নিউ অরলিন্সে পেঁছেন। নৌচালনার কাজে তিনমাসের পারিশ্রমিক চব্বিশ ডলার তিনি বাড়ী গিয়ে পিতার হাতে দেন। টাকা পেয়ে তাঁর পিতা পুনরায় বসত স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে লিংকনের বয়স ২২ বৎসর। নতুন স্থানে তিনি সহজেই নিজেকে খাপখাওয়াতে সমর্থ হন। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। শহরের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন। অতঃপর তিনি নিউ সালেম ডিবেটিং সোসাইটির একজন সদস্য হ'য়ে নিয়মিত বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একজন পারদর্শী বক্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

লিংকন তাঁর সামান্য বিদ্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যধিক পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। মেন্টর গ্রাহাম নামে জনৈক স্কুল মাষ্টার লিংকনকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁকে বিভিন্ন বই দিয়ে সাহায্য করেন এবং নিজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে তাঁকে ইংরেজী গ্রামার শিখান। ক্রমে তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মে। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি ইলিনয়েজ ষ্টেটট আইন সভার সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা করেন। বন্ধু বান্ধবগণ তাঁকে উৎসাহিত করেন।

তিনি নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করার পূর্বেই উত্তর ইলিনয়েজে ভারতীয়গণ যুদ্ধ আরম্ভ করে। ষ্টেটট গভর্ণর শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহবান করেন। লিংকন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম তালিকাভুক্ত করেন। তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধব ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন। তাঁকেই বাহিনীর ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করা হয়। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু শত্রুপক্ষের কোন লোক খুঁজে পান না। তিনমাস পর তিনি নিউ সালেমে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ বাকী, তবু নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রচারণা শুরু করেন। কিন্তু তিনি সময় অভাবে সর্বত্র প্রচার করতে না পারায় পরাজয় বরণ করেন।

নির্বাচনে পরাজিত হ'য়ে তিনি উইলিয়াম বেরীর সঙ্গে শেয়ারে একটি 'জেনারেল ষ্টোর' খোলেন। দোকানটিতে সব রকম জিনিষ রাখা হয়। কিন্তু ব্যবসার প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা না থাকায় উন্নতির পরিবর্তে অবনতি

হ'তে থাকে। ইতিমধ্যে মিঃ বেরী পরলোকগমন করেন। তখন তাঁদের দোকানের ঋণ এক হাজার এক শত ডলার। এই ঋণের বোঝা লিংকনের উপর চাপে। তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁকে বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরিশেষে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিউ সালেম পোস্ট অফিসে খণ্ডকালীন পোস্টমাস্টারের চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর বেতন নির্দ্ধারিত হয় বাৎসরিক পঞ্চাশ ডলার। এই সময়ে তিনি একজন সার্ভেয়ারের সহকারীরূপেও কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর সামান্য লেখাপড়া এবং সার্ভে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি চেইন, কম্পাস, স্কেল ও সার্ভে সম্পর্কিত বই ক্রয় করে সার্ভে বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর রাস্তা ও জমি মাপার কাজ করতে থাকেন।

সার্ভে কাজে বিভিন্ন স্থানে গমন এবং পোস্ট অফিসের চিঠিপত্র ডেলিভারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করায় জনসাধারণের নিকট তিনি সৎ ও নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি প্রথম হতেই ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়া শহরে আমেরিকান 'এ্যান্টিসেভারী সোসাইটি' গঠিত হয়।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লিংকন পুনরায় ষ্টেট আইন সভার সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবার তিনি নির্বাচিত হন এবং বিজয়ী তেরজন সদস্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অধিকন্তু সাগামন কাউন্টি থেকে ইলিনয়েজ হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ-এর চারজন সদস্যের মধ্যে তিনি স্থান লাভ করেন।

আইন সভার সদস্য হবার পর লিংকন আইন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য রাতদিন আইন বই পড়তে শুরু করেন। তাঁর মধ্যে একজন ভাল আইনবিদ হবার আকাঙ্খা জাগে। তিনি কোর্টে উপস্থিত থেকে উকিলদের জেরাজবাব এবং জজের বিচার কাজ একাগ্রমনে অবলোকন করতেন। তাঁকে জজের জুরীর মর্যাদা প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি আইন ব্যবসায় শুরু ক'রে বেশ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর জোরালো যুক্তিতর্ক ও বাগ্মিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আইন সভার বৈঠকে তিনি একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপে সুখ্যাতি অর্জণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তিনি আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পর পর চারবার তিনি ষ্টেট আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি নিউ সালেমের দোকানের ঋণ পরিশোধ করেন এবং সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে রাজধানী শহরে আসেন। তাঁর অন্তরে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভের আকাংখা জাগে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপাবলিকান পার্টির সদস্য হিসেবে বিপুল ভোটাধিক্যে আমেরিকা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেন। অতঃপর রাজধানী ওয়াশিংটনে সপরিবারে স্থানান্তরিত হন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টি আব্রাহাম লিংকনকে মনোনয়ন দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ডিমোক্রাটিক পার্টির জাঁদরেল প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ডগলাস ও জন ক্যাবেল ব্রেক ব্রীজ। ডিমোক্রাটিক পার্টি ক্রীতদাস প্রথা বজায় রাখার পক্ষে এবং রিপাবলিকান পার্টি ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে থাকে। নির্বাচনে আব্রাহাম লিংকন বিপুল ভোটাধিক্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি আমেরিকা জাতীয় কংগ্রেসের ১৩ তম প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট পদ লাভের পর তিনি আমেরিকান সিভিল ওয়ারে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি যুদ্ধে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। যুদ্ধ জয়ের পূর্বেই (১৮৬৩) তিনি ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করেছিলেন। ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের ফলে ত্রিশ লক্ষ ক্রীতদাসকে তিনি নিজ হাতে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দাসপ্রথা উচ্ছেদ মহামতি আব্রাহাম লিংকনের অমর অবদান—যা বিশ্বের ইতিহাসে তাঁকে চিরঅমর করে রাখবে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট লিংকন ফোর্ডস থিয়েটারে নাটক দেখাকালে তাঁর বিরোধী পক্ষের জনৈক আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। একটি সভ্যজাতির এ কলঙ্ক কোনকালেও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে না। ক্রীতদাস প্রথা বহাল রাখার পক্ষপাতীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই প্রেসিডেন্ট লিংকনকে প্রাণ দিতে হয়।

ওয়াশিংটন ডি, সি,

বিশ্বের সেরা ধনাঢ্য দেশ আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি, সি, দেখার জন্য ফেয়ারলেস হিলস থেকে সকাল ৭ টায় ষ্টার সার্ভিস বাসে রওনা হই। ছোটভাই সোহ্‌রাব আমার জন্য পূর্বাহ্নেই টিকিট কিনে রেখেছিল। এখান থেকে ১৭০ মাইল দক্ষিণে ওয়াশিংটন ডি, সি,। পেনসেল্‌ভেনিয়া ও মারীল্যাণ্ড ষ্টেট দু'টি অতিক্রমের পর কলোম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্টে ওয়াশিংটন ডি, সি,। পথ চলাকালে উড্‌হাভেন, ফিলাডেলফিয়া, ব্রুকহাভেন, বাল্টিমোর, কলোম্বিয়া, বীচমণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শহর দৃষ্টিগোচর হয়।

আমেরিকা স্বাধীনতা লাভের পর অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হ'য়েছিল ফিলাডেলফিয়া শহরে। ছয় বছর পর রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ওয়াশিংটন ডি, সি-তে।

বাল্টিমোর সিটি মারীল্যাণ্ড ষ্টেটের রাজধানী। এখানে, বহুসংখ্যক ২০/২২ তলা বিল্ডিং রয়েছে। আশ্চর্য হলাম হাড্‌সন উপসাগরের পানির মধ্যে নির্মিত তিন মাইল দৈর্ঘ্য টানেল দেখে। আমাদের বাস টানেল অতিক্রমকালে বাসের সুপারভাইজার জনৈক মহিলা টানেলটি দেখার জন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রায় সারাপথ মাইকে বিভিন্ন স্থান ও

বিষয় সম্পর্কে বলতে থাকেন। টানেলটির মধ্যে ডবল রেল লাইন এবং উভয় পাশে বাস চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা আছে।

কিছুদূর যাবার পর এক কাফেটেরিয়ায় বাস থামায়ে আমাদের পনর মিনিট সময় দেন নাস্তা করতে ও চা বা কফি পানের জন্য। আমরা বাসে প্রায় পঞ্চাশ জন যাত্রী ছিলাম। সবাই নেমে যাই। ফিরে এলে নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ে। বেলা এগারটায় আমরা ওয়াশিংটন ডি, সি,তে পেঁৗছি। রাজধানী ভবন দেখার জন্য একঘন্টা সময় দেয়া হয়। বাসে আমার পাশের সিটে বসেছিলেন একজন জার্মান মহিলা—নাম মিসেস বেইটা ড্রস্তি। তিনি জার্মানীর মিউনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এক মাসের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণে এসেছেন। তার সঙ্গে আলাপ জমে উঠ্লো। প্রথমে ইংরেজীতে, মাঝে মাঝে জার্মান ভাষায় দু'চার কথা বলি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এস-সি, পড়াকালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগীয় ডীনের পত্নী মিসেস ড্যাম-এর নিকট কয়েক মাস জার্মান ভাষা শিক্ষা করেছিলাম। তার কিছুকিছু মনে ছিল। সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাই। মহিলাটি আমার মুখে জার্মান ভাষা শুনে খুশী হন। তাকে বলি আমি জার্মানীতে বেড়াতে গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করবো। ভদ্রমহিলা আমাকে তার ঠিকানা-কার্ড দেন। আমিও আমার ঠিকানা-কার্ড তাকে দেই এবং বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

আমরা রাজধানী ভবন ঘুরে ঘুরে দেখি। হাউস অব সিনেট, হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস প্রভৃতি এবং রাজধানী ভবনে রক্ষিত অসংখ্য ষ্ট্যাচু, তৈলচিত্র, ফটো ও বর্ণনা যতটা সম্ভব পড়ে দেখি। আমার ক্যামেরার ব্যাটারী শেষ হওয়ায় ছবি তোলা সম্ভব হয় না। আমার সঙ্গের জার্মান মহিলাটি তার ক্যামেরায় অনেক ছবি তোলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে বাসে করে আমাদের 'লিংকন মেমোরিয়াল'-এ পেঁৗছে দেয়া হয়। শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত লিংকন মেমোরিয়াল ভবনে একটি চেয়ারে খান্দানী পোষাক পরিহিত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের প্রস্তরমূর্তি উপবিষ্ট রয়েছে। দেয়ালগাত্রে তাঁর গেটিসবার্গের বক্তৃতা খোদাই করা আছে।

অতঃপর ওয়াশিংটন মনুমেন্ট এবং ভিয়েতনাম ওয়ার মেমোরিয়ালস দেখি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত ৬৬,০০০ সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষের নাম কাল পাথরের দেয়ালে খোদাই করা রয়েছে। দেয়ালের সামনে বহুসংখ্যক লাইট লেখাগুলোকে আলোকিত করে রাখে, যেন রাত্রিকালে নামগুলো সহজে পড়া যায়। এখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহতদের তালিকা দেখে মনে প্রশ্ন জাগলো—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনদানকারী শহীদের নাম ঠিকানা জাতীয় স্মৃতিসৌধে দূরের কথা, আজও কোন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল না। এটাই কি তাঁদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার নিদর্শন? 'আমরা তোমাদের ভুলবোনা'—গান গেয়েই কি আমাদের কর্তব্য শেষ হবে?

ন্যাশনাল পার্ক দেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভবন 'হোয়াইট হাউস' (White House)-এ যাই। এ-টি শ্বেতপাথরে নির্মিত একটি সুরম্য অট্টালিকা। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ এই ভবনের প্রতি নিবদ্ধ। ওয়াশিংটন ডি, সি,-র রিগস ন্যাশনাল ব্যাংক, আমেরিকান সিকিওরিটি ব্যাংক, সুপ্রিম কোর্ট ভবন স্থাপত্য কীর্তির অনুপম নিদর্শন।

অতঃপর এখানকার মিউজিয়ামসমূহ দেখতে যাই। ন্যাশনাল এয়ার ও স্পেস মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব আমেরিকান হিস্ট্রি, ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, গ্যালারী অব আফ্রিকান আর্ট, স্মিথসনিয়ান আর্ট এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট এণ্ড সাইন্স মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারী অব আর্ট, হিরশহর্ণ মিউজিয়াম এণ্ড স্কাল্পচারাল গার্ডেন, ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, আর্থার এম, স্যাক্‌লার গ্যালারী, এ্যানাকোস্টিয়া মিউজিয়াম, ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী, ন্যাশনাল জু-লজিক্যাল পার্ক, রেনউইক গ্যালারী, ন্যাশনাল মল, জেফারসন মেমোরিয়াল ইত্যাদি বিশেষ দর্শনীয়। প্রতিটি এক একটি বিরাট ভবনে প্রতিষ্ঠিত।

ওয়াশিংটন ডি, সি-র সবকিছু ভালভাবে দেখতে গেলে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ প্রয়োজন। আমরা কয়েক মিনিটে ন্যাশনাল এয়ার এণ্ড স্পেস মিউজিয়ামে আমেরিকান নভঃ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সমূহ, স্পেস সাটল, স্পেস মডিউল, রকেট, প্লেন ইত্যাদি দেখি। দুই দশকেরও পূর্বে আমেরিকান নভোচারী মহাশূন্যে যাত্রা করেন। বর্তমান যুগের স্পেস সাটস (নভঃ জাহাজ) মহাশূন্যে উড়ে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। একে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এটা মহাশূন্যে বিজ্ঞানের এক বিরাট সাফল্য।

আমেরিকান ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম কারুকার্য শোভিত বিরাট ভবনে প্রতিষ্ঠিত। এখানে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই ইংরেজ শাসকদের কবল হতে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস, বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা, ক্রীতদাসদের কথা, অতীতের কৃষি ও গার্হস্থ্য জীবন, আদিম অধিবাসীদের কথা, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ইতিহাস, আমেরিগো ভেসপুসির কাহিনী, বিদেশীদের কলোনী স্থাপনের বর্ণনা, অতীত যুগের বাসিন্দাদের কৃষি, সভ্যতা, তাদের ব্যবহৃত বাসনপত্র, মৃৎপাত্র, গহণা, শিকারের অস্ত্রপাতি, প্রথম বণিক স্যামুয়েল কলটকের (১৬৪০) বসত স্থাপনের কথা, হেনরী সাণ্ডার্সের ক্রীতদাসদের সাহায্যে কৃষি ফার্ম গড়ার ইতিহাস, ক্রীতদাসদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের চিত্র, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্রীতদাসদের অবদান প্রভৃতি বিষয়ে সচিত্র বর্ণনা জাদুঘরটির উল্লেখযোগ্য স্মারক।

এক সময়ে আমেরিকান ইণ্ডিয়ান (রেড ইণ্ডিয়ান) এখানকার বাসিন্দা ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তারা সুখ শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এখানকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, সাবলীল জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ব্যবসায় ও কৃষিকাজের সুযোগ সুবিধা বিদেশীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ক্রমে ইউরোপিয়ান, এশিয়ান, আফ্রিকান, ল্যাটিন আমেরিকান, ডাচ, স্পেনিশ, প্রভৃতি জাতি

এসে এখানে বসত কায়েম করে। ফলে 'এ্যাংলো-আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান' মিশ্র এক সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এখানে গম, তামাক, ভুট্টা বিভিন্ন ফল ও নীল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'তে থাকে। কৃষিকাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন, কিন্তু এ-দেশে শ্রমিক মিলতো না। বাধ্য হয়ে তারা আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানী করতো। আফ্রিকার অধিবাসীগণ অত্যন্ত গরীব ও অভাবগ্রস্তহেতু সন্তানদের ভরণপোষণ ক'রতে পারতো না। অর্থের লোভে তারা সন্তানদের বিক্রী করে দিতো।

আমাদের সোয়া পাঁচটার মধ্যেই বাসে ফেরার কথা। একতলা দেখা শেষ না করতেই প্রায় পাঁচটা বেজে যায়। সুতরাং বহুকিছু দেখার থাক্‌লেও সময় অভাবে দেখতে পারি না। ঝটপট বাস ধরতে যাই। পথে পার্কের মধ্যে গেরুয়া পোষাক পরিহিত তিনজন হিন্দু সন্ন্যাসকে বাজনাসহ হরিসংকীর্তন গাইতে দেখি। এ-দেশে সকল ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত।

সাড়ে পাঁচটায় আমরা ওয়াশিংটন ডি, সি, ছেড়ে বাড়ীর পথে যাত্রা করি। পথে যাত্রীদের খাবার জন্য এক হোটেলে এক ঘন্টার জন্য বাস থামে। আমি ছাড়া বাকী সবাই নেমে যান। আমার সঙ্গে বৌমা মেরিলীর দেয়া অনেক রকম খাবার ছিল। গাড়ীতে বসে খাই। বাসের চালক ও সুপারভাইজার বাসে ফিরে এলে তাদের কলা, আঙ্গুর, আপেল, বিস্কুট, অরেঞ্জ জুস্ খেতে দেই। আমার পাশের জার্মান মহিলাটি একটি আঙ্গুর ছাড়া আর কিছু খান না। রাত সাড়ে দশটায় বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছালে ছোটভাই সোহ্‌রাব এসে আমাকে বাসায় নিয়ে যায়।

নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী সরকার একটি মনোরম স্থানে রাজধানী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার প্রশ্ন স্থান নির্বাচনে প্রধান অন্তরায় হয়ে পড়ে। দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক জনগণ ফিলাডেল-ফিয়ায় রাজধানী স্থাপনের বিরোধিতা করেন, কেননা তথাকার ষ্টেট ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন না ক'রে উচ্ছেদের সমর্থন করেছিলেন। অপরপক্ষে, উত্তরাঞ্চলের জনগণ ক্রীতদাস অধ্যুষিত এলাকায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বস্‌তে আপত্তি উত্থাপন করেন, কেননা তাতে বিশ্ববাসী ধারণা করবে—আমেরিকা ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক।

মিঃ আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন বুদ্ধি খাটায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করেন। সবার মনোরঞ্জনের জন্য পোটাম্যাক নদীর তীরবর্তী এলাকায় ফেডারেল রাজধানী প্রতিষ্ঠার বিল কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপিত ও পাশ হয়। প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন অঞ্চলটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এজন্য কলোম্বিয়া জেলার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব কংগ্রেসের পক্ষ হ'তে তাঁর উপরেই অর্পিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের নামে রাজধানী শহরের নাম করণের প্রস্তাব পাশ হয়। নতুন শহর নির্মাণের জন্য মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়া ষ্টেট হতে দশ মাইল দৈর্ঘ্য ও দশ

মাইল প্রস্থ মোট এক শত বর্গমাইল এলাকা নিয়ে কলোম্বিয়া জেলা ও রাজধানী শহর নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পোটাম্যাক নদীর তীরে রাজধানী শহর নির্মাণের নকসা অংকন করেন মেজর পিয়ারে চার্লস এল-এন ফ্যান্ট। প্রকল্পটিতে উভয় পাশে বৃক্ষরাজি শোভিত সুপ্রশস্ত রাজপথ, মনোরম অট্টালিকা, ঐতিহাসিক রাজধানী ভবন, সুদৃশ্য মনুমেন্ট ও অনুপম কারুকার্যশোভিত মিউজিয়াম ভবন-সমূহের নক্সা প্রস্তুত হয়। প্রকল্পটি পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

জর্জ ওয়াশিংটন রাজধানী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নির্মাণ শেষে ফিলাডেলফিয়া হ'তে ওয়াশিংটন ডি, সি-তে, রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজ-ধানী ভবনের এক অংশে 'হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ' এবং অপর অংশে 'সিনেট হাউজ' নির্মিত হয়। এই ভবনে 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' এবং সুপ্রিম কোর্ট আপাততঃ স্থাপিত হয়। পরে ক্যাপিটল হিলে সুদৃশ্য সুপ্রিম কোর্ট ভবন নির্মানের পর তথায় সুপ্রিম কোর্ট স্থানান্তরিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট ভবনটি সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরে নির্মিত বিশ্বের সুন্দরতম সুবৃহৎ সৌধ।

বৃটিশ সৈন্যগণ ১৮১২ সালের যুদ্ধকালে রাজধানী শহর ও হোয়াইট হাউস ভস্মীভূত করায় ১৮১৪ সালে রাজধানী ভবনসমূহ অধিক সম্প্রসারিত ও উন্নত মানের করে নির্মিত হয়। রাজধানী ভবনের গম্বুজ প্রথমতঃ কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। পরে ঢালাই লোহাদ্বারা গম্বুজ পুনঃনির্মিত হয়।

ওয়াশিংটন ডি, সি, একটি বিশ্বজনীন সিটি। এখানে বিশ্বের সকল দেশের বিভিন্ন বৈশিষ্টের বহু জাতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট বজায় রেখে নিবিঘ্নে ও নিরাপদে বাস করছেন। এ-টি উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ রয়েছে এগারটি। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিদ্যানিকেতন এখানে অবস্থিত।

রাজধানী শহরের সর্বত্র যেন মুক্ত বাতাস চলাচল করতে পারে তজ্জন্য এই শহরে ৯০ (নব্বই) ফিটের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ নিষিদ্ধ। এ-কারণে এখানে সাধারণতঃ নয় তলার অধিক তলবিশিষ্ট ভবন নাই।

প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের হাজার হাজার লোক ওয়াশিংটন ডি, সি,-র অনুপম সৌধরাজি ও যাদুঘর সমূহ পরিদর্শন করে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

আমেরিকার কৃষ্টি ও ইতিহাস গবেষণার জন্য ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'ইউ, এস, ক্যাপিটল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি' গঠিত হয়। ২০০, মেরীল্যাণ্ড এভিনিউ, এন, ই, ওয়াশিংটন ডি, সি,-২০০২ প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা। এই সোসাইটির অনেকগুলো পাবলিকেশন্স রয়েছে। তা' ছাড়া ঐতিহাসিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং প্রতি বৎসর মার্চ মাসে বার্ষিক সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসনীয় কাজ। প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি গ্রন্থঃ

১) উই দি পিপল, ২) দি ষ্টোরি অব ইউ, এস, ক্যাপিটল, ৩) আমেরি-কান রিভলিউশন, ৪) ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স উল্লেখযোগ্য।

নিউইয়র্কে কয়েকদিন

দেখতে দেখতে দশদিন কেটে গেল ফেয়ারলেস হিল্‌সে। কিভাবে যে দিনগুলো পেরিয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। ছোটভাই সিরাজ ও শরীফ প্রায়ই টেলিফোনে আমার খবর নিতো। তাদের সাথে ফোনে কথা বলতাম। শরীফ আমাকে তার বাসায় নিউইয়র্ক যেতে বলে।

২১শে জুলাই বিকেলে সোহ্‌রাবের সঙ্গে নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করি। এক নম্বর হাইওয়ে ধরে নিউজার্সির মধ্য দিয়ে চল্‌তে থাকি। পথ চলাকালে নিউ-জার্সি শহরে গর্বিত ভবনগুলোর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করি। মনে হ'ল এর মধ্যেই এখানকার প্রতি কেমন যেন মায়া জন্মে উঠেছে।

ফেয়ারলেস হিল্‌স থেকে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর সাউথ ব্রুন্‌স-উইক মস্‌জিদে থেমে দুই ভাই আছর নামাজ পড়ি। এটি এই এলাকার একটি বড় মস্‌জিদ। সোহ্‌রাবের নিকট জানলাম, এখানে ছোট ছোট অনেক মস্‌জিদ আছে। ব্রুনসউইক মস্‌জিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আমরা বিদায় গ্রহণ করি।

নিউইয়র্ক যেতে পথে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকটি বিজ্ঞান গবেষণা-কেন্দ্র চোখে পড়ে, তন্মধ্যে এফ, এম, সি, রাসায়নিক ও কৃষি গবেষণাকেন্দ্র, ডেভিড সারনফ গবেষণাকেন্দ্র, ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল অফিস ও কয়েকটি ঔষধ তৈরীর কারখানা—যেমন ঃ স্কুইব ল্যাবরেটরীজ, জনসন এণ্ড জনসন কোম্পানী উল্লেখযোগ্য।

আমরা নিউইয়র্ক এয়ার পোর্ট ও জায়েন্টস ফুটবল ষ্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হাড্‌সন নদী ও জর্জ ওয়াশিংটন ব্রীজ অতিক্রম করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে প্রায় সাতটা বেজে যায়। সোহ্‌রাব আহার অন্তে আমাকে রেখে ফেয়ারলেস হিল্‌সে ফিরে যায়।

নিউইয়র্ক উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম শহর। এখানে দেখার মত বহুকিছু রয়েছে। তন্মধ্যে জাতিসংঘ অফিস, ষ্ট্যাচু-অব-লিবার্টি, এলিস আইল্যাণ্ড, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, ভেরাজানা ব্রীজ, হাড্‌সন নদীর টানেল, লং আইল্যাণ্ড, সেন্ট্রাল পার্ক, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, মার্টিন বেক থিয়েটার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিউইয়র্ক সিটির আয়তন ৪৯,১০৮ বর্গমাইল। ৫টি বড় বড় শহর নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি। শহরগুলো ঃ ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, ব্রঞ্চ (Bronx), কুইন্স ও ষ্ট্যাটেন আইল্যান্ড। কোন কোন শহরে একাধিক 'কাউন্টি' রয়েছে।

এককালে নিউইয়র্কের নাম ছিল 'নিউ নেদারল্যান্ড'। ১৬০৯ সালে ওলন্দাজ নাবিক হেনরী হাড্‌সন হাড্‌সন-নদীর উপকূলবর্তী ম্যানহাটন দ্বীপ এলাকাকে 'নিউ নেদারল্যান্ড' নামে অভিহিত করেন। ১৬২৬ সালে নিউ নেদারল্যান্ডে ওলন্দাজদের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ডাচ, সুইডিশ ও স্পেনিশগণ এখানে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এই উপনিবেশের কর্তৃত্ব লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক দানসূত্রে তাঁর ভ্রাতার নিকট হতে উপনিবেশটি প্রাপ্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে নিউ নেদারল্যান্ডের নাম হয় 'নিউইয়র্ক'। তৎকালে নিউইয়র্ক ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি উপনিবেশ।

জাতিসংঘ অফিস

শরীফ, বৌমা পারভিন ও পিয়ালসহ একদিন জাতিসংঘ অফিস দেখতে যাই। ম্যানহাটনে ইস্ট নদীর (East River) তীরে উনচল্লিশ তলা মনোরম ভবনে জাতিসংঘ অফিস প্রতিষ্ঠিত। আঠার একর জমির উপর অফিস ভবন সমূহ অবস্থিত। জাতিসংঘের প্রবেশ পথ (গেট) অতিক্রম ক'রে যেখানে প্রবেশ করি তা' আমেরিকা বা কোন একক দেশের মালিকানাধীন নয়। এটা আন্তর্জাতিক এলাকা। এই স্থানের মালিক বিশ্বের সকল দেশ এবং সকল জাতি—যারা জাতিসংঘের সদস্য। জাতিসংঘই একমাত্র বিশ্বজনীন সংস্থা। বিশ্বপরিবারের সবার ঘর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সানফ্রান্সিস্কো শহরে ৫১টি দেশের সমন্বয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস' সরকারীভাবে জন্মলাভ করে। এর পূর্বেই ২৬শে জুন এই সংস্থার দলিল ৫১টি দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক সানফ্রান্সিস্কোতে স্বাক্ষরিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রস্তাবক্রমে 'লীগ অব নেশনস' (League of Nations) নাম গৃহীত হয়।

এখানে একটি বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর ক'রে আপোষ মীমাংসা দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের ১৪ দফার ভিত্তিতে 'লীগ অব নেশনস' গঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় ছিল জেনেভা শহরে। চারটি অঙ্গ সংস্থা (১) পরিষদ, (২) কাউন্সিল, (৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও (৪) স্থায়ী কার্য সংসদ সমন্বয়ে একজন সেক্রেটারী জেনারেলের পরিচালনাধীনে 'লীগ অব নেশনস' পরিচালিত হোত। এর পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ছিল (১) গ্রেট বৃটেন (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩) ইটালী (৪) ফ্রান্স ও (৫) জাপান। 'লীগ অব নেশনস' এর স্থবিরতা ও ব্যর্থতার কারণে পরবর্তীকালে তার সমাধির উপর 'জাতিসংঘ' জন্মলাভ করে। বর্তমানে জাতিসংঘের

সদস্যদেশ ১৭৪টি। যে উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয় তা' প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রত্যেক দেশের সমমর্যাদা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন, বিশ্বস্বাস্থ্য ও খাদ্য-সমস্যা সমাধান, শিশুকল্যাণ, অশিক্ষা দূরীকরণ, মানবিক অধিকার, সংবাদ পত্রের মৌলিক অধিকার রক্ষা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ অফিসের সম্মুখস্থ নদীতীরে কাস্তে ও হাতুড়ী হাতে একটি সবল-দেহী বিরাট বপুর প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। মূর্তিটির গায়ে লেখা আছে—'Gilt of Union of the Soviet Socialist Republic to the United Nations, 1959'—মূর্তিটি ১৯৫৯ সালে সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক কর্তৃক জাতি-সংঘে উপহার প্রদত্ত।

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের বর্তমান স্থায়ী অফিসস্থান নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের অধিবেশন বসতো। আমেরিকার জুনিয়র জন ডি. রকফেলারের দানকৃত অর্থে জাতিসংঘ ভবন নির্মাণের জন্য ১৮ একর জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ দিবসে (২৪শে অক্টোবর) মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন পর জাতিসংঘ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলে।

জাতিসংঘ ভবনের নকসা অংকন করেন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ ওয়ালেস কে. হ্যারিসন এর নেতৃত্বাধীন একদল আন্তর্জাতিক মর্যাদার স্থপতি; তাঁদের নকসা অনুযায়ী নির্মিত হয় কয়েকটি গম্বুজ বিশিষ্ট মার্বেল প্রস্তর ও কাঁচ নির্মিত ৩৯ তলা সচিবালয় ভবন, সাধারণ অধিবেশন ভবন, কন্ফারেন্স ভবন প্রভৃতি। জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশোল্ড এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের দানে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয় দাগ হ্যামারশোল্ড গ্রন্থাগার (১৯৬১)।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতি সপ্তাহের কার্যদিবসে ইংরেজীতে নাম লেখা জাতিসংঘের সকল দেশের পতাকা প্লাজায় (ফাষ্ট এভিনিউতে) উড্ডীন থাকে। A—Z পর্যন্ত অক্ষর ক্রমিক বিভিন্ন দেশের পতাকাসমূহ উত্তর দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। যেমন প্রথমে আফ্গানিস্তান এবং শেষে জিম্বাবু (Zimbabwe)-এর পতাকা থাকে।

জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে প্রধানতঃ চার শ্রেণীর লোক থাকেন ঃ ১) বিভিন্ন দেশের ডেলিগেট ১৭৪ জন ২) আগন্তুক প্রায় ৩,০০০ (বিভিন্ন দেশের) ৩) সচিবালয় কর্মচারী প্রায় ৭,০০০ ৪) সাংবাদিক প্রায় ৪৫০ জন।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ অধিবেশনকালে প্রতিদিন গড়ে ১৬০০ দর্শক অধিবেশন দেখার জন্য উপস্থিত থাকেন। এই সময়ে সাংবাদিকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এখানে বিভিন্ন দেশের লোক নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতে পারেন। কিন্তু জাতিসংঘের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ছয়টি অফিশিয়াল ভাষা ব্যবহৃত হয় ঃ আরবী, ইংলিশ, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও স্পেনিশ। এর মধ্যে প্রধান কার্যকরী ভাষা—ইংরেজী ও ফ্রেন্স।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক জাতিসংঘ এলাকা 'আন্তর্জাতিক জোন' রূপে স্বীকৃত ও পরিচিত। এখানে জাতিসংঘের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, ডাক বিভাগ প্রভৃতি রয়েছে। ডাক বিভাগের সিলে 'ইউনাইটেড নেশনস' লিখিত আছে। জাতিসংঘের নিজস্ব ডাক টিকিট, রাজস্ব টিকিট, স্মারক টিকিট ইত্যাদি মুদ্রণ ও বিক্রয় হয়। বহিরাগত দর্শকদের জন্য বিভিন্ন দেশের চিত্র, শিল্প, স্থাপত্য ও উপহার সামগ্রীতে সুসজ্জিত বহিরাঙ্গন ও মনোরম বাগান রয়েছে। যে কেহ বিনা টিকিটে এ-সব দর্শন করতে পারেন।

দর্শকদের জন্য জাতিসংঘের ইতিহাস, কার্যপ্রণালী, গঠন প্রণালী ইত্যাদির বিবরণ দেয়ালে লিপিবদ্ধ আছে। তা' ছাড়া পাবলিক লবিতে আছে—সোভিয়েট রাশিয়ার স্পুটনিক ১-এর মডেল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত চন্দ্রাশিলা, নেদারল্যান্ডের ফোকাল্ট পেন্ডুলাম, গ্রীসের মূর্তি, মেক্সিকোর চিত্র, কাঁচের রঙীন চ্যাগাল উইন্ডো ইত্যাদি।

জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি শাখা নিম্নরূপ ঃ ১) সাধারণ পরিষদ (General Assembly), ২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), ৩) অছি—পরিষদ (Trusteeship Council), ৪) আর্থ—সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council), ৫) সচিবালয় (Secretariat) ৬) আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (International Court of Justice)—নেদারল্যাণ্ডের হেগ-এ অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আদালতকে বিশ্বকোর্ট ও বলা হয়। বিভিন্ন দেশের ১৫ জন বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী সমন্বয়ে গঠিত এই আদালত। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের যুগ্ম অধিবেশনে বিচারকমণ্ডলী নির্বাচিত করা হয়।

সচিবালয়ঃ জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ষোল হাজার পুরুষ ও মহিলা কর্মচারী কাজ করেন। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক মাঠকর্মীও রয়েছেন। জাতিসংঘের ছয়টি শাখার বিভিন্ন দায়িত্ব সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। এখানে অভিজ্ঞ বহু ভাষাবিদ পন্ডিত, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, আইনজ্ঞ, গ্রন্থাগারিক, সম্পাদক, বেতারবিজ্ঞানী, প্রশাসক, কারনিক, ষ্টেনোগ্রাফার, গ্রাফিকশিল্পী, চিত্রকর, ইঞ্জিনিয়ার, নিরাপত্তা অফিসার প্রভৃতি শ্রেণীর কর্মী রয়েছেন। জাতিসংঘ তাঁদের নিয়োগ ও বেতন প্রদান ক'রে থাকেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধি নন, বরং সবাই আন্তর্জাতিক বে-সামরিক কর্মচারী। সচিবালয়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব সেক্রেটারী জেনারেল। সচিবালয়ের কাজকাম দেখাশোনা এবং জাতিসংঘের সকল বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ বিষয়সমূহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্বও তাঁর। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সেক্রেটারী জেনারেল বা মহাসচিব নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ

বৎসর। কার্যকাল শেষ হবার পর তিনি পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। জাতি-সংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন মিঃ টিগভ লাইট। বর্তমান মহাসচিব মিঃ বুট্রোস ঘালী—(মিশরের)।

সাধারণ পরিষদ ঃ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতি রাষ্ট্রের একজন ক'রে সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত। এখানে ছোট, বড়, ধনী, গরীব প্রতি রাষ্ট্রের মাত্র একটি ভোট দানের বিধান রয়েছে। যেকোন শান্তিকামী রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারেন। নতুন সদস্যপদ লাভের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ এবং সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রয়োজন। বর্তমানে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৭৪। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র এই পরিষদে ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোট মাত্র একটি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে শুরু হয় এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। বিশেষ জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে যেকোন সময় অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। এটি জাতিসংঘের প্রধান কমিটি। সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়া দূষণ, যুদ্ধাস্ত্র সীমিত করণ, আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ অধিবেশনে আলোচনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য এবং অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম দায়িত্ব জাতিসংঘের বাজেট অনুমোদন। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে নিজ দেশের লোকসংখ্যা ও বাষিক আয়ের ভিত্তিতে জাতিসংঘ তহবিলে বাষিক চাঁদা প্রদান করতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোন নতুন রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যরূপে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হ'লে সাধারণ পরিষদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন এবং সংগঠনের বাজেট অনমোদন ও বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের চাঁদা নির্দ্ধারণ করেন। সাধারণ পরিষদকে 'বিশ্বপার্লামেন্ট' নামেও অভিহিত করা হয়। এখানে কোন আইন প্রণয়ন না হলেও এর সুপারিশ সমূহ আন্তর্জাতিক ফোরামে কার্যকরী হয় এবং বিশ্বজনমতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

নিরাপত্তা পরিষদ ঃ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ ; তন্মধ্যে পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য ঃ চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। অপর দশটি দেশ অস্থায়ী সদস্য-জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ভৌগোলিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে তাদের বাছাই করা হয়।

১। এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহ হতে—২
২। আফ্রিকা ,, ,, ,, —৩
৩। ল্যাটিন আমেরিকার ,, ,, —২
৪। পশ্চিম ইউরোপীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান ,,—২
৫। পূর্ব ইউরোপীয় ,, —১
মোট—১০

স্থায়ী সদস্য পাঁচটি দেশের ভেটো প্রয়োগের অধিকার আছে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণও উপস্থিত থাকেন। জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিরাপত্তা পরিষদ। এই পরিষদকে জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী কমিটি বলা হয়। ইহা নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি বা কোন পুরাতন সদস্যের বহিষ্কার এবং সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ অনুমোদন করে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দানের অধিকার আছে এবং নয়জন সদস্যের সম্মতিসূচক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন স্থায়ী সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সিদ্ধান্ত নাকচ বলে গণ্য হয়। ইহাই স্থায়ী সদস্যের 'ভেটো' ক্ষমতা। কোন স্থায়ী সদস্য ভোটদান থেকে বিরত থাকলে তা' 'ভেটো' বলে গণ্য হয় না। ভেটো প্রয়োগ অধিকার গণতন্ত্রের ও মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে অনেকেই মনে করেন।

কোন কারণে কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হলে নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করা। শান্তি স্থাপনের জন্য 'সীজ ফায়ার' আদেশ, আপোষ মীমাংসা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমন্বিত সামরিক শক্তি প্রয়োগ, বহুজাতিক বে-সামরিক বা সামরিক পরিদর্শক প্রেরণ, সেক্রেটারী জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী সেক্রেটারী জেনারেলের আদেশ মেনে চলবে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিরাপত্তা বিধান ও শান্তি স্থাপনই জাতিসংঘের প্রধান দায়িত্ব। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ জাতিসংঘের বিশ্বশান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘকে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

অছি পরিষদঃ পরাধীন দেশ বা কলোনীসমূহকে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করার জন্য অছি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদ প্রথমতঃ এগারটি পরাধীন রাষ্ট্রের জন্য সাতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। এগারটি পরাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ইতিমধ্যে দশটি স্বাধীন হয়েছে। বাকি আছে মাইক্রোনেশিয়া স্পেসিফিক আইল্যান্ড।

১৯৪৫ সাল হ'তে বর্তমান কাল পর্যন্ত ৮০টি কলোনিয়াল-রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে স্বাধীন করা জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য অছি পরিষদের ৭জন সদস্য নির্বাচিত হন। এই পরিষদ পরাধীন জাতির মঙ্গল সাধন ও উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ক্রমে তাদের স্বাধীন করার জন্য চেষ্টান্বিত থাকবে।

আর্থ সামাজিক পরিষদ ঃ চুয়ান্নটি (৫৪) সদস্যরাষ্ট্র সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত। প্রথমতঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ২৭জন সদস্য সমন্বয়ে আর্থ-সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। পরে প্রতি বৎসর ৯জন সদস্য কালক্রমে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অতএব ৩ বৎসরে ২৭জন সদস্য নির্বাচনের ফলে মোট সদস্যসংখ্যা হয় ৫৪। এই পরিষদের বৎসরে ২টি নিয়মিত অধিবেশন বসে। প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন আহবান করা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্বের সকল অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত এই পরিষদ দেশান্তরী শ্রমিক, মজুর ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সুযোগ সুবিধা বিধান, মাদক দ্রব্যের ক্ষতির কবল হতে বিশ্বজাতিকে রক্ষা, ক্ষতিকর ঔষধ নিষিদ্ধকরণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে। যে সকল সংস্থা বা এজেন্সী আর্থ-সামাজিক পরিষদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকে তা' হল ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO), জাতিসংঘ জরুরী শিশু তহবিল (UNICEF), বিশ্বব্যাংক (IBRD), এবং জাতিসংঘ রিফিউজী হাই কমিশনার (UNHCR)। জাতিসংঘের সিংহভাগ অর্থই এই সব উন্নয়ন কাজে ব্যয়িত হয়।

আন্তর্জাতিক আদালত ঃ ইহা জাতিসংঘের প্রধান বিচার প্রতিষ্ঠান। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে এই আদালত বসে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫জন বিচারপতি সমন্বয়ে এই আদালত গঠিত। বিচারপতিগণ ৯ (নয়) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এই আদালতের দায়িত্ব ঃ ১) আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের ন্যায় বিচার এবং ২) আইনগত প্রশ্নে মতামত প্রদান।

বিভিন্ন শাখা সংস্থা ঃ

১। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত। ইহা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে।

২। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদর দপ্তর জেনেভায়। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উন্নয়নমুখী কাজ ও রোগমুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রয়াসে রত।

৩। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সদর দপ্তর রোমে অবস্থিত। খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিবেদিত।

৪। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সহায়তাদানের জন্য (IBRD) এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

৫। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO) সদর

দপ্তর প্যারিস। উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৬। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)—বিশ্বশিশুদের উন্নয়নকল্পে জরুরী শিশুতহবিল গঠন ও পরিচালন।

৭। বিশ্বব্যাংক (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development)—সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনঃর্গঠন প্রয়াসে সহায়তাদান।

৮। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা—International Finance Co-operation (IFC) : সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশসমূহের বেসরকারী খাত উন্নয়নে সহায়তা দান।

৯। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা—International Development Association (IDA) ঃ সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তাদান।

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা—General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ঃ সদর দপ্তর জেনেভায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত।

১১। আণবিক শক্তি সংস্থা—International Atomic Energy Agency (IAEA)—সদর দপ্তর ভিয়েনায়। আণবিক শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা এর লক্ষ্য।

১২। বেসামরিক বিমান সংস্থা—International Civil Aviation Organisation (ICAO)—সদর দপ্তর মন্ট্রিল, ক্যানাডা। বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে বিধিমালা প্রণয়ন ও মানোন্নয়ন।

১৩। আবহাওয়া সংস্থা—World Metrological Organisation (WMO) ঃ সদর দপ্তর জেনেভায়। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি বিনিময় ও নির্ধারিত মানে উন্নয়ন।

১৪। আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা—Universal Postal Union (UPU)—সদর দপ্তর বার্ণ, সুইজারল্যাণ্ড। আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার পরিচালনা ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

১৫। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ-International Telicommunication Union (ITU)—সদর দপ্তর জেনেভায়। টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও রেডিও যোগাযোগের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

১৬। আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা—International Governmental Maritime Consultative Organisation (IMCO) ঃ সদর দপ্তর লণ্ডনে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

সম্প্রতি জাতিসংঘ অফিসসমূহ ধূমপান মুক্ত এলাকারূপে ঘোষিত হয়েছে। এ-টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিশ্বকে ধূমপান ও মাদক দ্রব্যের ক্ষতির হাত হ'তে রক্ষাকল্পে জাতিসংঘের অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ বান্ছনীয়।

জাতিসংঘ বিশ্বের সকল জাতির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। একথা মুরব্বীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথ নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ লক্ষ্য সামনে রেখে জাতিসংঘ সঠিক-ভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারছেন কি? এই সংস্থার প্রধান চালিকা-শক্তি কি জাতিগত বৈষম্যের উর্দ্ধে উঠে মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ বাস্তবায়নে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন? বিশ্বের কোন কোন দেশে যে ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন চল্‌ছে, তা' প্রতিরোধকল্পে সর্বক্ষেত্রে কি জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখ্‌তে পারছেন? ফিলিস্তীন, ইসরাইল, ইরাক, কুয়েত, কাশ্মীর, মায়েনমার, লেবানন, লিবিয়া, আলজিরিয়া, সোমালিয়া, শ্রীলঙ্কা, বসনিয়ায় কি একইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়? এটাই আজ বিশ্ব বিবেকের জিজ্ঞাসা।

খৃষ্টান সার্বীয়রা বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলিম জনগোষ্ঠিকে নির্বিচার হত্যা ও নৃশংসতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা' ইতিহাসের সকল বর্বরতাকে ম্লান করেছে। বিনা অপরাধে যেসব অমূল্য জীবনকে হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হচ্ছে, তাদের আত্মার ফরিয়াদ কি জাতিসংঘের পাষাণ বেদীতে আঘাত হানছে না? মানবতার রক্ষাকবচ জাতিসংঘ ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বলতার পরিচয় দিলে তার শক্তি হ্রাস পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ভেরাজানা ব্রীজ

ফিলাডেলফিয়া হ'তে নিউইয়র্ক আসার পথে নিউইয়র্ক সিটির কয়েক মাইল আগে স্টাটেন আইল্যাণ্ড ও ব্রুকলিন সংযোগকারী ভেরাজানা ব্রীজ অবস্থিত। ব্রীজটি প্রায় তিন মাইল দৈর্ঘ্য। এ-টি নতুন ডিজাইনের ও উন্নতমানের। ব্রীজটির দু'মাথায় মাত্র দু'টি পিলার রয়েছে। আশ্চর্য্য লাগেঃ তিন মাইল লম্বা বিরাট একটি ব্রীজ কিরূপে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ব্রীজটির মাঝে কোন পিলার নাই। ব্রীজটি দ্বিতল। উপর তলায় ও নীচে প্রতি পাশে চারটি করে মোট আটটি লেন আছে। আটখানা গাড়ী পাশাপাশি উভয় দিকে চল্‌তে পারে। দৈনিক ব্রীজটির উপর দিয়ে বহু গাড়ী যাতায়াত করে। ব্রীজটির নির্মাণ খরচ উঠানোর জন্য দক্ষিণদিকগামী প্রতিগাড়ী হতে পাঁচ ডলার টোল (ট্যাক্স) আদায় করা হয়। জানলাম, কিছুদিন পূর্বে টোলের পরিমাণ ছিল তিন ডলার। সম্প্রতি সরকার টোল বৃদ্ধি করেছেন। আমরা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যাওয়ায় আমাদের কোন টোল দিতে হয় না। অবশ্য প্রত্যাবর্তনকালে দিতে হবে।

ফেয়ারলেস হিলস্ থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেখান থেকে নিউইয়র্কের দূরত্ব ৭৫ মাইল। এইটুকু রাস্তার মাঝে আমাদেরকে একস্থানে পঁচিশ সেন্ট, আর আউটার ব্রীজ ক্রসিং এ চার ডলার টোল দিতে হয়। এখানেও

পূর্বে টোল ছিল তিন ডলার ; বর্তমানে চার ডলার করা হয়েছে। ছোট ভাই সোহ্‌রাবের নিকট জানলাম, কোন কোন স্থানে চারতলা পর্যন্ত ব্রীজ আছে। এক ব্রীজের নীচে আর এক ব্রীজ, তার নীচে এক ব্রীজ মাটির লেবেলে এক ব্রীজ, মাটির নীচের রাস্তায় ব্রীজ—এইভাবে যত তলা রাস্তা ততগুলো ব্রীজ নির্মিত হয়েছে। এসব নিজের চোখে না দেখ্‌লে ধারণা করা কঠিন। কারিগরী বুদ্ধি ও প্রকৌশলে এদেশবাসী যে অত্যন্ত উন্নত তা' আমেরিকার রাস্তাঘাট ও ব্রীজ দেখ্‌লেই বোঝা যায়। নিউইয়র্কের হাই রোডে ছোট বড় বহুসংখ্যক ব্রীজ রয়েছে। এক-একটি ব্রীজের নির্মাণ ব্যয় যে কত বিলিয়ন ডলার তা' অনুমান করা কঠিন। আমেরিকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ জন্যই এ-সব করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের চলার পথে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা গণনা করি কয়খানা কার সেইস্থান অতিক্রম করে। এক মিনিটে একই দিকে পঞ্চাশখানা কার আমাদের অতিক্রম করে। এই হিসেবে প্রতি ঘন্টায় তিন শ' গাড়ী একদিকে এবং আরো তিন শ' গাড়ী বিপরীত দিকে চলে। অতএব প্রতি ঘন্টায় একটিমাত্র রাস্তায় যাতায়াত করে ছয়শত গাড়ী। অতএব সকাল সাতটা হতে রাত দশটা পর্যন্ত ১৫ ঘন্টায় এইপথে যাতায়াত করে নয় হাজার গাড়ী। প্রতি গাড়ী হ'তে যাতায়াতে গড়ে নয় ডলার টোল আদায় হ'লে প্রতিদিন একটিমাত্র রাস্তায় টোল আদায় হয় ৮৫,৫০০ ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় ত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচ-শত টাকা)। মাত্র আশি মাইলের একটি রাস্তায় একদিনের আয়ের হিসাব।

আমেরিকায় হাজার হাজার রাস্তা রয়েছে। তার কোন কোনটির দৈর্ঘ্য সহস্রাধিক মাইল। সুতরাং কি পরিমাণ টোল আদায় হয় সহজেই অনুমেয়। অবশ্য কতিপয় রাস্তায় টোল আদায় করা হয় না।

আমেরিকার বহু সমাজকল্যাণ সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এলাকার উন্নতিকল্পে ও জনগণের সুবিধার্থে বহু টাকা খরচ করে ব্রীজ নির্মাণ করে থাকে। এ-জন্য দরকার হলে ব্যাংক হ'তে ঋণ গ্রহণ করা হয়। পরে টোল আদায় ক'রে ঋণ পরিশোধ করা হয়। ঋণ পরিশোধের পর আর টোল আদায় করা হয় না বলে জানা গেল।

কাজী মামার সঙ্গে

নিউইয়র্কে সৌভাগ্যক্রমে পরিচয় ঘটে কাজী শামসুর রহমান (ছরু কাজী) সাহেবের সঙ্গে। তিনি বরিশাল জেলার আগইলঝাড়া (সাবেক গৌরনদী) থানার বেলুহার-সেরাল গ্রামের বাসিন্দা। একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিনি কিছু-কাল যাবৎ নিউইয়র্কে চাকুরীরত আছেন। বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানায় তাঁর কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তিনি নন্দীগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় জনগণ তাঁর পিতার নামে স্কুলটির নামকরণ করেন—কাজী আব্দুল ওয়াজেদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। নলডাঙ্গা হাই স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আশরাফ আলী সাহেবের কন্যা বেগম আশরাফী বানু স্কুলটির প্রধান শিক্ষয়িত্রী। মরহুম কাজী আব্দুল ওয়াজেদ ওরফে ফরিদ

কাজী বৃটিশ আমলের একজন জ্ঞানতাপস, শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রাণ সমাজসেবক ছিলেন। বরিশাল জেলার সেরালের প্রসিদ্ধ বেলহার কাজী পরিবারে তাঁর জন্ম।

ছরু কাজী সাহেব চিরকুমার। তাঁর বর্তমান বয়স চল্লিশোর্ধ। আমার ছোটভাই শরীফ ও বৌমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তারা তাঁকে মামা ডাকে। সেই সূবাদে তিনি আমারও মামা। ফিলাডেলফিয়া থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছালে বৌমা পারভীন আমাকে কাজী মামার কথা বলে এবং তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক—জানায়। বৌমা টেলিফোনে আমার নিউইয়র্কে আসার খবর তাঁকে অবহিত করে। কাজী মামার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়। তিনি জানান, আমার বড় জামাতা ডঃ মকবুল হোসেন (অধ্যক্ষ, সিংড়া সরকারী জি, এ, কলেজ, নাটোর) এঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তিনি ফোনে আমাকে দাওয়াৎ করেন। একদিন পর তিনি আমাদের বাসায় এসে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, তার অফিসের সাপ্তাহিক ছুটির দুইদিন আমাকে নিউইয়র্কের দর্শনযোগ্য কতিপয় স্থান দেখাবেন।

তাঁর সঙ্গে সেন্টাল পার্ক, মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম, মার্টিন বেক-থিয়েটার ও আরো যা কিছু দেখেছি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সেন্ট্রাল পার্ক

এটি নিউইয়র্কের সর্ববৃহৎ পার্ক। দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং প্রস্থ এক মাইল। পার্কটির মধ্যে অসংখ্য মূল্যবান বৃক্ষরাজী, প্রস্তর নির্মিত অবজারভেটরি টাওয়ার, লেক, জলাশয়, বহু রাস্তা, ব্রীজ, খেলার মাঠ, দোকানপাট ইত্যাদি রয়েছে। পার্কের এক লেকের মাঝ দিয়ে একটি পাথরের রাস্তা নির্মিত হয়েছে দেখলাম।

এখানে ভূগর্ভে এক মাইল টানেল রোড রয়েছে গাড়ী চলাচলের জন্য। পার্কটির পাশের নীচু সড়কে বাস, কার ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। মাঝে বিভিন্ন পথে গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল, মটর সাইকেল, কার, ট্যাক্সি চলাচল-যোগ্য অনেক রাস্তা আছে। হেঁটে চলার বা দৌড়ানোর জন্য পৃথক পথ রয়েছে। পার্কটি ঘুরে দেখার জন্য পার্কের মধ্যেই ঘোড়া ও সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। এজন্য কোন জামানত রাখতে হয় না। কেউ ফাঁকি দিতে পারে এটা তাদের ধারণার বাইরে। পার্ক দেখার জন্য কোন টিকিট লাগেনা। পার্কের মধ্যে নাট্যমঞ্চ, গ্যালারী বিশিষ্ট সভামঞ্চ, খেলার মাঠ, স্টেজ, দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, ল্যাট্রিন, বাথরুম, লেক, বসার সিট আরো অনেক কিছু আছে। বাসের ন্যায় আকৃতির চাকাবিশিষ্ট স্থানান্তরযোগ্য কয়েকটি বাসভবন দেখলাম। তাতে টেলিফোন, বাথরুম সবকিছু আছে।

কতিপয় পুরুষ ও মহিলাকে স্যাণ্ডো গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় রাস্তায় দৌড়াতে দেখলাম। কেউবা স্কী-সু পরে বা স্কেটিং করে দৌড়ে চলেছে। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যায় বহু লোক পার্কে মুক্ত বাতাস সেবন ও ব্যায়াম করতে আসে। পার্কটির মাঝে ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানা, রেস্ট রুম, গেস্ট হাউস, ডাক বাংলো

ও বাসভবন আছে। হরেক রকম দর্শক বিচিত্র পোষাকে ভূষিত হয়ে পার্কটিতে বিচরণ করছে। গেরুয়া বসন পরে খড়ম পায়ে চট চট শব্দ করে হেঁটে যেতে দেখলাম কয়েক জনকে। মনে হয় তারা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। তাদের চেহারা ছিল ভারতীয়দের ন্যায়।

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের কয়েক দল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষিকাদের সঙ্গে মুক্তাঙ্গনে শিক্ষা লাভ করতে এসেছে। তাদের বয়স পাঁচ থেকে দশ বছর। আমরা একদলের কাছে গিয়ে শিক্ষিকা ও বাচ্চাদের সঙ্গে আলাপ করি। আমরা বাংলাদেশ থেকে তাদের দেশে এসেছি শুনে তারা খুব খুশী হয়। কাজী মামা তাদের কয়েকটি ছবি তোলেন। বিভিন্ন জীবজন্তুর, কতিপয় প্রস্তর মূর্তির ছবিও তোলা হয়। ট্যাগ স্কুল, পি এস—১১৭, ২৪০ ই, ১০৯ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক—১০০২৯ এর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমরা আলাপ করি। স্কুলটির প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস বিয়ান্ট ও আরো একজন শিক্ষিকা তাদের সঙ্গে ছিলেন। সেন্ট্রাল পার্কের পাশে কতিপয় উচ্চ বিল্ডিং এর গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে বিভিন্ন রকমের লতাগাছ। লতাগুলোর কোন আঁকড় বা অবলম্বন নাই। কি করে উঠেছে বিস্ময়কর বটে।

সেন্ট্রাল পার্ক দেখে আমরা নিকটবর্তী একটা শিশুপার্কে যাই। সেখানে শিশুদের বিভিন্ন খেলায় ব্যস্ত দেখি।

মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম

সেন্ট্রাল পার্কের সন্নিকটে ১০০০/৫ এভিনিউতে মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম অবস্থিত। মিউজিয়ামটি সুদৃশ্য তেতলা ভবনে সন্নিহিত। প্রবেশ ফি বয়স্কদের জন্য ছয় ডলার এবং ছাত্রদের জন্য তিন ডলার। ১৮৭০ সালে মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত। এ-টি পাশ্চাত্যের সর্ববৃহৎ আর্ট মিউজিয়াম বলে জানা গেল। আয়তন ১·৪ মিলিয়ণ বর্গ ফিট। প্রত্যহ সকাল সাড়ে ন'টা হ'তে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মিউজিয়ামটি খোলা থাকে।

এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের শিল্প নিদর্শন, তৈলচিত্র, ফাইন আর্ট, কারুশিল্পের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। মিউজিয়ামের গ্রাউণ্ড ফ্লোর নানাবিধ পুষ্পরাজি ও সবজ বিটপিতে সুসজ্জিত। এখানে ইনফরমেশন ডেস্ক, টিকিট কাউন্টার, পাবলিক কার গ্যারেজ, অডিটরিয়াম, সেন্টার ফর এডুকেশন, পাবলিক লাইব্রেরী ও রিডিং রুম, স্লাইড লাইব্রেরী, কাফেটরিয়া, বার, কোট-চেকিং সেন্টার ইত্যাদি রয়েছে। আমার শেরোয়ানী ও কাজী মামার কোট চেকিং সেন্টারে জমা রাখতে হয়। তজ্জন্য আমাদের ২টা টোকন দেয়া হয়। কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে যদি জাদুঘরের কোনকিছু পকেটস্থ করে সেই ভয়েই বুঝি কোট বা শেরোয়ানী গায়ে ঢুকতে দেয়া হয় না। জাদুঘর একটি মহা-মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই কর্তৃপক্ষ এত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন বলে মনে হয়।

পরে চেকিং সেন্টারের কর্মকর্তাদের এ-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনারা কি মানুষকে অবিশ্বাস করেন ? উত্তরে একজন বলেন—না তা' নয়, অনেক সময় ধরে ঘুরতে গরমে আপনারা কষ্ট পাবেন, তাই এ ব্যবস্থা। আরো বলেন, আমাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের যা নির্দেশ আছে, তাই পালন করি মাত্র। এজাতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনে একান্ত অনুরাগী।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আরো আছে—প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র (First Aid Centre), পঙ্গুদের জন্য ট্রলার কক্ষ, হারাণ-প্রাপ্তি অফিস (Lost Found office), গিফ্‌ট শপ ইত্যাদি। মিউজিয়াম দেখাকালে কেউ কিছু হারিয়ে ফেল্‌লে, তা' হারাণ প্রাপ্তি অফিসে খোঁজ করলে পাওয়া যায়। এ-দেশে যেকেউ কোন জিনিষ কুড়িয়ে পেলে তা' হারাণপ্রাপ্তি অফিসে জমা দেয়। কেউ অপরের জিনিষ আত্মসাৎ করে না। এ-সম্পর্কে বিশদ জানতে চাওয়ায়, একজন মন্তব্য করেন, কোন কোন দেশের লোক কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ আত্মসাৎ করে। তিনি কয়েকটি দেশের নামও করেন। শুনে মাথা হেঁট হয়ে আসে। আত্মপরিচয় গোপন রেখে সরে পড়ি।

মিউজিয়ামের দ্বিতলে আর্ট অব আফ্রিকা, আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, বিংশ শতাব্দীর আর্ট, ড্রইং, প্রিন্ট এণ্ড ফটোগ্রাফ, ডাচ পেইন্টিং, গ্রীক ও রোমান আর্ট, অতীত কালের প্রাচ্যের আর্ট, এশিয়ান আর্ট, ঈজিপশিয়ান আর্ট ইউরোপিয়ান স্থাপত্য ও ডেকোরেটিভ আর্ট, ফ্রেন্স পিরিয়ড কক্ষ, ইংলিশ পিরিয়ড কক্ষ, দি আমেরিকান উইং এণ্ড গার্ডেন কোর্ট, গ্রেটহল ব্যালকনী, মধ্যযুগীয় আর্ট, বক্তৃতা মঞ্চ, সিম্পোসিয়াম হল, বইয়ের দোকান, ভিউ কার্ডের দোকান, ষ্টেশনারীজ শপ, স্যাক্‌লার উইং, সদস্যদের কক্ষ, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনিশ আর্ট ইত্যাদি একে একে দেখি।

তিন তলায় ইসলামিক আর্ট, বিংশ শতাব্দীর আর্ট, ইউরোপীয়ান পেইন্টিং, আমেরিকান আর্ট, বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র, চীনের গ্যালারী, জাপানীজ গ্যালারী, এশিয়ান আর্ট গ্যালারী, গ্রীক ও রোমান আর্ট, প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পকলার নিদর্শন ইত্যাদি রাখা হয়েছে। কোন কোন দেশের পেইন্টিং সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক।

সপ্তম শতাব্দী হ'তে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুস্‌লিম সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন-সমূহ জাদুঘরটিতে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এ-সব দেখে মুসলমানদের সোনালী অতীতের চিত্র মানসপটে ভেসে উঠে। পশ্চিমে মরক্কো হ'তে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন মুস্‌লিম দেশের আর্ট ও শিল্প সৌকর্য এখানে সংগৃহীত রয়েছে। বিভিন্ন যুগের নানা ধরণের চীনামাটির পাত্রসংখ্যা ১৬০০। ঈজিপ্ট, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হ'তে আনীত কাঁচ ও ধাতব পাত্র, পারস্য ও ভারতের রাজ-কীয় নিদর্শন, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কার্পেট এবং সিরিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বাড়ীর মডেল দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করে এবং ক্ষণকালের জন্য তারা দুনিয়া ভুলে যায়।

ইসলামিক আর্টের মধ্যে দশম শতাব্দীর চীনামাটির পাত্র ও পিতলের গাড়ু (ঝাড়ি), একাদশ শতাব্দীর হস্ত লিখিত কোরআন শরীফের পাতা, আরবী তোগড়া হরফে লিখিত কোরআন পাকের আয়াত, মস্‌জিদের মেহরাবের নমুনা, বিভিন্ন প্রকার মোজাইকের কাজ, হাতীর দাঁতের শিল্প, মক্‌সাখচিত বিভিন্ন দ্রব্য, নক্সি-মৃৎপাত্র ও জালা ইত্যাদি দেখে বিস্মিত হই। এদেশে প্রায় সব শহরেই ছোট বড় অনেক মিউজিয়াম রয়েছে। আর সেখানে দর্শকদের ভীড়ও থাকে প্রচুর।

মার্টিন বেক থিয়েটার

নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে অবস্থিত 'মারটিন বেক থিয়েটার হল'। এ-টি একটি নামজাদা খান্দানী থিয়েটার। এখানে জনপ্রতি প্রবেশ মূল্য সর্বনিম্ন ৪৫ ডলার (বাংলাদেশী ১৮০০/০০ টাকা) এবং ব্যাল্‌কনীর ৬৫ ডলার। কাজী মামা দু'খানা ব্যাল্‌কনীর টিকিট কিনে আমাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ের একঘন্টা আগেই আমরা থিয়েটার হলে পৌঁছি। ১৯২৪ সালের ১১ই নভেম্বর মিঃ মার্টিন বেক থিয়েটারটি উদ্বোধন করেন। সময় কাটানোর জন্য নিকটবর্তী হাডসন নদীতীরে বেড়াতে যাই। প্রশস্ত নদী। নদীর বুকে ভাসমান কয়েকখানা জাহাজ দেখা গেল। তন্মধ্যে একখানা বেশ বড়। তার পাঁচতলা পানির উপরে, আর পাঁচতলা পানির মধ্যে। কাজী মামা বললেন, জাহাজখানা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এখন একটা দর্শনীয় মিউজিয়াম। জাহাজটির উপরতলায় একখানা বোমারু বিমান ও আরো কয়েকটি বিমান রয়েছে। যুদ্ধকালে জাহাজটিতে বিমান ওঠানামা করতো। তার স্মৃতি স্বরূপ বিমান ক'টি রাখা আছে। এখানে প্যারেড মাঠ, খেলার মাঠ ও কয়েকটি দোকান আছে।

জাহাজটির মধ্যে বিভিন্ন তলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রসমূহ দর্শক-দের জন্য সজ্জিত রাখা আছে। টিকিট কেটে জাহাজে গিয়ে মিউজিয়াম দেখতে হয়। আমাদের হাতে সময় না থাকায় মিউজিয়াম দেখা সম্ভব হয়না। দূর থেকে দেখেই ফিরে আসি।

ঠিক সময়মত নাটক শুরু হয়। বইয়ের নাম 'গ্রাণ্ড হোটেল'। এদেশে হোটেলে যেসব কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে, নাটকটির মাধ্যমে তাই পরিবেশন করা হয়েছে। হোটেলে অবস্থানরত অতিথিদের সঙ্গে তন্বী ড্যান্সার যুবতীদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে বার বার চুম্বন এবং অন্ধকারে শয্যা গ্রহণের দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অশ্লীল বোধ হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের লোকদের কাছে এ-সব কিছু নয়। এগুলো তাদের সমাজচিত্র। আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত দু'ঘন্টার নাটক।

ওপেন ষ্টেজ থিয়েটার। আলোর সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তনের কলাকৌশল চমৎকার। নাটকে কোন প্রকার পর্দা বা সিনসিনারীর কারবার নাই। মাঝে কোন ব্রেক বা কনসার্ট নাই। এ-সবে সময় নষ্ট করার পক্ষ-পাতী তারা নন। আলোর সাহায্যে পট পরিবর্তনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। নাটকে রেকর্ড করা বাজনা যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। নাট্যমঞ্চের দ্বিতলের এক

ব্যালকনীতে বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা আছে। এককালে এগুলো নাটকে ব্যবহৃত হোত। এখন আর কাজে লাগে না। তাই দর্শনীয় বস্তু হিসেবে রাখা হয়েছে।

হলটি দ্বিতল। প্রথম ও দ্বিতল মিলে সিটসংখ্যা দু'হাজার। সম্পূর্ণ হল কানায় কানায় ভর্তি ছিল। অতিরিক্ত আসন ম্যানেজ করে কাউকে বসানো হয়নি। নাটকটি দেখাকালে মনে হচ্ছিল সিনেমা দেখ্‌ছি। সাবলীল গতিতে ঘটনা প্রবাহ দর্শক-মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ছে। নাটক-শিল্পীদের ইংরেজী এ্যাক্‌সেন্ট সব বুঝতে না পারলেও তন্ময় হয়ে দেখি। কিভাবে দু'ঘন্টা কেটে যায় টের পাই না।

নাটক শেষে কাজী মামা আমাকে নিয়ে যান তাঁর মেসে। তিনি কুইন্স এলাকায় অণ্টোরিয়া মেসে থাকেন। তাঁর সাথে থাকেন আরও কয়েকজন বাংলাদেশী। ঢাকা সূতরাপুরের সাবিবর আহমেদ (সিল্), মাদারীপুরের এস্‌কেন্দার মিয়া, মুলাদি-বরিশালের মোজাম্মেল হোসেন, চট্টগ্রাম রাউজানের বাচ্চু আলম, ফেনীর মিঃ টিপু প্রমুখ বিভিন্ন কক্ষে থাকেন। চট্টগ্রাম প্রেমকাননের জনাব এরফানুর রহমান এক কক্ষে সপরিবারে থাকেন। কাজী মামা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা বিভিন্ন অফিসে চাকুরী করেন। দেশের লোক পেয়ে সবাই খুশী হন। আমাকে আপ্যায়নের জন্য কয়েকজন স্বহস্তে রান্না করেন। বাংলাদেশের ভাইদের সঙ্গে পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করি। আহারান্তে মেসেই রাত কাটাই।

প্রাক্তন ছাত্রীর সাক্ষাৎ

আমি গাইবান্ধা কলেজে অধ্যাপনাকালে (১৯৫৩—৫৫) আই, এস-সি, ক্লাশের অন্যতম ছাত্রী ছিল ফিরোজা বেগম। তার পিতা ডাঃ শাহ্ আবু বক্কার সাহেবের বাড়ী গোবিন্দগঞ্জ। মেয়েটি তার চাচা শাহ্ আব্দুল হামিদ (প্রাক্তন এম, এন, এ,) সাহেবের বাড়ী গাইবান্ধা থেকে কলেজে পড়তো। শাহ্ আব্দুল হামিদ ছিলেন গাইবান্ধা কলেজের সেক্রেটারী; তা' ছাড়া একজন উচ্চ পদ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আমরা রাজশাহী সরকারী কলেজের ছাত্র থাকাকালে মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনকালে শাহ্ সাহেবের পক্ষে প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তখন থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিটিকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

তাই গাইবান্ধা কলেজে যোগদানের পরদিনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই। সেখানেই ফিরোজার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। তারপর ছাত্রী হিসেবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। মেয়েটি বুদ্ধিমতী ও ভাল ছাত্রী ছিল। আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলাম। দু'বছর পর আমি গাইবান্ধা কলেজ ত্যাগ করে রংপুর কারমাইকেল কলেজে যাই। ফিরোজার খবর নিয়ে জানতে পারি, সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। গাইবান্ধা কলেজের আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক—সেতার উদ্দিনের

সঙ্গে ফিরোজার বিবাহের খবরও পরে জান্‌তে পারি। একদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর তেত্রিশ বছরের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয় নাই বা তার কোন খবরও পাইনি। ঢাকায় ফিরোজা বেগম নামে এক ডাক্তারের কাছে জেনেছিলাম, আমার ছাত্রী ফিরোজা আমেরিকায় থাকে। এর বেশী জানা সম্ভব হয়নি।

আমি ফ্লোরিডায় ছোট ভাই ডাঃ সিরাজুল ইসলামের বাড়ীতে থাকাকালে নিউইয়র্কের একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফিরোজা বেগমের একটি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। সিরাজকে বিজ্ঞপ্তিটি দেখায়ে বলি—'এ ফিরোজা হয়তো আমার গাইবান্ধা কলেজের ছাত্রী হ'তে পারে।' বিজ্ঞপ্তিটিতে টেলিফোন নম্বর ছিল। আমি সিরাজকে তার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করার কথা বলি। সে বলে—'আপনি পাগল হয়েছেন, এই ফ্লোরিডা শহরেই কয়েকজন ডাক্তার ফিরোজা বেগম আছেন। নিউইয়র্ক ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেক ডাক্তার আছেন। আপনার ছাত্রীর সঠিক ঠিকানা না জেনে টেলিফোন করা উচিৎ হবে না। অজানা অচেনা কোন মহিলাকে ফোন করলে, তিনি আপনাকে মাথা খারাপ ভাববেন।' ভেবে দেখ্‌লাম, সিরাজের কথা অমূলক নয়। তাই আপাততঃ ফোন করা আর হ'ল না।

কয়েক দিন কেটে গেল। আমার মন বার বার বলতে থাকে—এই ফিরোজাই, সেই ফিরোজা—আমার ছাত্রী। সিরাজ ক্লিনিকে ছিল। সুযোগ পেয়ে আমি টেলিফোন করলাম। সব মিলে গেল। ফিরোজা মহাখুশী, আমি আমেরিকায় এসেছি জেনে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে 'স্যার আপনি কবে নিউইয়র্কে আসবেন? আমার ছেলেকে পাঠাব--আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসার জন্য।' আমি তাকে বলি ঠিক আছে। অবশ্যই তোমাকে জানাব। তার সঙ্গে ফোনে অনেক কথা হয়। তার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, পুত্রকন্যা সবার খবর জেনে নেই।

বিকেলে সিরাজ বাসায় ফিরলে তাকে বললাম, ফিরোজাকে ফোন করেছিলাম। পেয়েছি। সে আমার ছাত্রী। শুনে সিরাজ মুচ্‌কি হাসে।

নিউইয়র্কে পেঁৗছে ফিরোজাকে ফোন করি। আমার বৌমা পারভিন কাকে ফোন করছি জেনে বললো—ডাক্তার ফিরোজা বেগম এ দেশে খুব নামকরা ডাক্তার। আমিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমার কথা শেষ হলে বৌমা তার সঙ্গে আলাপ করে।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফিরোজার ছেলে ফায়সাল সেতার উদ্দিন কার নিয়ে আসে। সে কম্পিউটার বিজ্ঞানে এম, এস-সি, করেছে। তাঁদের বাড়ী লং আইল্যাণ্ডের ১১, লিণ্ডেন লেন, ওল্ড ওয়েস্ট বাড়ী। লং আইল্যাণ্ড এক শত মাইল লম্বা একটি দ্বীপ। বাদ মাগরেব বৌমা ও পিয়াল (ভাতিজা) সহ আমরা ফায়সালের গাড়ীতে রওনা হই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বাড়ী পেঁৗছি।

ডাঃ ফিরোজা, তার আম্মা, কন্যা, জামাতা, ভগ্নি, পুত্রবধূ, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও দু'টি শিশুর সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দিত হই। বিয়ে বাড়ীর ন্যায় আনন্দের লহরী ছোটে। শিশু দু'টির মধ্যে একটি ফায়সাল সেতার উদ্দিনের কন্যা ময়না; অপরটি ফিরোজার ভাইয়ের ছেলে জজ। অবশ্য জজ নামটি সেদিন আমিই তাকে দিয়েছিলাম—তার জজ সাহেবের ন্যায় গম্ভীর চেহারা দেখে। ফিরোজার জামাতা ডাঃ মোহাম্মদ সাইফ (অপূ) ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ হয়। এর মাঝে চা-নাস্তা পর্ব শেষ হয়। শিশু দু'টিকে পেয়ে বৌমা পারভিন ও পিয়াল তাদের খুব আদর করতে থাকে। আমিও তাদের কোলে নিয়ে আদর করি।

পারভিন ও ফিরোজার ক্যামেরায় কয়েকটি ছবি তোলা হয়। ফিরোজার স্বামী সেতার উদ্দিন ঢাকায় থাকায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হই। আলাপের এক পর্যায়ে ফিরোজা আমাকে জিজ্ঞেস করেঃ স্যার আপনার ছাত্রী কেটি ও রওশন এরশাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় কি? জবাবে বলি, 'না তাদের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে রওশনের স্বামী এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁর অফিসে একদিন সাক্ষাৎ করেছিলাম। কেটির কোন খবর জানি না। ফিরোজা বলে, 'গাইবান্ধা কলেজে রওশন এরশাদের নাম ছিল খুরশীদ জাহান ডেইজী। সে ১৯৫৪-৫৫ শিক্ষা বর্ষে গাইবান্ধা কলেজের ছাত্রী ছিল। তার পিতা জনাব উমেদ আলী ছিলেন গাইবান্ধার মহকুমা অফিসার। সম্ভবতঃ ১৯৫৫ সালের ৮ই মার্চ ডেইজীর বিয়ে হয়।'

দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ আলোচনার পর খাবার টেবিলে যাই। বিবিধ খাবার সামগ্রী দেখে চক্ষুস্থির! কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা খাই ভেবে পাইনা। পরিবেশনার প্রতিযোগিতার কারণে সবকিছুরই কিছু কিছু খেতে হয়। খাবার টেবিলে কথাবার্তায় ধীরে সুস্থে খেতে অনেক সময় কেটে যায়। রাত অধিক হওয়ায় আমরা বাসায় ফিরতে চাই। বিদায়ের পূর্বে কথা হয়, আগামী দিন সকাল দশটায় অপূ ভাই আমাকে নিয়ে ব্যাটারী পার্ক, ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি, লিবার্টি আইল্যাণ্ড, এলিস আইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেখাবে। ফায়সাল আমাদেক বাসায় পৌঁছে দেয় রাত প্রায় একটায়।

ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি

ডাঃ মোঃ সাইফ (অপূ)-এর সঙ্গে সকাল দশটায় 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখতে বের হই। প্রথমে পৌঁছি ব্যাটারী পার্কে। পার্কটি লোয়ার ম্যানহাটনে—নিউইয়র্ক সামুদ্রিক পোতাশ্রয়ের সন্নিকটে। তেমন বৃহদাকার না হলেও এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। একশ' দশ তলা দু'টি গগনচুম্বী সৌধ এখান থেকে অল্প দূরে অবস্থিত। এককালে নিউইয়র্ক সিটির পত্তন শুরু হয় লোয়ার ম্যানহাটন থেকে। জনশ্রুতি আছে, কোন এক সময়ে ডাচগণ এখানকার ভারতীয়দের নিকট হতে মাত্র চব্বিশ ডলার মূল্যে লোয়ার ম্যানহাটন এলাকা ক্রয় করে তথায় বসতি স্থাপন শুরু করে। ডাচদের প্রস্তর নির্মিত সুরক্ষিত ফোর্ট এখনও একটি

দর্শনীয় বস্তু। লোয়ার ম্যানহাটন নিউইয়র্কের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাটারী পার্কের মধ্যে ক্যাসল ক্লিনটন ন্যাশনাল মনুমেন্ট অবস্থিত। তার সন্নিকটে কতিপয় স্কাইস্ক্রেপার ভবন পরিদৃষ্ট হয়। ম্যানহাটন নিউইয়র্ক সিটির প্রাণকেন্দ্র।

ব্যাটারী পার্ক হতে অল্পদূরে কার রেখে অপু ভাই টিকিট কিনতে যায়। এখানে কার পার্কিং চার্জ ষোল ডলার এবং টিকিটের দাম প্রত্যেকের ছয় ডলার। সব সেই দেয়। আমাকে কোন পয়সা খরচ করতে দেয় না।

পার্কটির নাম ব্যাটারী পার্ক কেন, জিজ্ঞেস করায়, অপু ভাই বলে, ব্যাটারীর ন্যায় গোলাকৃতি বিল্ডিং এর নিকটে পার্কটি অবস্থিত হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে।

ডাঃ অপু টিকিট করতে গেলে আমি ব্যাটারী পার্কে বসে জনৈক আমেরিকানকে পাখীদের আহার করানো দেখতে থাকি। লোকটি তাঁর হাতে পাখীর খাবার ধরে রাখেন। ঘুঘু, কবুতর, চড়ুই ও বাবুই জাতীয় ছোট ছোট পাখী উড়ে এসে তাঁর হাতে, ঘাড়ে, মাথায় বসে নির্ভয়ে খাবার খেতে থাকে। কখনো বা উড়ে উঠে, আবার বসে। লোকটি 'জীবে দয়া করে যেই, স্রষ্টার দয়া লভে সেই' নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর প্রতি পাখীদের অগাধ বিশ্বাস দেখে মনে হল, তিনি কোনদিনও তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেননি। আর পাখীদের আহার করানো আজই তাঁর প্রথম নয়। আরো অনেক দিন হয়তো তিনি এইভাবে পাখীদের সেবা করেছেন। এটা বোঝা যায়—তাঁর প্রতি পাখীদের ভালবাসা লক্ষ্য করে। অবলা প্রাণী, ভাষাদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করতে অক্ষম, তবুও তাদের মনের আনন্দ এবং লোকটির প্রতি ভালবাসা তাদের খুশীর নৃত্যে ও পুচ্ছ দোলায় বেশ বোঝা যায়।

ব্যাটারী পার্ক হ'তে এক মাইল দূরে নিউইয়র্ক উপসাগরের মধ্যে লিবার্টি আইল্যাণ্ডে 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' অবস্থিত। জলজাহাজে আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা লিবার্টি দ্বীপে পৌঁছি এবং 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখি। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ফ্রান্সের জনগণ এ-টি আমেরিকাবাসীদের উপহার দিয়েছেন (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর)। 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' তাম্র নির্মিত একটি বৃহদাকার নারীমূর্তি, হস্তে তার আলোকবর্তিকা, মস্তকে স্বাধীনতার সপ্তরশ্মি বিকিরণকারী মুকুট। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীকরূপে মূর্তিটি সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার আহবান জানাতে রত। মূর্তিটির হস্তে উত্তোলিত আলোকবর্তিকা সততা ও ন্যায় বিচারের প্রতীক। মুকুটের সপ্তরশ্মি বিশ্বের সাতটি মহাদেশ ও সপ্ত সাগরের প্রতীক। মূর্তিটি বিশ্ববাসীকে সপ্ত সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় শুভাগমনের আহবান জানাচ্ছে। প্রখ্যাত স্থপতি মিঃ ফ্রেডারিক আগষ্ট বারথলডি মূর্তিটির ডিজাইন অঙ্কন করেন। এ-টি নির্মানে বিশ বছর সময় লাগে বলে জানা যায়।

আমেরিকান সরকার নির্মিত ১২ তলা বেসের উপর 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' প্রতিষ্ঠিত। বেসের উচ্চতা ১৫০´ ফিট। মূর্তিটির পদতল থেকে মস্তক পর্যন্ত উচ্চতা ১৫২´ ফিট। মূর্তিটির ভিতরে ফাঁপা এবং মস্তক পর্যন্ত আরোহণের জন্য সিঁড়ি রয়েছে। বেস্‌মেন্টের বারতলা পর্যন্ত লিফটের সাহায্যে উঠানামার ব্যবস্থা আছে। মূর্তির অভ্যন্তরস্থ দশতলা সিঁড়ি বেয়ে হেঁটে উঠতে হয়। মস্তকোপরি মুকুটের বাইরে দাঁড়িয়ে পোতাশ্রয় ও নিউইয়র্ক সিটির অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বেসমেন্টের ব্যালকনী থেকে ম্যানহাটন শহর ভালভাবে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা মূর্তির মস্তক থেকে নিউইয়র্ক শহরের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করি। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখার জন্য লিবার্টি দ্বীপে আগমন করে থাকে। 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' স্থাপনের কারণেই দ্বীপটির নাম হয়েছে 'লিবার্টি দ্বীপ'। মূর্তিটির বেসমেন্টে একটি জাতীয় ইতিহাস মিউজিয়াম, রেষ্টুরেন্ট, গিফ্‌ট শপ, রেষ্টরুম (ল্যাট্রিন) ইত্যাদি রয়েছে। জাহাজ, ফিটমার, লঞ্চ ও স্পীড বোটে লিবার্টি দ্বীপে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। তা' ছাড়া হেলিকপ্টারে উপর থেকে 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখানো হয়।

এখানকার মিউজিয়ামটিতে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও ষ্ট্যাচু নির্মাণ বিষয়ে বহুকিছু জানার রয়েছে। আমরা অনেক সময় ধরে মিউজিয়ামটি দেখি।

এলিস দ্বীপ (Ellice Island)

'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখার পর আমরা জাহাজে চড়ে এলিস দ্বীপে যাই। এখানে আমেরিকান ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম অবস্থিত। এ-টি একটি 'ঔপনিবেশিক জাদুঘর'। এখানে ১৮৯২ সাল হতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে যারা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আগমন করে, তাদের সংখ্যা, কাহিনী, ব্যবহার্য জিনিষপত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। কোন সালে, কোন দেশ হতে কত লোক আসে তা' বিভিন্ন বোর্ডে লিখে রাখা হয়েছে। একটি বৃহৎ মনোরম অট্টালিকায় জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত। অতীতে বিভিন্ন সময়ে এখানে বহিরাগতদের অফিস ছিল। ১৯৬৫ সালের ১১ই মে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট এল, বি, জনসনের ঘোষণা মোতাবেক এলিস দ্বীপকে 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে' রূপান্তরিত করা হয়েছে।

উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, সেন্ট্রাল ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ—এককথায় সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকান্‌স, আফ্রিকা ও ওসেয়ানিয়ার বিভিন্ন দেশ হ'তে প্রতি বৎসর বহুলোক আমেরিকায় আগমন করে। এখানে আমেরিকান্‌স বলতে ক্যানাডা, মেক্সিকো, ক্যারিবিন, সেন্ট্রাল ও সাউথ আমেরিকার অধিবাসীদিগকে বুঝায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি ও অন্যান্য দ্বীপসমূহ হ'তেও বহু লোক আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেছে।

১৮৯২ সাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এলিস দ্বীপের মাধ্যমে আগমনকারী বহিরাগতদের সংখ্যা এককোটি ষাট লক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব ইউরোপ হ'তে ২'৩ মিলিয়ন ইহুদী আমেরিকায় এসে বসত কায়েম করেন। বিংশ শতাব্দীতে আরো অধিক সংখ্যায় তাদের আগমন ঘটে বলে জানা যায়।

১৮৮০ সাল হ'তে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত চল্লিশ লক্ষ ইটালীয়ান আমেরিকায় আসে। এতদ্ব্যতীত ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, জার্মানী, স্ক্যানডিনেভিয়া, রাশিয়া, আফ্রিকা, হাঙ্গেরী, ক্যানাডা. মেক্সিকো, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, চীন, জাপান, আর্মেনিয়া, তুরস্ক, নরওয়ে, হংকং, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ভেনজুয়েলা ও অন্যান্য দেশ থেকে বহু লোক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। বলা যেতে পারে—বিশ্বের বুকে এমন কোন দেশ নাই বা এমন কোন জাতি নাই—যার কিছু না কিছু লোক আমেরিকায় না আছে। এখন তারা সবাই আমেরিকান। প্রত্যেক জাতি তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বজায় রেখে এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন। এ-কারণে আমেরিকাকে 'মেল্টিং পট' নামে অভিহিত করা হয়। কেননা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এখানে এক দেহে লীন হয়ে আছে। তাদের একই জাতীয়তা,—তারা আমেরিকান। আমেরিকাবাসী বলে থাকেন—'I am proud of to be an American'—আমি আমেরিকার নাগরিক জন্য গর্বিত।

নিউইয়র্কে শেষের দিনগুলো

শরীফের বাসস্থান ভার্জিনিয়া এভিনিউ তার অফিস কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বেশ দূরে (প্রায় ত্রিশ মাইল) অবস্থিত হওয়ায় সে অফিসের সন্নিকটে একটি বাসার সন্ধান করছিল। অফিস ছুটির দিনে দু'ভাই বের হই নতুন একটি বাসার সন্ধানে। পথে আমার পূর্ব পরিচিত এক বন্ধুকে পাই।

তাঁর নাম নাসিরুদ্দিন তরফদার। বাড়ী নেত্রকোনায়। তিনি স্ব-পরিবারে নিউয়ইর্কে বাস করছেন। মিঃ ও মিসেস তরফদার, তাদের সন্তানদ্বয় ও ভাই বাবলুর সঙ্গে আলাপ হয়। মিঃ তরফদার ঢাকায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করা কালে তাঁর সহযোগিতায় আমাদের গ্রাম খুবজীপুরের জন্য একটি 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র' মঞ্জুর করিয়েছিলাম। এই সুবাদে তাঁর সঙ্গে অনেক বার সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি অত্যন্ত সৎ ও অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর এক আত্মীয় মিঃ সাদেকুল হক তখন নাটোরের মহকুমা প্রশাসক ছিলেন (বর্তমানে ঢাকায় বিদ্যুৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান)।

মিঃ ও মিসেস তরফদার আমাদের না খাইয়ে ছাড়েন না। শরীফ তাদের সবাইকে আমাদের বাসায় দাওয়াৎ করে। সেদিন রাতে পারভীন বৌমা নিউইয়র্কের কয়েকটি বাংগালী পরিবারকে তাদের বাসায় এক ডিনার পার্টিতে দাওয়াৎ দিয়েছিল। উদ্দেশ্য তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হবে। ছেলে মেয়েসহ ২০/২৫ জন বাংলাদেশী ডিনারে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা লাগে ভোজপর্ব শেষ হতে।

অনুষ্ঠানটির ভিডিও ক্যাসেট করা হয়। আমার এক আত্মীয় স্নেহভাজন মহসীন আলী (খুবজীপুরের) স্বপরিবারে নিউজার্সি স্টেটে এক অনুষ্ঠানে যোগ-দান করতে যাওয়ায় ডিনার পার্টিতে আসতে পারেনা। পরদিন সে স্বপরিবারে আসে। সবাই একত্রে আহার করি। মহসীন অর্থনীতিতে ডক্টরেট করছে। বেগম মহসীন এক স্কুলে শিক্ষকতা করে। তাদের তিন বৎসর বয়স্ক ছেলে মারুফ মোহাম্মদ আলী ও এক বছরের মেয়ে ম্যালিসাকে আদর করি। পূর্ব দিনের ক্যাসেটে তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহসীন আমাদের তার বাসায় দাওয়াৎ করে এবং পরদিন কারসহ নিতে আসে। শরীফ অফিস থেকে না ফেরায় বৌমা যেতে পারে না। আমি একাই মহসীনের সঙ্গে রওনা হই। পথে আমার এক সহপাঠি ও আত্মীয় মিঃ নূর মোহাম্মদ মিয়ার (শিকারপুরের) কন্যা নাজমার বাড়ীতে যাই। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়। নাজমা মহসীনের আপন মামাতো বোন। তারা আমাদেক আপ্যায়ন না ক'রে ছাড়ে না।

মহসীনের বাসায় পেঁছিতে অনেক রাত হ'য়ে যায়। বৌমা রং-বেরঙ্গের খানা প্রস্তুত করে প্রতীক্ষা করছিল। আমরা বাসায় পেঁছে এশার নামাজ শেষ করে খানা খাই। মহসীনের চাচা ইয়াছিন আলী মাষ্টার (খুবজীপুরের) আমার মারফত মহসীনকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মহসীন তার উত্তর লিখে আমার হাতে দেয়। সঙ্গে তার ছেলেমেয়েদের কয়েকটি ছবিও পাঠায়। পরদিন মহসীন ও বৌমার স্কুল দেখে শরীফের বাসায় ফিরি। মহসীন পেঁছে দেয়।

সকাল এগারটার দিকে নজরুল ইসলাম নামে আমাদের পাশের গ্রাম শাহা-পুরের এক ছেলে আসে ভাতিজা পিয়ালের জন্য একটা কেক নিয়ে। ছেলেটির পিতা আমার অনুজতুল্য মোঃ দিদার হোসেন মৎ প্রতিষ্ঠিত চাঁচকৈড় শিক্ষা-সংঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ছেলেটি ওপি-১ মাধ্যমে আমেরি-কায় এসেছে এবং একটি ভাল চাকুরী পেয়েছে। তার কাছে আমাদের পাশের গ্রাম যোগেন্দ্রনগরের ডাঃ আব্দুস সোবহানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর পেয়ে তার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি।

রাতে ভিসিপি-তে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এঁর জীবনীর উপর একটি ক্যাসেট দেখি। কর্ণেল গাদ্দাফীর দেশ লিবিয়ায় ক্যাসেটটি তৈরী। এতে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এঁর বক্তব্য পর্দার আড়াল থেকে প্রচারিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। কতিপয় মূল্যবান হাদিস ও বিভিন্ন জেহাদের ধারাবাহিক বর্ণনা এতে রয়েছে। ক্যাসেটটি পাশ্চাত্যে বহুল প্রচারিত বলে জানা গেল।

পরদিন পিয়াল ও বৌমার সঙ্গে স্থানীয় শিশু পার্ক দেখে শপিং সেন্টারে যাই কিছু কেনাকাটা করতে। আমার নিষেধ সত্ত্বেও বৌমা আমার মেয়েদের জন্য অনেক কিছু কিনে দেয়।

আমেরিকায় থাকাকালে বাংলাদেশের যারা আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে রায়গঞ্জ থানার সলঙ্গা ইসলামিয়া হাই স্কুলের

সহকারী প্রধান শিক্ষক—আমার বিহাই জনাব আব্দুল আজীজ মিয়া অন্যতম। তাঁর পত্রের উত্তরসহ তাঁকে একশ' দশ তলা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের' একটি ভিউকার্ড পাঠাই।

পরদিন ১লা আগষ্ট সকাল আট টায় নিউইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডার পথে রওনা হই। শরীফের এক বন্ধু মিঃ হোসেন তাঁর কারে আমাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেন। বৌমা ও পিয়াল বিদায় দেবার জন্য আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে আসে। সকাল ৯-৫৫ মিনিটে নিউইয়র্ক ছেড়ে অরল্যাণ্ডোর (ফ্লোরিডায়) উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

ফ্লোরিডায় এক মাস বাইশ দিন

১লা আগষ্ট মধ্যহ্ন সাড়ে বারোটায় অরল্যাণ্ডো বিমান বন্দরে পৌঁছি। ছোটভাই ডাঃ আল্‌হাজ্ব সিরাজুল ইসলাম আমাকে ফ্লোরিডায় নিয়ে যাবার জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে প্রথমে 'ফিশ লাঞ্চ' করায়; অতঃপর কিসিমিতে তার ক্লিনিকে নিয়ে কয়েক-জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করি।

ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কে আমি পূর্ণ সুস্থ ছিলাম না। ঝাল-খাবার একদম খেতে পারতাম না। তা' ছাড়া শারীরিক দুর্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গও ছিল। এ-সব খবর সিরাজ পূর্বাহ্নে টেলিফোনে জেনেছিল। তাই আমাকে তার বাসায় নিয়ে যাবার পূর্বে ক্লিনিকে নিয়ে আমার রক্ত ও পেশাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। বিকেল আড়াইটায় তার বাসায় পৌঁছি।

যোহর নামাজ অন্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর একটা বই পড়ার জন্য নিয়ে আমার চশমা খুঁজে পাই না। কোথাও ভুল ক'রে ফেলে এসেছি, না বাসা পযন্ত এনেছি, তাও মনে পড়ে না। চশমা হারিয়ে মন খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে, এই চশমা দিল্লীর নিযামুদ্দিন বস্তীতে তবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকেজে হারিয়েছিলাম। পরে মুরব্বীদের উপদেশ মত একুশ বার দোওয়া 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন' পড়ে মোনাযাত পর খুঁজতে গিয়ে অজুর পানি গড়ানো ড্রেনের মধ্যে পেয়েছিলাম। চশমার জন্য দোওয়া পড়া শুরু করি। দোওয়া শেষে আছরের নামাজের জন্য জায়নামাজ বিছানোকালে দেখি চশমা জায়নামাজের মধ্যে। এই দোওয়ার বরকতে অতীতে আমার অনেক হারানো জিনিষ পেয়েছি।

ফ্লোরিডায় চিকিৎসাধীন

আমার রক্ত ও পেসাব পরীক্ষার পর রক্তে হাই কলেস্টরেল ও সুগার ধরা পড়ে। সিরাজ আমাকে নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে নিজে হার্ট ও মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ একজন নামকরা ডাক্তার; তবুও কয়েকজন স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর পর আমাকে কয়েকটি খাবার ঔষধ এবং প্রতিদিন ইন্‌জেকশন দিতে থাকে।

আমার জিহবার অসুখের জন্য ডাঃ সিরাজের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দন্ত চিকিৎসক ডাঃ মুরাদ খান ঠাকুরের ক্লিনিকে আমাকে নিয়ে যায়। তিনি আমার জিহবা ও দাঁত পরীক্ষা ক'রে বলেন, সব দাঁত তুলে ফেলতে হবে; অন্যথায় জিহবার অসুখ সারবে না। তাঁর কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হই। জিহবার অসুখ, বলে কিনা সব দাঁত তুলে ফেলতে হবে, এ কী রকম কথা। ডাক্তারের কথায় আমি দাঁত তুলে ফেলতে রাজী হই না।

ডাঃ ঠাকুর গোপালগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আমি তাঁর বন্ধুর বড়ভাই জন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাঁকে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি—আপনার নামের সঙ্গে ঠাকুর পদবীর ইতিহাসটা কি? তিনি উত্তরে বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের পূর্ব-পুরুষদের একজন ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর বংশের ঠাকুর পদবী পরিত্যাগ করেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলেন, অনেক ব্রাহ্মণ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তাঁদের বংশগত পদবী পরিত্যাগ করেন নি,—যেমন আব্দুল মোমেন চক্রবর্তী, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আব্দুর রহমান ব্যানার্জী প্রমুখ।

ডাঃ ঠাকুর প্রথম পরিচয়ের দিনই তাঁর বাড়ীতে দাওয়াৎ ক'রে নিয়ে যান। সেখানে পরিচয় ঘটে মিসেস ঠাকুর ও তাদের দুই পুত্র সামী ও সাদীর সঙ্গে। ছেলে দু'টি কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্র। তারা চমৎকার ইংরেজী বলে; কিন্তু বাংলা বলতে শেখেনি। ভোজপর্ব শেষ ক'রে আমরা বাসায় ফিরি।

পরদিন সিরাজ আমাকে আর এক ডেন্টাল ক্লিনিকে নিয়ে যায়। তথাকার ডেন্টিষ্টও একই কথা বলেন, 'সব দাঁত তুলতে হবে'। বাংলাদেশে পাবনা থেকে শুরু ক'রে ঢাকা পি, জি, হাসপাতাল পর্যন্ত অনেক ডাক্তারকে দিয়ে আমার জিহবার অসুখের পরীক্ষা করিয়েছি। তারা সবাই শুধু গাদা গাদা ঔষধ দিয়েছেন, কিন্তু দাঁত তোলার কথা কেউই বলেননি। দেশে দু'বছর চিকিৎসায় কয়েক হাজার টাকা খরচ ক'রে কোনই উপকার পাইনি।

যাক, কয়েকদিন পর ডাঃ মুরাদ খান ঠাকুরের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করি। তিনি ডেন্চার তৈরীর জন্য আমার দাঁতের ছাপ নেবার পর প্রথম দিনই নীচের পাটির সাতটি দাঁত তোলেন। পূর্বাহ্নে দাঁতের গোড়ায় ইনজেকশন করায় দাঁত তোলাকালে আদৌ কোন ব্যথা অনুভব করিনি। অবশ্য দাঁত তোলার আধ ঘন্টা পর বেশ ব্যথা হয়, যার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের সম্মিলিত এক ডিনার পার্টিতে আমার যাবার কথা থাকলেও যেতে পারি না। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ডিনারের ব্যবস্থা হ'য়েছিল ১৯৯১ সালে সাইক্লোন কবলিত বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে রিলিফ পৌঁছানোর সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য স্বরূপ দু'খানা হেলিকপ্টার কিনে দেবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন সভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারায় আমার ভাগ্যে দাওয়াৎ জুটেছিল, কিন্তু রেজেক জোটেনি; রেজেকের মালিক আল্লাহ্। তাঁর মঞ্জুরী ছিলনা বলেই ডিনারে যাওয়া সম্ভব হয় না।

একদিন বিশ্রাম গ্রহণ ও ঔষধ ব্যবহারের পর ব্যথার উপশম হলে পরদিন উপরের পাটির দশটি দাঁত তোলা হয়। দাঁতগুলো তুলতে এত অল্প সময় লাগে, যা আমার ধারণার অতীত। দাঁত তোলা শেষ ক'রে ডাক্তার ঠাকুর যখন হাত ধুচ্ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি—'আজ কি আর দাঁত তুলবেন না?' তিনি বলেন, সবশেষ। হাত ছাপাইয়ের মত কাজ দেখে আশ্চর্য্য হই। ডাঃ ঠাকুরের সহকারী ডাঃ মণিরুজ্জামানও একজন ডেন্টাল ডাক্তার। দাঁততোলার ব্যাপারে তিনিও অনেক সাহায্য করেন। ডাঃ জামান ঢাকার বাসিন্দা।

নকল দাঁত তৈরীর ব্যাপারে ট্রায়ালের জন্য আমাকে মাঝে মাঝেই ডাঃ ঠাকুরের ক্লিনিকে যেতে হোত। প্রায়দিনই সিরাজ তার নিজের ক্লিনিক থেকে বাসায় ফিরে আমাকে ডাঃ ঠাকুরের ক্লিনিকে নিয়ে যেতো। কাজের চাপে কোনদিন না আসতে পারলে টেলিফোনে মিসেস ঠাকুরকে বলে তাঁর গাড়ীতে আমার ক্লিনিকে যাবার ব্যবস্থা করতো। একদিন সিরাজের ক্লিনিকে বেড়াতে গিয়ে তার সহকর্মী ও পার্টনার ডাঃ সৈয়দ খালিদ লতীফ এবং ক্লিনিকের কয়েকজন মহিলা সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ হয়। ডাঃ লতীফ ভারতের হায়দ্রাবাদের লোক। তাঁর দাওয়াৎ রক্ষা করতে গিয়ে মিসেস লতীফ এবং তাঁদের পুত্র তারেক ও কন্যা সানীর সঙ্গে পরিচিত হই। মিসেস লতীফও আমাকে মাঝে মাঝে বাসা থেকে ডাঃ ঠাকুরের ক্লিনিকে নিয়ে যেতেন। তারা শুধ ক্লিনিকে পেঁৗছে দিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন না; ট্রায়াল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ট্রায়াল শেষে আমাকে তাঁদের বাসায় নিয়ে যেতেন। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প ক'রে টিভি দেখে, পেপার পড়ে সময় কাটাতাম। সিরাজ তার ক্লিনিকের কাজ শেষ ক'রে সন্ধ্যায় আসতো আমাকে বাসায় নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মিসেস লতীফ ও মিসেস ঠাকুর একদিনও আমাদেক না খাইয়ে ছাড়েননি। তাঁদের বাসায় যে কতদিন খেয়েছি তা' হিসেবের অতীত।

আমার ডায়বেটিকের চিকিৎসা ডাঃ সিরাজ নিজেই করতে থাকে। প্রতিদিন ইনজেক্শন দেয়া, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা—সবকিছু তার বিধানমত চলতে থাকে। প্রায় দেড় মাস চিকিৎসার পর আমি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠি। সম্পূর্ণ নিরাময় না হলেও কলেস্টরেল ও চিনির পরিমাণ অনেক কমে প্রায় স্বাভাবিক (Normal) হয়ে আসে।

মাসাধিককাল পর আমার উভয় পাটির নকল দাঁত পেয়ে যাই। নীচের পাটিতে ছয়টি শক্ত দাঁত থাকায় নীচের পাটির নকল দাঁতগুলো স্থায়ীভাবে সেট করা হয়। উপরের পাটি ইচ্ছামত খোলা যায়। ডাঃ ঠাকুর সিরাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেতু আমার চিকিৎসার জন্য কোন ফি গ্রহণ করতে সম্মত হন না। অন্যত্র দাঁত তৈরী বাবদ খরচ লাগে ২,৭০০ ডলার—যা অন্য ডাক্তারকে দিতে হয়।

আমার চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ফ্লোরিডায় থেকে সিরাজের সঙ্গে আশপাশের দর্শনযোগ্য যা কিছু দেখেছি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ডিজনী ওয়ার্ল্ড

ফ্লোরিডার অরল্যাণ্ডোতে অবস্থিত ডিজনী ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিখ্যাত আনন্দমেলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক এখানে আসে আনন্দ ও কৌতুক উপভোগ করতে। এখানে রয়েছে—ডিজনী ল্যাণ্ড, ম্যাজিক কিংডম, সী ওয়ার্ল্ড (Sea world)--ইত্যাদি। শিশু-যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার জন্য এটি এক স্থায়ী আনন্দমেলা ; একটি স্বপ্ন জগৎ। কোন মিষ্টান্নের স্বাদ যেমন বর্ণনা ক'রে বুঝানো যায় না, তেমনি নিজের চোখে না দেখ্‌লে কোন বর্ণনা দ্বারা কাউকে এই স্বপ্ন জগতের বাস্তব ধারণা দেয়া সম্ভব নয়।

ওয়াল্ট ডিজনী ওয়ার্ল্ডের এক অংশ 'ডিজনী ল্যাণ্ড' দেখার জন্য প্রত্যেকের ৩৫ ডলার মূল্যের টিকিট কিনে আমরা সকাল ন'টায় প্রবেশ করি। অবশ্য প্রতি টিকিটের মূল্যের উপর সরকারের প্রাপ্য শতকরা ছয় ডলার হিসেবে বিক্রয় কর (Sale Tax) দিতে হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের টিকিটের মূল্য ২৬ ডলার। পাঁচ বছরের নিম্নবয়স্কদের টিকিট লাগে না। সকাল ন'টা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত দেখেও ডিজনী ল্যাণ্ডের সবকিছু দেখা সম্ভব হয় না। আমরা দেখি ঃ (১) স্পেসশিপ আর্থ, (২) ফিউচার ওয়ার্ল্ড, (৩) জার্নী ইনটু ইমাজিনেশন, (৪) দি লিভিং সীজ, (৫) দি ল্যাণ্ড, (৬) নরওয়েজিয়ান ম্যালেস্ট্রম, (৭) চাই-নিজ প্যাভেলিয়ন, (৮) মেক্সিকো প্যাভেলিয়ন (৯) জাপানীজ প্যাভেলিয়ন, (১০) ইউনিভার্স অব এনার্জি এবং সর্বশেষে রাত ১০-১১ টা পর্যন্ত (১১) ফায়ার প্লে (আতসবাজি)। প্রতিটি শো-এর বর্ণনা দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে পড়ে জন্য শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। বিভিন্ন দেশের প্যাভেলিয়নে সেই সব দেশের অত্যাশ্চর্য ও দর্শনযোগ্য অনুপম বস্তুসমূহ স্থান লাভ করেছে। প্রতিটি প্যাভেলিয়ন যেন এক-একটি জাদুঘর।

ডিজনী ওয়ার্ল্ডের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াল্ট ডিজনী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর লস এঞ্জেলসে পরলোকগমন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি বিজ্ঞাপন চিত্র (Advertisement Film) তৈরীর মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতের সাথে জড়িত হন। তাঁর মাথায় 'ডিজনী ওয়ার্ল্ড' প্রতিষ্ঠার ধারণার পিছনে একটি মজার ঘটনা রয়েছে ঃ একদিন ট্রেনের বগীর মধ্যে একটি লেংটি ইঁদুরের ছুটাছুটি লক্ষ্য ক'রে তিনি ইঁদুরটিকে ধরে বাড়ী নিয়ে আসেন এবং ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ইঁদুরটির ছুটাছুটি ও চালচলন নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করেন। তা' থেকেই তাঁর মনে কার্টুন ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা জাগে। তখন থেকেই তিনি 'ডিজনী ল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন।

১৯২৮ সালে তিনি 'প্লেন ক্রেজি' নামে একটি নির্বাক কার্টুন ছবি নির্মাণ করেন। তার প্রধান চরিত্র ছিল 'মিকি মডিস'। পর বৎসর তিনি 'স্টিম-বোট উইলি' নামে একটি সবাক মিকি মাউস কার্টুন ছবি তৈরী করেন। তিনি নিজে মিকি চরিত্রের নেপথ্যে কণ্ঠদান করেন।

ওয়াল্ট ডিজনী তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১২৫ একর জমিতে প্রথমতঃ ডিজনীপার্ক ও ডিজনী ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ডিজনী ল্যাণ্ডের প্রধান আকর্ষণ ঃ ফ্যান্টাসী ল্যাণ্ড, এ্যাডভেঞ্চার ল্যাণ্ড ও ফ্রন্টিয়ার্স ল্যাণ্ড।

ডিজনী পার্কের একটি শাখা 'এপকট্ সেন্টার' ১৯৮২ সালে বিশ্বমেলার স্থায়ী কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথম ডিজনী পার্ক প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায়। অরল্যাণ্ডোতে দ্বিতীয় ডিজনী পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। 'ডিজনী ওয়ার্ল্ড' স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালে। এখানকার অনুকরণে জাপানে তৃতীয় ডিজনী ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের 'ইউরো ডিজনী ল্যাণ্ড' চতুর্থ স্থানীয়। এ-টি গড়ে উঠ্ছে পাঁচ হাজার একর জমির উপর। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪০ কোটি ডলার। 'ইউরো ডিজনী ল্যাণ্ডের' উনত্রিশটি আকর্ষনীয় ও দর্শনীয় বিষয়ের সবই হবে মার্কিনী ও জাপানী ডিজনীর অনুকরণে।

অরল্যান্ডো ডিজনী ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন শাখার সাকুল্য খরচ বাদে প্রতি বৎসর লাভ থাকে অন্ততঃ এক শ' মিলিয়ন ডলার।

সী ওয়ার্ল্ড

ফ্লোরিডার লেক বুয়েনা ভিস্তা জামা মসজিদের ইমাম মওলানা হাফিজ সাব্বির সাহেবের পুত্র সাদিক ও সিরাজের সঙ্গে একদিন সকাল দশটায় 'সী ওয়ার্ল্ড' দেখ্তে যাই ; ফিরি অপরাহ্ন সাতটায় (সূর্যাস্ত সাড়ে আটটায়)।

সী ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবজন্তু, সী-লায়ন, হাঙ্গর, তিমি, ডলফিন ও নানা রকমের মাছ দেখি। এখানকার প্রধান বিভাগ ঃ (১) সী ওয়ার্ল্ড, (২) টেরর্স অব দি ডীপ (ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্যাভেলিয়ন), (৩) তিমি ও ডলফিন ষ্টেডিয়াম—এখানে তিমি ও ডলফিনের নানারূপ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। (৪) সী-লায়ন ও অটার ষ্টেডিয়াম, (৫) শামু ষ্টেডিয়াম, (৬) পেঙ্গুইন এনকাউন্টার। বিভিন্ন স্থানে পশু পাখী ও মাছের খেলা দেখার পর লেকের মধ্যে স্পীড্ বোট প্রতিযোগিতা, স্কী খেলা ও বিস্ময়কর সার্কাসের খেলা দেখে ঘরে ফিরি।

ম্যাজিক কিংডম

সাদিকের সঙ্গে পরদিন সকাল দশটায় 'ম্যাজিক কিংডম' দেখ্তে যাই। সিরাজের ক্লিনিকে জরুরী কাজ থাকায় সঙ্গে যেতে পারে না। হাফিজ সাব্বির আমাদেক তাঁর গাড়ীতে ক'রে পেঁৗছে দেন। সন্ধ্যার দিকে সিরাজ আমাদের বাসায় নিয়ে আসে।

ম্যাজিক কিংডমে আমরা যে-সব রোমাঞ্চকর ক্রীড়া ও বিবিধ বস্তু দর্শন করি তন্মধ্যে প্রধান ঃ টাইফুন লেগুন (ভয়ানক জলস্রোতের বুকে মটর টায়ারে বসে ভ্রমণ), (২) ডিস্কভারী আইল্যান্ড (বিরাট প্রাণীজগতের পার্ক), (৩) উৎসব মুখর দ্বীপ (Pleasure Island)—নাচ, গান, বাজনা ও যাদুর খেলা।

(৪) মিকি ষ্টারল্যাণ্ড (মিকি ষ্টারদের সিনেমা শো), (৫) সীমান্ত দ্বীপ (Frontiar Island) : ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং সীমান্তের কৌতুক পর্দার বুকে, (৬) এ্যাডভেন্চার ল্যাণ্ড—এখানে প্রবল জলস্রোতে স্পীড বোটে আরোহণ করে পানির মধ্যে ও ডাঙ্গায় স্থাপিত নকল হাতী, বাঘ, সিংহ, কুমীর, জলহস্তী, গন্ডার, হনুমান ও অন্যান্য ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর মাঝ দিয়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। নকল হাতী শুঁড় দিয়ে পানি ছিটায়, জীবজন্তু হুঙ্কার ছাড়ে—মনে হয় সবই বাস্তব। পাহাড় থেকে প্রবল বেগে জলপ্রপাতের পানি মনে হয় এখনই স্পীডবোট ডুবিয়ে দেবে। অত্যন্ত আতঙ্কিত মনে এ-টি উপভোগ করি। (৭) আগামী দিনের বিশ্ব (টু-মরোজ ল্যান্ড) এখানে মঙ্গল গ্রহ ও অন্যান্য গ্রহলোকে অভিযানের পরিকল্পনা ও দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হয় পর্দার বুকে, (৮) ফ্যানটাসী ল্যান্ড (অনেক বিস্ময়কর দৃশ্য ও ঘটনার পরিবেশন, (৯) প্রেসিডেন্ট হল—আমেরিকার অতীত প্রেসিডেন্টদের মোমের তৈরী অবিকল মূর্তিসমূহ, (১০) রিভার কান্ট্রি (নদীর বুকে নৌ-ভ্রমণ-কালে গ্রামীণ দৃশ্য)। এর অধিকাংশই যেন এক-একটি জাদুঘর।

ডিজনী ওয়ার্ল্ডের ডিজনী ল্যান্ড থেকে ম্যাজিক কিংডমে বা সী-ওয়ার্ল্ডে যাতায়াতের জন্য মনোরেল, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, শাটল, ট্রলার প্রভৃতি যানবাহণ এবং পঙ্গুদের জন্য স্বহস্তে চালিত হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। এখানে বিভিন্ন দ্রব্য ও খাবার বস্তুর দোকান, নানারূপ খেলনার দোকান, রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, স্নাকস, কোশের মিল, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক 'রেষ্ট রুম' (টয়লেট) ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়া সুদৃশ্য ডিজনী পল্লী ও মার্কেটও দেখার মত।

ম্যাজিক কিংডমে প্রবেশের টিকেটের মূল্য ৩৫ ডলার ও ট্যাক্স। ডিজনী ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে চাইলে—ওয়াল্ট ডিজনী ওয়ার্ল্ড কোম্পানী, পোঃ বক্স—১০,০৪০, লেক বুয়েনা ভিস্তা, ফ্লোরিডা, ইউ, এস, এ, ঠিকানায় লেখা যেতে পারে।

ইউনিভারস্যাল ষ্টুডিও

সিরাজ, আমি, হাফিজ সাব্বির ও তাঁর ছেলেমেয়েসহ একদিন দশটায় ফ্লোরিডার 'ইউনিভারস্যাল ষ্টুডিও' দেখতে যাই। ফিরি রাত দশটার পর।

ষ্টুডিওর পাশে একটি মনোরম উদ্যান দেখতে পাই, তার ইংরেজীতে নাম লেখা রয়েছে—'দি গার্ডেন অব আল্লাহ্'—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাগান। উদ্যানটির পাশে একটি ছোট্ট মসজিদ (আল্লাহ্‌র ঘর) এবং একটি রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। রেষ্টুরেন্টের নাম 'দি গার্ডেন অব আল্লাহ্ রেষ্টুরেন্ট। আমেরিকায় কোন বাগান বা রেষ্টুরেন্টের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নাম যুক্ত থাকতে পারে—এটা ধারণার অতীত ছিল। কে এই বাগান তৈরী ও নামকরণ করেছেন, কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম না। নিশ্চয়ই কোন আল্লাহ্ প্রেমিক মুসলমানের কাজ এটা।

ইউনিভারস্যাল ষ্টুডিও-তে প্রথমে দেখি একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের দৃশ্য। লম্বা শাটলের এক-একটি সিটে বসে আমরা একসঙ্গে অনেক দর্শক চলতে থাকি

এক ভয়াবহ পথে। ভূমিকম্পের কম্পনে আমাদের শাটল দারুণভাবে দুলতে থাকে। সামনের ও আশে পাশের দালানকোঠা ভেঙ্গে পড়তে থাকে, ভল্‌কানিক আগুনের লেলিহান শিখা আমাদের গ্রাস করতে আসে। ভীষণ ভয় লাগে। আমরা যেন ভয়ানক বিপদে নিপতিত।

পরবর্তী দৃশ্য—'ব্যাকটু ফিউচার'—এ সাগর, পাহাড়, বরফের চাঙ্গ ও ঝোড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা শাটলে চল্‌তে থাকি বিপদ সঙ্কুল পথে। প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনার মুখোমুখী হয়েও রক্ষা পেয়ে যাই। অনুরূপ অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানের অভিযাত্রীরূপে সকল বিপদ অতিক্রম ক'রে আমরা যাত্রাস্থানে প্রত্যাবর্তন করি।

অতঃপর দেখি পশুর সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধ। খাঁচা থেকে কয়েকটি সিংহ ও বাঘ বের করে এনে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি, মারামারি ও নানারূপ খেলা প্রদর্শিত হয়। এর পর নকল সাগরের বুকে পাহাড়ের কোটরে ছোট বড় নানারকম মাছ, শেওলা বাগান, নানাবিধ জলচর প্রাণী দেখি। সবশেষে সিনেমার পর্দায় 'আমেরিকান টেইল থিয়েটার' মার্ডার শীরোট মিস্ট্রি থিয়েটার, ফ্যান্‌টাস্টিক ওয়ার্ল্ড, ঘোস্ট ব্লাস্টারস, কিংকং, মেয়েদের নাচ, সার্কাস শো দেখি। সবকিছু দেখ্‌তে বার ঘন্টা সময় কিভাবে কেটে যায়—বুঝতেই পারি না। অবশ্য বিভিন্ন শো-র ফাঁকে ফাঁকে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ করি।

ইউনিভারস্যাল স্টুডিও-তে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের 'গেস্ট রিলেশন অফিসে' এবং হারানো জিনিষপত্র বা অর্থ-সম্পদ হারান-প্রাপ্তি (Lost Found) অফিসে জমা দেয়া থাকে। মালিক সেখান থেকে পেতে পারেন। এখানে পঙ্গু দর্শকদের জন্য স্ট্রলার ও হুইল চেয়ার এবং বধিরদের জন্য 'ইয়ার এইড' ভাড়া পাওয়া যায়।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত

নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখার জন্য (১৫/৮/৯১) অপরাহ্ন দু'ঘটিকায় অরল্যাণ্ডো বিমান বন্দর হতে প্লেনে যাত্রা করি। তিন ঘন্টা পর নিউইয়র্কের কেনেডী বিমান বন্দরে পৌঁছি। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে লাগারডিয়া বিমান বন্দরে যাই। লাগারডিয়া থেকে বিমান ছাড়ে সাতটায়। দেড় ঘন্টা পর ৮-৪০ মিনিটে আমরা বাফেলো এয়ারপোর্টে পৌঁছি। আমেরিকার বিভিন্ন বিমান বন্দরে ড্রাইভার ছাড়া শুধু ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়। সিরাজ দৈনিক ৮০ ডলার ভাড়ায় একটি ট্যাক্সি রিজার্ভ করে। তিন ঘন্টা ড্রাইভ করার পর রাত ১২ টায় নায়েগ্রা সিটিতে পৌঁছি। 'ডেজইন' (Days Inn) নামে এক হোটেলে আমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়। হোটেলটিতে খাবার না পাওয়ায় অল্প দুরের এক হোটেলে গিয়ে আমরা খেয়ে আসি। 'ডেজইনে' দুই বেড বিশিষ্ট একটি কক্ষের দৈনিক ভাড়া লাগে ৮০ ডলার।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার জন্য পরদিন সকাল আটটার মধ্যে নাস্তা সেরে আমরা ট্যাক্সি করে জলপ্রপাতের সন্নিকটে পৌঁছি। উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হতে প্রবল বেগে বিস্তীর্ণ জলরাশি মুক্তাধারার ন্যায় তিন শত ফিট নীচে

নদীর বুকে পতিত হওয়ার মনোহারিণী দৃশ্যে বিস্ময়ে বিমূঢ় হই। দূর থেকে কয়েকটি ছবি তোলা হয়।

জলপ্রপাতটি নিকট হতে ভালভাবে দেখার জন্য আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ক্যানাডার মধ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু ক্যানাডা পৃথক রাষ্ট্রহেতু ক্যানাডার ভিসা না থাকায় কর্তব্যরত পুলিশ আমাদেক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফেরৎ পাঠায়।

ফিরে এসে আমরা জলজাহাজের টিকিট কেটে ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট পরে অনেক দর্শকের সঙ্গে নদীর বুকে অগ্রসর হই জলরাশি পতনের স্থানে। জলের ঝাপটায় আমাদের জ্যাকেট ও জামাকাপড় ভিজে যায়। কয়েক মিনিট পর আমরা ভিজিটিং টাওয়ারের নিকট ফিরে আসি। টাওয়ারের শীর্ষদেশ থেকে বারটা পর্যন্ত জলপ্রপাতের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করি। জানা যায়, নায়েগ্রা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে বিপুল পরিমাণের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

অতঃপর 'নায়েগ্রাফল' মার্কেট থেকে আমার জন্য একটি ওভারকোট এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য জামা, কাপড়, গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি কিনে নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরি।

বাফেলো এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি ফেরৎ দিয়ে বিমানযোগে আটটায় নিউইয়র্কে পৌঁছি এবং ছোট ভাই শরীফুল আলমের বাসায় রাত্রি যাপন করি। নায়েগ্রা ব্যতীত ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতও বিখ্যাত।

স্কাইক্রেপার

পরদিন বৌমা পারভিন ও পিয়ালসহ আমরা নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ১১০ তলা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' (Sky craper) ভবনদ্বয় দেখতে যাই। লিফ্টের সাহায্যে এক মিনিটে শীর্ষ তলায় পৌঁছি। সেখান থেকে নীচের শহর, পোতাশ্রয়, ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি, ভেড়াজানা ব্রীজ, জলজাহাজ ও বিভিন্ন যানবাহন দেখি। সবকিছু অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়। অবজারভেটরী থেকে টেলিস্কোপে নিউইয়র্ক সিটি দেখি।

কারে নিউইয়র্ক ফেরার পথে হাডসন নদীর বুকে এক মাইল দৈর্ঘ্য টানেল অতিক্রমকালে মনে প্রশ্ন জাগে—কিভাবে, কতদিনে, কি পরিমাণ অর্থব্যয়ে এই টানেল নির্মিত হয়েছে? এটি অসাধ্য সাধন বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশ জন্মের পর হতে 'যমুনা ব্রীজ' নির্মাণের কথা শুনে আসছি; বাইশ বছর যাচ্ছে, আজ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু হল না। কাজটি যে কবে হবে, তা একমাত্র ভবিতব্যই জানে।

নিউইয়র্কে ফিরে দেখি, ফিলাডেলফিয়া থেকে ছোটভাই সোহ্রাব ও বৌমা মেরিলী তাদের সব্জী বাগানের অনেক তরিতরকারী নিয়ে শরীফের বাসায় এসেছে। তারা আমাদের সঙ্গে তিন ঘন্টা থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের পর ফেয়ারলেস হিলসে রওনা হয়। অল্পক্ষন পর আমি ও সিরাজ অরল্যাণ্ডো যাবার জন্য লাগারডিয়া বিমান বন্দরে যাই। কিন্তু একই বিমানে ২ জনের সিট পাওয়া যায় না। সিরাজ ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের বিমানে সিট পায়, আর আমার সিট

হয় কন্টিনেন্টাল এয়ার সার্ভিসের বিমানে। দু'ভাই পৃথক পৃথক বিমানে সিট পাওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে যায়। উভয় বিমান পৃথক টারমিনাল থেকে এক ঘন্টা আগে পরে ছাড়ার কথা। সিরাজ আমাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তার টারমিনালে চলে যায়। যাবারকালে বলে যায়, আমি যেন অরল্যান্ডো বিমান বন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করি। সেখান থেকে এক সঙ্গে বিমান বন্দরে রাখা তার কারে বাসায় ফিরব।

আবহাওয়া খারাপের দরুণ আমার বিমান ছাড়ার সময় ১২টা থেকে ২টায় পিছিয়ে যায়। আমি ওয়েটিং রুমে বসে প্রহর গুণতে থাকি—কখন ২'টা বাজবে। দেড়টার দিকে হঠাৎ দেখি সিরাজ হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে হেঁটে আস্‌ছে। কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করায় সে জানায়, খারাপ আবহাওয়ার জন্য তার বিমানের ফ্লাইট বাতিল ক'রে তাকে কন্টিনেন্টাল সার্ভিসের বিমানের টিকিট দিয়েছে। সিরাজের ও আমার টিকিট মিলিয়ে দেখি, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাদের পাশাপাশি সিট পড়েছে (সিট নং ১০বি ও ১০সি)। আল্লাহ্‌ পাকের শুকরিয়া আদায় করি। সিরাজ আমার সিট নম্বর জান্‌তোনা, সেজন্য সে কোন নির্দিষ্ট সিটের টিকিট চায় নাই। যা হয়েছে, সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। তিনি সর্বজ্ঞানী। মানুষের মনের চিন্তাও তাঁর অজানা নয়। অন্তর দিয়ে তাঁকে ডাক্‌লে অবশ্যই সারা দেন।

বিকেল পাঁচটায় আমরা অরল্যাণ্ডো বিমান বন্দরে আসি। সেখান থেকে সিরাজের রেখে যাওয়া কারে আল্লাহ্‌র মর্জি নির্বিঘ্নে বাসায় পৌঁছি।

বুশ গার্ডেন, টেম্পা

নায়েগ্রা থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের বাসায় সৌদি আরব থেকে সিরাজের এক বন্ধু ডাঃ মুরাদ সপরিবারে এসেছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার বেতিল গ্রামের বাসিন্দা। কয়েক বৎসর সপরিবারে সৌদি আরবে ছিলেন। সেখানকার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাসের জন্য এসেছেন।

ডাঃ মুরাদের পত্নী মিসেস মুরাদ (মেরিণা), তাদের দশ বছরের পুত্র আদিল ও কন্যা সুসান (৪) সহ একদিন সিরাজ আমাদের টেম্পা নিয়ে যায় বুশ গার্ডেন দেখাতে। টেম্পা একটি মেট্রোপলিটান সিটি। এখানে 'সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়' অবস্থিত। এর আগেও আমরা টেম্পা এসেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী দেখতে। ত্রিশ হাজার ছাত্র এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা দেখলাম—যা অন্য কোথাও দেখিনি। এখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বই বিক্রীর জন্য বিষয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক লাইব্রেরী আছে। আমরা মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে গিয়ে কয়েকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই কিনেছিলাম।

বুশ গার্ডেন একটি উর্বর মস্তিষ্কের অদ্ভুত পরিকল্পনা। এখানে দেখার মত বহু কিছু রয়েছে। আমরা চিড়িয়াখানা থেকে দেখা শুরু করি। চিড়িয়াখানাটি এত সুদূর প্রসারী যে হেঁটে দেখা সম্ভব নয়। আমরা মনোরেল গাড়ীতে চড়ে চিড়িয়াখানা দেখি। মনোরেলের বগীগুলোতে কোন চাকা নাই; ট্রাম গাড়ীর

ন্যায় একক লাইনের উপর দিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। লাইন বা রেলটি সমতল ভূমি থেকে অনেক উচুতে স্থাপিত। প্রতি বগীতে ১০/১২ জনের বসার সিট আছে। প্রতি মনোরেলে ১০/১৫টি বগী পরস্পর ট্রেনের ন্যায় সংযুক্ত। গাড়ীতে উঠানামার জন্য কতিপয় ষ্টেশন রয়েছে। ইলিপ্‌সের ন্যায় চক্রাকার লাইনে গাড়ী যাতায়াত করে।

চিড়িয়াখানাটি সাফারী বিশেষ। এখানকার জীবজন্তুসমূহ উন্মুক্ত স্থানে বিচরণশীল—কোনটি খাচায় আবদ্ধ নয়। এক এক প্রকার জন্তুর জন্য এক একটি এলাকা ভাগ করা আছে। একে অন্যের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। এখানে বিভিন্ন স্থানে সিংহ, বাঘ, হাতী, হরিণ, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, হনুমান, জলহস্তী, গণ্ডার, কুমীর, কচ্ছপ ও অন্যান্য জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রকার পাখী, সাপ, গুইসাপ ও নাম না-জানা কিছু সরীসৃপ দেখলাম। পূর্বে কোন চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখিনি। এখানে বেশ বড় আকারের একটি সাদা বাঘ দেখি। বিভিন্ন রংএর ছোট বড় বহু প্রকারের হরিণ (কতিপয় গরুর ন্যায়) দৃষ্টিগোচর হয়। পাখীর মধ্যে পেলিক্যান ও আংটির ন্যায় লেজবিশিষ্ট ফ্লেমিংগো দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পেলিক্যান খুব বড় আকারের পাখী; এর চঞ্চু প্রায় দুই ফুট লম্বা। ফ্লেমিংগো অনেকটা বক জাতীয় কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের; বকের চেয়ে আকারে বড়।

চিড়িয়াখানা দেখা শেষ করে আমরা 'স্কী সার্কাস' ও বিভিন্ন কসরৎ দেখি। পায়ে স্কী (খড়মের ন্যায়) পরে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া নৈপণ্য প্রদর্শন এবং জনৈক মহিলার দড়ির উপর শারীরিক কসরৎ অত্যন্ত উপভোগ্য। দড়ির উপর ব্যালান্স নাচ ছিল অদ্ভুত! মহিলাটি তার হাতে প্লেট, জার ও বল নিয়ে খেলা দেখায় এবং বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র বাজায়। দর্শকবৃন্দ বারবার করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানায় এবং মনের আনন্দ প্রকাশ করে।

এরপর 'ডলফিন থিয়েটারে' প্রবেশ করি। একটি বিরাট ট্যাঙ্কের মধ্যে ডলফিন মাছের বিভিন্ন রকমের খেলা এবং মানুষের সঙ্গে তাদের সখ্যতা ও আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করি। ডলফিন স্তন্যপায়ী; মানুষকে ভালবাসে এবং মানুষের ন্যায় তার মধ্যে সংবেদনশীল মন আছে। ডলফিনের ডানার সাহায্যে বাইচের নৌকার মত চলা, পানিতে অর্দ্ধাঙ্গ ডুবিয়ে রেখে খাড়া হয়ে নাচা, মানুষ পীঠে নিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়ান, নানারূপ লম্ফ, ঝম্প, মৎস ভক্ষণ, মুখ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শব্দ করা, দুষ্টুমি ক'রে লেজদিয়ে পানি ছিটিয়ে দর্শকদের ভিজিয়ে দেয়া ইত্যাকার খেলা দেখি। এখানে দুই পা-বিশিষ্ট সী-লায়ন (শীল মাছ) এরও কয়েকটি খেলা দেখানো হয়। সী-লায়নের লেজ মাঝখানে বিভক্ত। কাটা লেজ তারা দু'পায়ের মত ব্যবহার করতে পারে।

অতঃপর 'বার্ডস থিয়েটারে' গিয়ে ফ্লেমিংগো, চিল, কুড়া, উকাশ, শকুন, টিয়া, ময়না, হুতুম পেঁচা, দোয়েল, কাকাতুয়া ও আরো কতিপয় অচেনা পাখী দেখি। কয়েকটি পাখীর খেলা দেখানো হয়। একটি টিয়া পাখী চিকন ধাতব

তারের উপরে ছোট্ট সাইকেল চালায় এবং কাঠের রডের মধ্যে রিং পরায়। কতিপয় পাখীকে নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একস্থান থেকে উড়ে এসে আহবানকারীর হাতের উপর অথবা ঘাড়ে বসে; আবার যেতে বললে উড়ে চলে যায়। বনের পাখীকে কিভাবে এরূপ শিক্ষা দিয়েছে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে! ময়না পাখী গান গায়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে পাখীদের খেলা দেখি।

এরপর শিশু পার্কে প্রবেশ করি। এখানে বিভিন্ন বয়সের শিশু ঘূর্ণায়মান খেলনা, ঘোড়া, হাতী, উট, পরী, দোলনা, এরোপ্লেন, মটর সাইকেল প্রভৃতিতে আরোহণ করে চক্রাকারে দ্রুতগতিতে আবর্তন করে। আমাদের সঙ্গের দুই শিশু আদিল ও সুসান হাতী ও ঘোড়ায় চড়ে আনন্দ উপভোগ করে। শতাধিক ফিট উচু একটি বড় চাকায় সন্নিবেশিত সিটে ছেলেমেয়েরা হাতল ধরে বসে; চাকাটি তাদের নিয়ে উপরে নীচে ঘুরতে থাকে, দেখে ভীষণ ভয় লাগে। মনে হয় যেকোন মুহূর্তে কেউ পড়ে মারা যেতে পারে; কিন্তু উপবিষ্ট শিশুরা নির্বিকার। দুর্দান্ত তাদের সাহস! সেখানকার তুলনায় ঢাকা শিশু পার্কের খেলাগুলো মামুলি। অবশ্য আমাদের দেশে চাকার খেলা দেখাতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। হয়তো কর্তৃপক্ষ সে-কারণেই বিপজ্জনক খেলা আমদানী করেনি। স্রোতস্বতী জলপ্রপাতের বুকে ৩০ ফিট উচু থেকে টায়ারের ন্যায় গোলাকার বোটে চড়ে শিশুদের জলস্রোতের সঙ্গে নীচে গড়িয়ে পড়া দেখে বিস্ময়ে অবাক হই।

বুশ গার্ডেন থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে 'কান্ট্রি মিউজিক শো' ও গেটের পাশের ফুল বাগান এক নজর দেখি। বাগানটিতে অন্ততঃ ৫০ প্রকার পাতাবাহার গাছ, সাদা ও হলুদ জবাফুল, অচেনা বহু প্রকার ফুল দেখতে পাই। সময় অভাবে আরো অনেক কিছু দেখার থাকা সত্ত্বেও সবকিছু দেখা সম্ভব হয় না। রাত দশটায় বাড়ীর পথে ফিরে চলি।

গেটরল্যাণ্ড

অরল্যাণ্ডোর গেটরল্যাণ্ড একটি কুমীরের চিড়িয়াখানা। ইংরেজী ভাষায় মানুষখেকো কুমীরকে ক্রোকোডাইল (Crocodile) এবং অন্য জাতের কুমীরকে এলিগেটর (Alligator) বলা হয়। অবশ্য সুযোগ পেলে এলিগেটরও মানুষ হজম করে ফেলতে পারে। 'এলিগেটর' শব্দ থেকেই গেটরল্যান্ড নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এখানে একটি বৃহদাকার জলাশয়ে, কতিপয় চৌবাচ্চায়, কতিপয় মাচায় ও ঘরে কয়েক হাজার কুমীর ও কুমীর শাবক রক্ষিত আছে। সাদা, কাল, ধূসর, পীত বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আকারের অগণিত কুমীর দেখা গেল। অসংখ্য কুমীরের বাচ্চা (কুমীর শাবক) কতিপয় কক্ষে স্তূপাকারে রাখা আছে। ইনকিউবেটরের সাহায্যে কুমীরের ডিম থেকে বাচ্চা উৎপন্ন করা হয়। এতে সময় লাগে ৬৫ দিন।

প্রাকৃতিক নিয়মে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য বৃহৎ জলাশয়ের পাশে দশ একর জমিতে ঝোপ, ঝাড় ও কচুগাছের জঙ্গলঘেরা মজাপুকুরে একশ'টি মাদী কুমীর ও ত্রিশটি পুরুষ কুমীর ছাড়া আছে। মাদী কুমীর ডাঙ্গায় উঠে কোটর ক'রে তারমধ্যে ডিম পাড়ে এবং দুই মাসের অধিক সময় ধরে নাকের নিঃশ্বাসের সাহায্যে ডিম ফুটায়ে বাচ্চা বের করে। একটি তিন তলা অবজারভেটরী টাওয়ারে উঠে কুমীরের ব্রিডিং, ইনফিউবেশন বুশ ও কয়েকটি কুমীরকে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে দেখি।

এখানে কুমীরের শিক্ষাকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্র, ডাইনিং হল, ব্যায়ামাগার, কুস্তীঘর ইত্যাদিও রয়েছে। দর্শকদের জন্য ক্যানটিন, গিফ্‌ট শপ, স্নাকবার আইসক্রীম শপ, ফটো এরিয়া, রেস্টরুম (টয়লেট), বাগান ইত্যাদি আছে।

বেলা ১১টা, ২টা ও ৫টায় কুমীরের 'জাম্পারু শো' দেখানো হয়। বড় জলাশয়টির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি কাঠের ঘরে এক ব্যক্তি দড়ির সাহায্যে মাংসের টুকরা বেঁধে নীচের দিকে ঝুলিয়ে ধরে, কুমীর প্রায় তিন হাত উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠে মাংসের টুকরা ছিঁড়ে খায়। একই দড়িতে অনেকগুলো মাংসের টুকরা কিছু ফাঁকে ফাঁকে ঝুলানো থাকায় একসঙ্গে কয়েকটি কুমীর বারবার লাফালাফি ক'রে খায়। দেখ্‌তে বেশ মজা লাগে। পেট না ভরা পর্যন্ত তারা খেতে থাকে। পেট ভরলে দূরে সরে যায়। একেই বলে 'জাম্পারু শো'। প্রতিবারে এক ঘন্টা শো চলে।

গেটরল্যাণ্ডের সমগ্র এলাকা জলাশয়ের পাড় দিয়ে হেঁটে দেখা যায়। বহু দর্শককে হাঁটতে ও ছবি তুল্‌তে দেখ্‌লাম। আমরাও কয়েকটি ছবি তুলি।

গেটরল্যাণ্ডে কুমীর ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর একটি চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে কয়েকটি বানর, ছাগল, কচ্ছপ, পাইথন সাপ, দু'টি নকল বাঘ, কতিপয় ফ্লেমিংগো ও ম্যাকো বার্ড, পাঞ্চো, বোরিস, কাকাতুয়া ও লেগুণ পাখী দেখলাম। কয়েকটি কচ্ছপ আকারে বিরাট ও লেজবিশিষ্ট এবং স্বর্ণালী টেগু লিজার্ড (গুই সাপের ন্যায়) আশ্চর্যজনক প্রাণী। ধীরে ধীরে চিড়িয়াখানাটি সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচারপত্রে দেখ্‌লাম 'পার্ক ইন দি উড্' ক্রোকোডাইল ওয়ার্ল্ড ও ক্রেকার স্টাইল ভিলেজ নতুন তিনটি বিভাগ সংযোজিত হতে যাচ্ছে।

গেটরল্যাণ্ডে প্রবেশ ফি নয় ডলার। সিরাজ জানায়, গত বৎসর প্রবেশ ফি ছিল মাত্র তিন ডলার। কুমীরকে খাওয়ানোর খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রবেশ ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো বাড়বে।

ক্রোকোডাইল জু (Zoo)

গেটরল্যাণ্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে সিরাজ ও আদিল সহ 'ক্রোকোডাইল জু' নামে ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানা দেখি। হাফিজ সাব্বির সাহেব তাঁর মসজিদ-মাদ্রাসার ৩০/৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আসেন তাদেক এ-টি দেখাবার জন্য।

এখানে ২৫/৩০টি কুমীর, বানর, হনুমান, বাঘ ও বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি পাখী রাখা আছে। একটি পার্কের মধ্যে এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত। কতিপয় ট্যাংকে কুমীরগুলো রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলে মনে হল।

কেনেডী স্পেস সেন্টার

একদিন সকাল দশটায় ডাঃ সিরাজ, সাদিক ও তার দুই ভগ্নিসহ কেনেডী স্পেস সেন্টার দেখ্‌তে যাই। এ-টি কেপ কেনেডীতে অবস্থিত আমেরিকার মহাশূণ্যযান উৎক্ষেপন কেন্দ্র। এখান হতে নভোমণ্ডলে যাত্রার জন্য রকেটসমূহ উৎক্ষিপ্ত হয়। কয়েকটি বৃহৎ আকৃতির রকেট দাঁড়িয়ে রয়েছে- দেখলাম।

১৯৬৫ সালে একটি রকেট ৭ জন নভোচারীসহ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু রকেটটি বিস্ফোরণের ফলে তাঁরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে এ্যাপোলো—১ মাধ্যমে তিনজন নভোবিজ্ঞানী—গ্রীসম, হোয়াইট ও রোজার মহাশূণ্যে যাত্রা করেন। দুর্ঘটনার কবলে তাঁরাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাঁরা মহাশূণ্য অভিযানে জীবন দান করেন, তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে 'এ্যাষ্ট্রোন্যাটস মেমোরিয়াল' বা নভোচারী স্মৃতি-সৌধ। ১৯৯১ সালের ৫ই আগষ্ট এ-টি জাতীয় স্মৃতিসৌধ রূপে ঘোষিত হয়। ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট মার্কিন মহাশূণ্যচারী এল, গর্ডন কোপার ও চার্লস কর্ণার্ড মহাশূণ্যে আটদিন পরিভ্রমণের পর নিরাপদে আটলান্টিক মহাসাগরে অবতরণ করেন।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই এ্যাপোলো--১১-তে তিনজন নভোচারী নীল আর্মষ্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স কেনেডী স্পেস সেন্টার হতে মহাশূণ্যে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৯শে জুলাই নভোযানটি চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে প্রবেশ করে। ২০শে জুলাই আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রযান ঈগলে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। কলিন্স কমাণ্ড মডিউল 'কলোম্বিয়া' চাঁদের কক্ষপথে পরিচালনা করতে থাকেন। এই মিশনের কমাণ্ডার আর্মষ্ট্রং চন্দ্রযান ঈগল পরিচালনা করেন। ২১শে জুলাই বিকাল ৪টা ১৭ মিনিটে ঈগল চাঁদে অবতরণ করে। সর্বপ্রথম মানুষ চাঁদের বুকে পদচারণা করেন—নীল আর্মষ্ট্রং। তাঁকে অনুসরণ করেন এডুইন অলড্রিন। তাঁরা দু'ঘন্টা ধরে ধূলিময় চন্দ্রপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করেন। তাঁদের সাফল্য বিশ্বমানবের জন্য অনেক অজানা রহস্যের উদঘাটন করবে—আশা করা যায়। তাঁরা আমেরিকার জাতীয় পতাকা এবং একটি শিলালিপি চাঁদের বুকে স্থাপন করেন। শিলালিপিতে লেখাছিল ঃ 'Here men from the planet Earth first set foot on the moon, July, 1969 A. D. We came in peace for all mankind.'—পৃথিবী নামক গ্রহ হতে এখানে চাঁদের বুকে সর্বপ্রথম মনুষ্যপদক্ষেপ রাখা হয়, জুলাই, ১৯৬৯। আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য শান্তির বাহক।

তাঁরা ক্যামেরায় চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি তোলেন এবং চাঁদের মাটি ও চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন—যা কেপ কেনেডি জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। বাইশ ঘন্টা অবস্থানের পর ঈগল চন্দ্রবক্ষ ত্যাগ ক'রে কলোম্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ২৪শে জুলাই রাত্রি দশটা ছাপান্ন মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিরাপদে অবতরণ করে। বিশ্ববাসী টেলিভিশনের পর্দায় চন্দ্র বিজয়ের দৃশ্য অবলোকন করেন।

১৯৬১ সালের ৫ই মে ফ্রিডম—৭ মাধ্যমে আমেরিকার নভোবিজ্ঞানীগণ মহাশূণ্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করেন। তাঁরা এ্যাপোলো—৭ হতে এ্যাপোলো—১৭ মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ছয় বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আজও তাঁদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কেপ কেনেডি হ'তে পূর্ব ঘোষিত তারিখ ও সময়মত রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়। এখানে দর্শকদের জন্য স্পেস শাটলে শূণ্যলোকে বিলাস ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। নাসা (NASA) কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে টিকিট বিক্রয়ের মাধ্যমে মহাশূণ্য ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। ক্ষুদ্রাকৃতি প্লেনে এখান থেকে বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করা যায়। আমেরিকার প্রতিটি শহরেই বিমান বন্দর আছে। কোন কোন শহরে শতাধিক বিমান ঘাটি রয়েছে।

আতিথেয়তা

আমার তিন মাস আমেরিকায় অবস্থানের অধিকাংশ সময় কেটেছে ফ্লোরিডায়। এখানে ছোটভাই ডাঃ সিরাজের বন্ধু বান্ধব ও প্রীতিভাজনদের আন্তরিকতা ও মেহমানদারীর কথা ভুলবার নয়।

ডাঃ মুরাদ খান ঠাকুর ও ডাঃ সৈয়দ খালিদ লতিফ পরিবারের আদর আপ্যায়নের কথা পূর্বেই বলেছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ক'টি কথা বলেই শেষ করছি।

একদিন ডাঃ ঠাকুরের বাড়ীতে এক অনুষ্ঠানে যাই সিরাজ ও তার বন্ধু ডাঃ মুরাদের পরিবারসহ। অনেকেই এসেছিলেন অনুষ্ঠানটিতে। আত্মীয় মেহমান ও শিশুদের কল-কাকলীতে বাড়ীটি ছিল মুখরিত। বড়রা গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবার অলক্ষ্যে ডাঃ মুরাদের চার বছরের শিশুকন্যা সুসান গোছলের ট্যাঙ্কে পড়ে ডুবে যায়। এক বয়স্কা মহিলা মেয়েটিকে ট্যাঙ্কের মধ্যে মাছের মত খলবল করতে দেখে তার হাতধরে পানি থেকে টেনে তোলেন। আর এক মিনিট দেরী হলে মেয়েটিকে জীবন্ত পাওয়া যেত না। দুর্ঘটনাটি সবাইকে চিন্তান্বিত করে তোলে।

ডাঃ মুরাদ ঠাকুরের এক ভাই অরল্যাণ্ডো হতে ৬৫ মাইল দূরে নিউ স্মার্ণা পল্লীশহরে সমুদ্রসৈকতের (সী-বীচের) সন্নিকটে বাস করেন। একদিন ডাঃ ঠাকুর আমাদের সী-বীচ দেখবার জন্য নিউ স্মার্ণা নিয়ে যান। আমাদের সঙ্গী ছিলেন বরিশালের কাজী শামসুর রহমান (ছরু কাজী)। ডাঃ ঠাকুর ও তার

ভাইয়ের পরিবারের শিশুদের নিয়ে আমরা আটলান্টিক মহাসাগর দেখতে যাই। দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গিতে বারংবার সৈকত প্লাবিত ক'রে পরক্ষণেই সমুদ্রে ফিরে যেতে থাকে। অপরূপ মনোহারিণী দৃশ্যটি শিশুদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তারা সমুদ্রসৈকতের নরম বালির মধ্যে গড়াগড়ি খেলতে থাকে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ তাদের তলিয়ে দেয়। ঢেউয়ের ধাক্কায় তারা পাড়ের দিকে ভেসে আসে, আবার ঢেউ নামাকালে উল্টোস্রোতে দূরে ভেসে যায়। আমরা সৈকতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখি।

এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়, তবু বাচ্চাদের পানি থেকে তুলে আনা যায় না। হাঙ্গর কুমীরের ভয় দেখায়েও ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত অনেক বকাঝকা ক'রে আমরা তাদের ফেলে বাড়ীর দিকে হাঁটার উপক্রম করি। তারা তখন ঝটপট পানি থেকে উঠে আমাদের পিছু পিছু দৌড়াতে থাকে। ঘরে ফিরে আহার অন্তে অরল্যাণ্ডোর পথে রওনা হই। এখানে ঠাকুর বাড়ীর লাউ গাছে এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করি। একটি বৃহৎ আম্র বৃক্ষ আশ্রয় ক'রে লাউ গাছটি ডালে ডালে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তাতে ঝুলে আছে ছোট বড় শ' খানেক লাউ। আম্র শাখায় এত লাউ দেখে আমরা তাজ্জব হই। বিদায় গ্রহণকালে মেজবান ভাই আমাদের গাড়ীতে সওগাত স্বরূপ কয়েকটি লাউ তুলে দেন।

একদিন সিরাজের সঙ্গে সেজোভাই ইঞ্জিনিয়ার সোহরাব হোসেনের শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে যাই। তার শ্বশুর মিঃ উইলিয়াম ডজ পারডো এককালে মিচিগানের হেন্‌রি ফোর্ড মটর কোম্পানীর সেলস্ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বর্তমানে তিনি সপরিবারে সাউথ অরল্যাণ্ডোতে অবসর জীবন যাপন করছেন। তাঁর পত্নী মিসেস বেটি অ্যানে হানটিংটন পারডো। তাঁরা আমেরিকার আদি বাসিন্দা। তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ ছাড়া সাক্ষাতের সুযোগ ইতঃপূর্বে ঘটেনি। তাঁরা আমাদের পেয়ে অত্যন্ত খুশী হন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর প্রাণভরে আলাপ করি।

১৯৯০ সালের ১১ই ডিসেম্বর আমাদের আব্বাজান ইহধাম ত্যাগ করেছেন জেনে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর বিদেহীআত্মার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র কেলী (১৭) ১৯৭২ সালের ১৬ই জুন মটর ড্রাইভকালে একটি গাড়ীর সঙ্গে সামনাসামনি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করে। তার কথা উত্থাপন ক'রে তাঁরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। বর্তমানে তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তান আমাদের ভ্রাতৃবধূ মেরেলী হোসেন রয়েছেন। তাঁর এক কন্যা ও তিন পুত্র। পারডো দম্পত্তি মাঝে মাঝে তাঁদের কন্যা ও নাতনী-নাতীদের দেখার জন্য ফেয়ারলেস হিলসে যান এবং তাঁদের সঙ্গে দু'চার দিন কাটান। তাঁদের নাতনী আশা হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ে। নাতী ওমর কলেজের এবং এরিক ও রব স্কুলের ছাত্র।

আপ্যায়ন অন্তে মিঃ পারডো আমাদের নিয়ে তাঁর ক্যামেরায় কয়েকটি ছবি তোলেন। অতঃপর তাঁদের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগান দেখান। কয়েকদিন আগে

বৃষ্টি বর্ষণকালে বজ্রপাতে বাগানটির যে ক্ষতি হয়েছে, তা আমাদেক দেখান। মাগরেব নামাজের সময় আসন্ন হওয়ায় আমরা তাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ ক'রে মসজিদের পথে রওনা হই।

একদা হায়দ্রাবাদের জনাব আব্দুল লতিফ কাসু তার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আদনান কাসুর কোরআন মজীদ খতম অনুষ্ঠানে দাওয়াৎ করেন। আমরা যোগদান করি। সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়। জনাব কাসুর পুত্র আদনান সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে ডাঃ সিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র সালমান ইসলামের সহপাঠী। ছেলেটি স্কুলে পড়ার সাথে সাথে লেক বুয়েনা ভিস্তা জামা মসজিদ মক্তবে পড়ে ছহিভাবে কোরআন পাক পড়তে শিখেছে এবং এক খতম দিয়েছে। তার এই প্রথম খতম উপলক্ষে জাঁকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় দু'শ লোক অনুষ্ঠানে এসেছেন। সবাই ছেলেটিকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে প্রাণভরে দোওয়া করছেন। আমরাও সামীল হই। ছেলেটি সুললিত কণ্ঠে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শোনায়। তার ওস্তাদ মওলানা হাফেজ সাব্বির আহমেদ বেহলীম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। শেষ পর্বে ভোজনান্তে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে দোওয়া করে বিদায় হই।

আমেরিকায় অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষনীয়। তা' হ'ল দ্বীন ইসলামের প্রতি তাঁদের আন্তরিক অনুরাগ এবং বিভিন্ন দেশের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সৌহার্দবোধ অতীব প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে এর একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যকে এর মূল কারণ ভাবা হয় তো ঠিক হবে না, কেননা আমাদের দেশে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত বনেদী পরিবারেও ধর্ম পালনের ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের মধ্যে অনীহা দেখা যায়। দেখে মনে হয়, তাদের অন্তরের গভীরে মন ও মগজে ঈমানরূপ কন্দতরু শেকর গজাতে পারেনি, যদ্দরুণ ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাদের মধ্যে আদৌ জন্মেনি। এদের কোনমতেই মৌলবাদী বলা যায় না। যাঁরা মৌলিক বা মূল বিষয়কে আঁকড়ে ধরে জীবনকে পরিচালিত করেন, তাঁরাই মৌলবাদী, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ।

বিদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা দেখে মনে হয়— তারা যেন একই পরিবারের সদস্য। প্রমাণ স্বরূপ, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে সাহায্যের জন্য ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রবাসী জনগণের সম্মিলিত তৎপরতা ও প্রয়াসের কথা উল্লেখ্য। অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা কন্ট্রিবিউটরী ডিনারের ব্যবস্থা করেন। প্রতিটি সদস্যের জন্য ডিনারের চাঁদা ধার্য হয় এক শ' ডলার। খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ পাবে দূর্গত বাংলাদেশ।

ডিনার উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান করার রিহার্সেল চলছিল ভারতের ডাঃ রানুদির বাড়ীতে। সিরাজের সঙ্গে সেখানে যাই। উপস্থিত শিল্পীবৃন্দ ও অন্যান্যদের

সঙ্গে পরিচয়ের পর আপ্যায়ন ও সঙ্গীত একই সঙ্গে চলতে থাকে। চা, পান-কালে কয়েকটা মেয়ের বাংলা ও হিন্দি গান শুনে ক্ষণেকের জন্য ভুলেই যাই যে, এখন আমেরিকায় আছি। ঘন্টাটেক রিহার্সেল দেখে বিদায় গ্রহণ করি।

এখানে ভারতের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতাভগ্নির সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খবর জানার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। মনে পড়ে যায়, সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর কথা। তিনি এক পত্রে আমাকে লিখে-ছিলেন, "দেশ ভাগ হলেও আমাদের মন ভাগ হয়নি"।

একদিন মাগরেব নামাজ পর ত্রিণিদাদের জনৈক ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিক জনাব ফারুক আদমের বাড়ীতে দাওয়াৎ রক্ষার্থে যাই। তিনি তাবলিগী ভাই। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নামজাদা আলেম। পরিবারটিতে পর্দা পুসিদা কঠোর ভাবে পালন করা হয়। জনাব ফারুকের বেগম বা মেয়ে কেউই আমাদের সামনে আসেন না। তাঁরা পর্দার আড়ালে থেকে খাবার এগিয়ে দেন। মিঃ ফারুক পরিবেশন করে খাওয়ান।

সিরাজের আর এক বন্ধু হায়দ্রাবাদের ডাঃ শাকিল আহমেদ-এর আমন্ত্রণে একদিন তাঁদের বাড়ী যাই। ডাঃ ও মিসেস শাকিল এবং তাদের পুত্র সেলিম ও কন্যা সালমার সঙ্গে সবাই একত্রে আহার করি।

লেক বুয়েনা ভিসতা জামা মসজিদের ইমাম মওলানা হাফেজ সাব্বির আহমেদ বেহলীম একদিন বাদ এশা তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। তিনি, তাঁর দুই পুত্র শোয়েব ও সাদেক এবং দুই কন্যা সাকেরা ও শামীমসহ আমরা পানাহার করি।

আর এক তাবলিগী ভাই পেশোয়ারের জনাব বশির আহমেদ তাঁর বাড়ীতে দাওয়াৎ করেন। পেশোয়ারীদের খাবার গল্প অনেকেরই জানা আছে। আস্ত একটা ভেড়া বা দুম্বা রোস্ট ক'রে কয়েকজন একত্রে বসে কেটে খেয়ে সাবার করে। তাই মেজমানের বাড়ী যাবারকালে ভয় হচ্ছিল, আমাদের জন্য ঐরূপ আস্ত একটা রোস্টের ব্যবস্থা না করলেই রক্ষা। তাঁদের বাড়ী পৌঁছে দেখি, আস্ত একটা রোস্টের বদলে বিশ রকম খানা তৈরী করে বিরাট টেবিল ভর্তি করে রাখা হয়েছে। বশির সাহেব তার তিন ছেলে ও ছোট্ট এক মেয়েসহ আমরা একত্রে আহার করি। আমাদের সঙ্গে জনাব আবদুর রহমান পম্পি নামে আর একজন মেহমান ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হয়। তিনি একজন পাকিস্তানী। বশির সাহেবের বেগম পর্দানশীনা মহিলা। তিনি পর্দার আড়াল হতে মেহমান-দারী করেন।

ছোটভাই সিরাজ একদিন সন্ধ্যায় এক হোটেলে কতিপয় পরিবারকে চাইনীজ খাওয়ানোর জন্য দাওয়াৎ করে। আটটি পরিবারের ২৫/৩০ জন এসে ছিলেন ছেলেমেয়েসহ। হোটেলটিতে জনাব আবদুল হাই নামে জনৈক পাকি-স্তানীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। তিনি স্থানীয় কাবাব রেস্টুরেন্টের

মালিক। একজন তাবলিগী ভাই। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর রেস্টুরেন্টের খাবার এনে মসজিদের মুসল্লী ও তাবলীগ জামাতের ভাইদের খাওয়াতেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন। বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয়গণ তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে হালাল গোস্ত পরিবেশিত হয়।

লেক বুয়েনা ভিসতা জামা মসজিদের সহকারী ইমাম জনাব মওলানা হাফেজ উসমান আবোভাট (গুজরাট) প্রায়ই মসজিদের দ্বিতলে তাঁর কক্ষে নিয়ে চা, নাস্তা করাতেন। মসজিদটিতে নামাজের পূর্বে অথবা পরে প্রায় প্রতিদিনই যাঁর সঙ্গে আলাপ করতাম, তিনি হলেন জনাব সামী-উয-জামান। পাকিস্তানে তাঁর বহিন ও অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন। তিনি আমাকে তাঁর আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ পাঁচখানা মূল্যবান বই উপহার দেন। সবার স্মৃতি আজীবন মনের পর্দায় রয়ে যাবে।

হারানো ব্যাগ সমাচার

লণ্ডন যাত্রাকালে ঢাকায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমার দু'টি লাগেজ জমা দিয়েছিলাম ঃ একটি সুটকেস, অপরটি কাপড়ের হ্যাণ্ডব্যাগ। লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পেঁৗছে সেদিন একটি লাগেজও পাওয়া যায় না। পরদিন বিমান বন্দরে গিয়ে আমার সুটকেসটি পাই, কিন্তু ব্যাগ লাপাত্তা। ব্যাগটির মধ্যে আমার লেখা ২০/২৫ খানা বই, ব্যবহার্য জামা কাপড়, ডাইরী খাতা, নোটবুক, টর্চ লাইট ইত্যাদি ছিল। সবই প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্তর।

হারানো ব্যাগের জন্য হিথ্রো বিমান বন্দরে সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট একটি অভিযোগ পত্র দাখিল করি। তিনি আমাকে একটি নতুন লাগেজ স্লিপ দেন। নিউইয়র্কে কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পেঁৗছে উক্ত লাগেজ স্লিপ দেখাই। সেখানেও অনুসন্ধান ক'রে ব্যাগটির হদিস মেলেনা। কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের লাগেজ স্লিপ রেখে আমাকে আর একটি স্লিপ দেন এবং বলেন ঃ 'ব্যাগটি পাওয়া গেলে আপনাকে নিউইয়র্কের ঠিকানায় পেঁৗছে দেয়া হবে।' নিউইয়র্কে থাকাকালীন কয়েকদিন টেলিফোন ক'রে ব্যাগের কোন সন্ধান জানা যায় না। বার বার হতাশ হ'য়ে ভেবেছিলাম, ব্যাগটি আর পাওয়া যাবেনা।

আমি ফ্লোরিডায় অবস্থানকালে ২০শে সেপ্টেম্বর রাতে নিউইয়র্ক থেকে ছোটভাই শরীফ টেলিফোনে জানায়, হারানো ব্যাগটি পাওয়া গেছে। কেনেডি বিমান বন্দরের জনৈক কর্মচারী ব্যাগটি তার বাসায় পেঁৗছে দিয়ে গেছেন। খবরটি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হই। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্ পাকের শুক্‌রিয়া আদায় করি এবং বিমান কর্তৃপক্ষকে মনে মনে ধন্যবাদ দেই।

কয়েকদিন পর নিউইয়র্কে পৌঁছে ব্যাগটি হাতে পেয়ে দেখি, ব্যাগটিতে লাগানো ছোট্ট টিপতালাটি শুধু নেই। তা' ছাড়া আর সবকিছু ঠিক আছে। কোনকিছুই খোয়া যায়নি। ব্যাপারটি ঘটেছিল, ব্যাগের সঙ্গে ঢাকা বিমান বন্দরে লাগানো আমার আমেরিকার ঠিকানা লেখা লাগেজ স্লিপ বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়ায়। ঠিকানা অভাবে ব্যাগটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কোন ঠিকানাবিহীন চিঠি পোস্ট করা হলে তা' যেমন 'ডেড লেটার অফিসে' যায় এবং সেখানে চিঠি খুলে তার মধ্যে প্রেরকের ঠিকানা থাক্‌লে তাকে ফেরত পাঠানো হয়, তেমনি আমার ঠিকানাবিহীন ব্যাগটা শিকাগো এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়, তথায় তালা ভেঙ্গে ব্যাগের দ্রব্যাদি আমার অভিযোগ পত্রের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অভিযোগ পত্রে প্রদত্ত ঠিকানায় নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে ব্যাগটি পাঠানো হয়। এতে সময় লেগে যায় প্রায় তিন মাস। দেরীতে হলেও ব্যাগটি পেয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখি।

●

আমেরিকায় মুসলমান

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় আশি লক্ষ মুসলমান বাস করেন। তাঁরা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক মসজিদ, মক্তব, ইসলামী পাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি।

অরল্যাণ্ডো সিটির লেক বুয়েনা ভিস্তা এলাকায় কোন মসজিদ ছিলনা। তথাকার মুস্টিমেয় মুসলমানদের চেষ্টায় নিজেদের প্রয়োজনে ১৯৮৮ সালে 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থার কর্মকর্তাগণ একটি 'জামা মসজিদ' প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সংগ্রহ ক'রে নব্বই হাজার ডলার মূল্যে তিন একর জমি ক্রয় করেন। জমি সংস্কার ও কার-পার্কিং লন তৈরীতে ব্যয় হয় প্রায় ছয় লক্ষ ডলার। অতঃপর মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। নিজেদের অর্থে ও পরিশ্রমের ফলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয় একটি বিরাট দ্বিতল মসজিদ। কোন সরকারী অনুদান বা বৈদেশিক সাহায্য মসজিদটি নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা হয় নাই। মসজিদটি 'লেক বুয়েনা ভিস্তা জামা মসজিদ' নামে পরিচিত। ১৯৯০ সালের রমজান মাস হ'তে নতুন মসজিদটিতে নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু হয়।

মসজিদটির নীচ তলায় প্রায় চার'শ পুরুষ এবং দ্বিতলে দু'শ মহিলা এক সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়তে পারেন। মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক প্রবেশ-পথ ও বের হবার দরজা আছে। শুধু মেয়েরা দ্বিতলে নামাজ পড়েন। পুরুষ মুসল্লীগণ তাদের দেখতে পাননা। দ্বিতলে মেয়েদের নামাজ-কক্ষের বিপরীত পাশে ইমাম ও সহকারী ইমামের কক্ষ, ষ্টোর রুম ইত্যাদি আছে। নীচের তলায় নামাজের কক্ষের পিছন দিকে সভাকক্ষ, মসজিদ পাঠাগার, অজুর স্থান, বাথরুম, রেস্ট রুম (টয়লেট) ইত্যাদি রয়েছে। মসজিদের তিনদিকে কয়েক শ' কার পার্কিং-এর জন্য পাকা লন রয়েছে। মসজিদটির চতুষ্পার্শ্বে ফুল গাছ ও অন্যান্য গাছ রোপণ ক'রে স্থানটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মসজিদের নিজস্ব বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এখানে ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মক্তব পরিচালিত হয়। মক্তবে ৬০/৭০ জন ছাত্রছাত্রী আরবী কায়দা ও কোরআন শরীফ পড়ে। এতদ্ব্যতীত কোরআন মজীদের তফসীর ও শব্দার্থ শিখানোর জন্য এশার নামাজের পর কোরআন ক্লাশ হয়। অনেকেই তাতে যোগদান করেন। মসজিদটির ইমাম মওলানা হাফেজ সাব্বির আহমেদ বেহলীম (বোম্বাই-এর) এবং সহকারী ইমাম হাফেজ উসমান আবোভাট (গুজরাটের) মক্তবে শিক্ষাদান ও কোরআন ক্লাশ পরিচালনা করেন।

মসজিদটি পরিচালনার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি শুরা রয়েছে। শুরার আমীর ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ডেপুটি আমীর মোঃ আব্দুল হাই, কোষাধ্যক্ষ--মাহমুদ হাসান খান এবং সদস্য ঃ ডাঃ আবদ-আল-রহমান মামসা, বশির খান, সামি-উয-জামান ও সেলিম খানানী।

মসজিদটি উন্নয়ন ও পরিচালনাকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি শুক্রবার জুম্মা নামাজের সময় একটি কাগজের বাক্স মুসল্লিদের নিকট চালনা করা হয়। তাতে প্রতিদিন গড়ে তিনশ' ডলার আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত মসজিদের প্রবেশ-পথে দরজার পাশে সাহায্য দানের জন্য একটি লোহার সিন্দুক রাখা আছে। এক মাস পর পর বাদ জুম্মা সিন্দুকটি খুলে শুরার বৈঠকে গণনা করা হয়। তাতে প্রতি মাসে গড়ে বারশ' ডলার হয়। প্রতি শুক্রবার বাদ জুম্মা শুরার বৈঠক বসে। আমি কয়েক দিন শুরার বৈঠকে উপস্থিত থেকে দেখেছি,—মসজিদটির প্রতি তাঁদের সবারই অপরিসীম আন্তরিকতা আছে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। মসজিদ নির্মাণের জন্য মালমসলা সরবরাহ বাবদ জনৈক কন্ট্রাক্টরের পাওনি বার হাজার ডলার ফাণ্ডে অর্থ না থাকায় পরিশোধ করতে সমস্যা দেখা দেয়। জুম্মা নামাজের পূর্বে শুরার আমীর মুসল্লীদের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ক'রে সাহায্য দানের প্রস্তাব রাখেন। সেই-দিনই ১৪ হাজার ডলার আদায় হয়। তাঁদের দারাজহস্তে দান করা দেখে মুগ্ধ হই।

মসজিদ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণের জন্য সম্প্রতি আরো দেড় একর জমি কেনা হয়েছে। তথায় মাদ্রাসা ভবন, হাই স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, গোরস্থান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা বর্তমানে 'ইসলামিক সেন্টার অব অরল্যাণ্ডো' নামে পরিচিত।

আট বৎসর পূর্বে অরল্যাণ্ডো শহরের গোল্ডেনরড রোডে ইসলামিক সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার' কল্যাণে একটি জামা মসজিদ প্রতিষ্ঠা ক'রে তথায় 'মুসলিম একাডেমী অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা' নামে একটি হাই স্কুল ও মক্তব পরিচালনা করা হচ্ছে। হাই স্কুলটিতে সরকারী পাঠ্যসূচীর সঙ্গে অতিরিক্ত দু'টি ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। উভয় মসজিদে সপ্তাহে পাঁচ দিন দু'ঘন্টা ক'রে ধর্মীয় বিষয় পড়ানো হয়। প্রায় দেড়শ' ছাত্রছাত্রী ধর্মীয় ক্লাশে যোগদান করে।

অরল্যাণ্ডো সিটির জনসংখ্যা সাত লক্ষ ; তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শিকাগো ও নিউইয়র্ক শহরে মুসলিম জনসংখ্যা সর্বাধিক। জেনেছি একমাত্র নিউইয়র্ক শহরে প্রায় এক হাজার মসজিদ আছে।

ডাঃ সিরাজের বাসা থেকে লেক বুয়েনা ভিস্তা জামা মসজিদে, কারে যেতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় লাগে। আমরা অধিকাংশ ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে

জামাতে নামাজ আদায় করতাম। কেউ কেউ এশা পর মসজিদে নামাজ কালামে সারারাত কাটাতেন। মসজিদটিতে ওয়াক্তিয়া নামাজে প্রায় শ' খানেক মুসল্লী উপস্থিত দেখেছি। জুম্মা নামাজে মসজিদ প্রায় ভরে যেতো। এখানে মাঝে মাঝে তবলীগ জামাতের আগমন ঘটে। একদিন লণ্ডন হতে এক তবলীগ জামাত আসে। উক্ত জামাতের আমীর ছিলেন মওলানা হাফেজ মোঃ আব্দুর রহমান প্যাটেল। তাঁরা পাঁচ ভাই। সবাই মওলানা ও হাফেজ। তাঁদের পিতা মওলানা হাফেজ প্যাটেল ইংল্যাণ্ডের ডুজবাড়ী মসজিদের ইমাম। লণ্ডনের জামাত তিন দিন এই মসজিদে থাকাকালে অরল্যাণ্ডো হতে পাঁচজনের এবং টেম্পা হতে দশজনের দু'টি জামাত এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমি ও সিরাজ তাঁদের সঙ্গে তিন দিন সময় লাগাই। স্থানীয় সাথী ভাইদের সঙ্গে কয়েকটি জামাত মিলে প্রায় একশত জন সব সময় মসজিদে হাজির থাকতেন। মসজিদ কমিটির পক্ষ হতে সবার আহার ও নাস্তার ব্যবস্থা করা হোত।

মওলানা হাফেজ আব্দুর রহমান প্যাটেলের বক্তব্য হতে জানা যায়, একমাত্র লণ্ডন শহর হতে গত রমজান মাসে ৮০০টি জামাত বাইরে বের হয়েছে এবং আরও একশ'টি জামাত লণ্ডনের মধ্যে কাজ করছে। তিনি কয়েক দিন ধরেই অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেন।

তিন দিন পর আমাদের জামাতসহ মোট চারটি জামাত বাদজুম্মা দক্ষিণ মিয়ামী শহরের গার্ডেন মসজিদে এক এস্তেমায় যোগদানের জন্য রওনা হই বিকেল তিনটায়। সেখানে পৌঁছি রাত ন'টায়। ফ্লোরিডা ষ্টেটের মধ্যে মিয়ামী সবচেয়ে বড় সিটি,—দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল এবং প্রস্থ ২৫ মাইল। এখানে সৌদী আরব, মরক্কো, টেম্পা, বাহামা, ত্রিনিদাদ ও মিয়ামীর কয়েকটি জামাতে ৬০/৭০ জন আসেন। তবলীগ জামাতের লোকদের থাকার জন্য গার্ডেন মসজিদের সঙ্গে বেশ বড় একটি ঘর রয়েছে। আমরা তথায় অবস্থান করি এবং মসজিদে নামাজ, কালাম পড়ি। সবার খাবার ব্যবস্থা মসজিদের পক্ষ থেকে করা হয়। পরামর্শ সভা, বয়ান ও আহার অন্তে শয্যা গ্রহণের অনুমতি পাওয়া যায়।

পরদিন বাদ ফজর বয়ান করেন ডাঃ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। গৃহীত কর্মসূচী মোতাবেক সারাদিন ও রাত অতিবাহিত হয়। পরদিন ফজর নামাজ, তকরীর ও নাস্তা অন্তে আমরা অরল্যাণ্ডোর পথে ফিরে চলি। পথে অসংখ্য অরেঞ্জ গার্ডেন দৃষ্টিগোচর হয়। ৫০/৬০ মাইল রাস্তায় অসংখ্য অরেঞ্জের বাগান চোখে পড়ে। এখানে অরেঞ্জ বলতে কমলা ও মাল্টা উভয়ই বুঝায়।

তবলীগ জামাতের কয়েকজন সাথী ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মুহম্মদ বশীর ও তাঁর পুত্র বেহজাদ বশীর (দক্ষিণ মিয়ামীর), ডঃ মোজাম্মেল সিদ্দিকী, পি-এইচ, ডি, ইমাম, ইসলামিক সেন্টার অব অরেঞ্জ কাউন্টি, ক্যালিফোর্নিয়া, আব্দুল ইলাহ্ (আটলান্টা), রহমান আলী কসিম (মিয়ামী), আবদেল কবির ইলমহ (মরক্কো), আনসার শেখ (প্রেমব্রোক,

ফ্লোরিডা), মওলানা মিউরিক আহমেদ (জেদ্দা), আদনান আল্-মোবারক (রিয়াদ), মওলানা হাফেজ আব্দুর রহমান প্যাটেল (লণ্ডন), খলিল ওয়াকার (আলাবামা) প্রমুখ। জনাব খলিল ওয়াকার একজন খৃষ্টান ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর মূল্যবান বক্তৃতা থেকে বোঝা গেল, ইসলাম সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

ম্যাসাচুসেটসের মুসলমানদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ ম্যাসাচুসেটসের কুইসি মসজিদে অনুষ্ঠিত মিলাদুন্নবী সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠাকল্পে এক শক্তিশালী সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে—'দি মুসলিম ইউনিভারসিটি অব আমেরিকা'। কমিটিতে আছেন ঃ সভাপতি—আবদুল বাতেন জামাল আহমেদ, সহ-সভাপতি ঃ সোহায়েল হাসমী ও মরিয়াম লাহাজ, সাধারণ সম্পাদক ঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আলী খান, কার্যনির্বাহী পরিচালক ইব্রাহিম বি, সাঈদ ও শাহজাহান মাহমুদ।

সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের চেয়ারম্যান ক'রে কয়েকটি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে ঃ জনাব আবদুর রহমান (অর্থ কমিটি), মোঃ রিয়াজ খান (শিক্ষা কমিটি), হামেদী কাদের (ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন কমিটি), নাসিমা খান (প্রচার কমিটি), ইমাম দাউদ (ধর্মীয় কমিটি), আব্দুল বাতেন জালাল আহমেদ (ফাণ্ড সংগ্রহ কমিটি)।

কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা সকল মুসলমানকে মুক্তহস্তে সাহায্যদানের আহবান জানান। (সাপ্তাহিক ঠিকানা, নিউইয়র্ক ৪-১০-৯১)।

বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহ হ'তে আমেরিকা বিচ্ছিন্ন ; তা' ছাড়া দু'টি ভয়াল মহাসাগর (আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর) আমেরিকাকে বাদবাকী বিশ্ব থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে। এ-কারণে মুসলিম জাহান এবং ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত নন। এই অজ্ঞতাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে পড়েছে। ইসলামকে সঠিক ভাবে না জানার জন্যই তাঁদের অনেকের মধ্যে ইসলাম-আতঙ্ক বিরাজমান। অজানা বিষয়ে ভুল ধারণা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে আশার কথা যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণীদেরমধ্যে ইসলামকে জানার আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় সুধীজনের বক্তব্য তুলে ধরছি ঃ

১) যুক্তরাষ্ট্রের 'জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের' আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব মজীদ কাদ্দরী 'জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে' অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলেন ঃ কোন দেশেরই উচিত নয় অপর দেশের অভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যারা অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন, সেদেশের প্রতি জনমণ্ডলীর মনে অধিকতর আস্থার সঞ্চার হয়। ইসলামপন্থী জনগণ ইসলামের আদর্শ অনুসরণ ও প্রচার করবেন—এটা স্বাভাবিক। এটা তাদের প্রাণের তাগিদ। তাঁদের প্রতি বিরূপ

মনোভাব পোষণ না ক'রে ইসলামের আদর্শকে বুঝতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে খোলাচোখে দেখে শুনে পথ চলে।'

২) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য মিঃ মারভিন ডিমালী পরিষদের বৈদেশিক বিষয়ক সাব-কমিটি মিটিং এ (২০শে মে, ১৯৯২) বলেন ঃ 'আমেরিকানদের উচিত ইসলামী মৌলবাদ সম্পর্কে তাদের অভিমত শ্রবণ করা—যেন তারা আন্দোলনটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।'

'পপুলার এ্যারাব এণ্ড ইসলামিক কন্ফারেন্স ইন সুদান' এর মহাসচিব ডঃ হাসান আল্ তুরাবী আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমেরিকান কংগ্রেসে যোগদান করায় কতিপয় সদস্য ডঃ তুরাবীর কংগ্রেসে ভাষণ দানের বিরোধিতা করেন। তার উত্তরে মিঃ ডিমালী বলেন ঃ 'বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক নীতিতে ভিন্নতর মতামত পেশ ও শ্রবণের অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ মতাদর্শকে উৎসাহিত করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমরা শুধুমাত্র এমন একটি বিষয় সম্পর্কে নিজেদেরকে এবং আমেরিকার জনগণকে অবহিত করতে চাই—যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।'

অতঃপর ডঃ তুরাবী তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ ইসলামী মৌলবাদ একটি 'বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ' আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য—আন্দোলনের আদর্শকে সামাজিক-সংস্কারে বাস্তবায়িত করা; আর তা' হবে চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটিত সমাজের জন্য কল্যাণকর। আন্দোলনের ক্রমবিকাশে বাধা প্রধান না করা হলে আন্দোলন গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করবে। এ আন্দোলন দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত—যা সংঘর্ষের বদলে ঐকমত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।'

৩) ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর মিঃ দানিয়েল পাইপস 'ইসলামী মৌলবাদ' সম্পর্কে ডঃ তুরাবীর অভিমতকে যতটা না বাস্তব, তার চেয়ে অধিক তত্ত্বগত বলে অভিহিত করেন।

৪) হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুলাইমান নিয়াং (গাম্বিয়ার) বলেন ঃ 'মৌলবাদীরা দূরে চলে যাচ্ছেন না, কিংবা দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হচ্ছেন না। তারা যে আন্দোলন করছেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।' তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এ-আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে—এটা অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত।'

৫) জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মাইকেল হাড্সন বলেন ঃ 'ইসলামী মৌলবাদে কিছুটা পাশ্চাত্য বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত সুর আমেরিকাবিরোধী নয়। তিনি পরস্পরকে ভালভাবে জানার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য ও ইসলামী বিশ্বকে প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানান। তিনি উভয় সমাজকে

নেতিবাচক বক্তব্য পরিহার ক'রে উভয়ের ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে আহবান জানান। ইসলামী মৌলবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রে সংঘর্ষের পথ অনুসরণ করা পাশ্চাত্যের উচিত নয়—বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, পাশ্চাত্যের উচিত বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য, এ-আন্দোলন দ্বারা সামাজিক কল্যাণ ও অর্থ-নৈতিক উদারতার দিকসমূহ উৎসাহিত করা এবং ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সঙ্গতির বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা।

৬) হলিক্রস কলেজের অধ্যাপক জন এসপোসিটো বলেন, অন্যান্য আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্র যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে, ইসলামী আন্দোলনও সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই দেখা উচিত। (ইউসিস ও দৈঃ সংগ্রাম)।

৭) নর্থ ক্যারোলিনার ডারহামস্থ ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়ন এন্ড ইসলামিক স্টাডিস-এর অধ্যাপক মিঃ ভিনসেন্ট যোসেফ (নও মুসলিম) এবং 'হিউম্যান স্যালভেশন' এর মুখপাত্র ইমাম ওয়ারিত দীন মোহাম্মদ মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলমানগণ ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন।

সারাবিশ্বে এখন ইসলাম ও ইসলামী বিধিবিধান আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছে। বড়গাছে বেশী ঝড় লাগে। ইসলামের প্রতি অনেকের হুমকিই তা' প্রমাণ করে। আমেরিকায় রেডিও-টিভিতে ইসলাম ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কে বিতর্ক বা বাহাস নিয়মিত প্রচারিত হয়। এতে মনে হয়, একদিন ইসলামের উদার নীতি তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

৮) নিউইয়র্কস্থ ইসলামিক কন্ফারেন্স কমিটি বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামিক কন্ফারেন্সের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন এবং তাতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বক্তাদের দাওয়াৎ করা হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মুফাচ্ছিরে কোরআন আলহাজ্ব মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী এবং আরো অনেকেই আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান ক'রে ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ইসলাম পরিচিতি

ইস্লামের মূলবাণী—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—আল্লাহ্ ছাড়া মাবূদ (প্রভু) নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রসূল (বার্তাবাহক)।

চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, পাতাল, মানব, দানব, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরু, লতা—এক কথায় সৌরজগতে যা কিছু আছে, সবার একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা আল্লাহ্। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ (কারো মুখাপেক্ষী নন)। তাঁর কোন সন্তান নাই এবং তিনি কারো সন্তান নন। তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

তিনি পরজগতে আমাদের পৃথিবীর বুকে অবস্থানকালীন কৃতকর্মের বিচার করবেন। তিনি বিচারদিনের মালিক। দুনিয়ার বুকে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে ন্যায়পথে চললে তিনি পরকালে পুরস্কৃত করবেন (চিরশান্তির আবাস বেহেস্ত দান করবেন) এবং অন্যায়কারীকে দোজখের আগুনে অনন্তকাল শাস্তি দিবেন।

মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মখ্‌লুকাত)। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলাই তার নৈতিক দায়িত্ব।

মূলভিত্তি

ইসলামী আইনের মূলভিত্তি আল্-কোরআন ও আল্-হাদিস। কোরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) মারফত শেষনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়। এ-টি সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। আর হাদিস হজরত নবী করিম (দঃ) এঁর বাণী এবং তাঁর সম্পাদিত ও সমর্থিত কার্যাবলী।

আল্-কোরআন

কোরআন মজীদ বিশ্বের সকল মানব ও জীন জাতির জন্য অনুসরণীয় জীবনব্যবস্থা। এ-টি এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (A Complete Code of life)।

কোরআন শুধু মুসলমানের জন্য নয়, বিশ্বের সকল মানব ও জীন জাতির জন্য পথনির্দেশক ঐশীগ্রন্থ। আল কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্‌র তরফ হতে যে সকল ঐশীগ্রন্থ পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা' বিশ্বাস করার নির্দেশ কোরআন মজীদে রয়েছে। আল্ কোরআনের ন্যায় তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিলও ঐশীগ্রন্থ —এ কথা প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

কোরআনের নির্দেশ ঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আল্লাহ্-প্রেরিত নবী ও রসুলদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা চল্‌বেনা ; তাঁদের সবার প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। এরূপ উদার নীতি ইসলাম ভিন্ন অন্যকোন ধর্মে দেখা যায় না।

ত্রিশ পারা (খণ্ড) কোরআন শরীফে ১১৪টি সূরা এবং ৬৬৬৬টি আয়াত (বাক্য) রয়েছে। বিশ্বের বুকে কোরআন মজীদ মুখস্থ করা হাফেজের সংখ্যা অগণিত (কত লক্ষ তার হিসাব নেই)।

আল্-কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম—এতে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নাই ; একথা কোরআন মজীদের শুরুতেই সূরা বাকারায় বলা হয়েছে। অধিকন্তু আল্লাহ্ একই সূরাতে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, কোরআন সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ থাক্‌লে অনুরূপ একটি কোরআন, একটি সূরা বা একটি আয়াত তৈরী করো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তরও দিয়েছেন—'তা তোমরা কোন-দিনই পারবে না।'

বিশ্বের মানব বা জ্বীন জাতির একজনও এই চ্যালেঞ্জকে পরাভূত করতে পারেনি ; আর পারবেও না কোনদিন। আরবের ইসলাম বিদ্বেষী তৎকালীন বিখ্যাত কবি লবীদ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে চাওয়ায় তিন আয়াত বিশিষ্ট 'সূরা কাওসার' খানায়ে কাবার গায়ে বোর্ডে লিখে দেয়া হয়। তাঁকে চতুর্থ আয়াত লিখতে বলা হয়।

উল্লিখিত সূরার আয়াত তিনটি ঃ

'ইন্না আতায়না কাল্-কাওসার (১)
ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার (২)
ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আব্তার।' (৩)

কবি লবীদ বহুক্ষণ ধরে চিন্তার পর চতুর্থ ছত্র লেখেন ঃ

'লায়ছা হাজা কালামুল বাশার'—অর্থাৎ ইহা মানব রচিত হতে পারে না। কোরআনের সত্যতায় বিমুগ্ধ হ'য়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ন্যায় অনেকেই আল্ কোরআনের সমালোচনার জন্য কোরআন পাঠ শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত কোরআনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন (ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন)।

বিধর্মী (অমুসলমান)-দের প্রতি সদয় ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ কোরআন মজীদে রয়েছে।

১) সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে—'লা ইক্রাহা ফিদ্দীন'—ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই। অর্থাৎ কাউকে জোর ক'রে ইসলামে দীক্ষিত করা বা ইসলাম পালন করতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ। যার যার ধর্ম তার স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে।

২) সূরা কাফিরুণে আল্লাহ্ পাক রসূল (দঃ)-কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—কাফিরদিগকে বলুন ঃ 'লাকুম দ্বীনকুম ওয়ালিয়াদ্দীন' অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পালনের ফল আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম পালনের প্রতিফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। বাতিল ধর্মের পুরস্কার বা প্রতিদান সন্তোষজনক হতে পারেনা, তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

৩) সূরা মায়েদার ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে স্মরণ রেখে সত্য সাক্ষ্য দিতে তোমরা অবিচল থাকবে। সুবিচার করতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেনা (অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করবে)।

৪) সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বিধর্মীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার ক'রে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্কে ছেড়ে তারা যাদের উপাসনা করে (বা পূজা করে) তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তা' করলে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘন ক'রে তোমাদের আল্লাহ্র শানে বে-আদবী করবে।'

ঈমান

ঈমান বা বিশ্বাস ইসলামের মূল বুনিয়াদ (ভিত)। অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কাজে প্রকাশ করার সমষ্টিই ঈমান। শুধু মুখে

আল্লাহ্‌কে স্বীকার ক'রে তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন না করলে সে ঈমানদার হতে পারে না।

প্রকৃত ঈমানদার সেই ব্যক্তি যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌, পরকাল, আল্লাহ্‌র ফেরেস্তা, কেতাব ও নবীদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে ধন সম্পদ দান করেন, নামাজ কায়েম করেন, জাকাত প্রদান করেন এবং ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধান মেনে চলেন।

আখেরী নবী

আখেরী নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্ব-মুসলিমদের একমাত্র নেতা। তাঁকে ভালবাসা ও অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

অমুসলমান মনিষীদের দৃষ্টিতে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিবেচনায় সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। আমেরিকার ভার্জিনিয়া ষ্টেটের বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিক মিঃ মাইকেল এইচ হার্ট লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ দি ১০০ (দি হান্ড্রেড) (A ranking of the most influential persons in History) বইতে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সবার শীর্ষে এক নম্বরে স্থান প্রদান করা হয়েছে। যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব ও কনফুসিয়াসের নাম যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ নম্বরে সন্নিবেশিত আছে।

আল্লাহ্‌র রসুল (দঃ) বলেন ঃ (১) সাদা মানুষ কালো মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠ নয় কালো মানুষ হলুদ মানুষের চেয়ে। যিনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, তিনিই শ্রেষ্ঠ (আল্লাহ্‌র নিকট)।

(২) 'তোমার প্রতি যারা আস্থা রাখে, তাদের প্রতারিত করো না, এমনকি প্রতারিত করো না প্রতারকদেরকেও।' অর্থাৎ কাউকেই প্রতারিত করো না।

(৩) মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত, মুখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা অপরের অনিষ্ট হয়না।

(৪) পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি , যার চরিত্র সব চাইতে উত্তম।

(৫) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লইবে এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের সদ্ব্যবহার করিবে।

(৬) যে বিশ্ব-মানবের হিত সাধন করে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

ইসলাম

আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থাই ইসলাম। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি ও আত্মসমর্পণ। ইহলৌকিক ও পরকালীন শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। ইসলাম শুধমাত্র রোজা-নামাজ বা কতিপয় আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়িত করাই মূল উদ্দেশ্য।

ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্ণাড শ বলেছেন ঃ 'It is the only religion which appears to me to possess that asaimilating Capability to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age.'—ইহাই একমাত্র ধর্ম—যা জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম এবং সর্ব-যুগোপযোগী। অধিকন্তু তিনি ভবিষ্যতবাণী ক'রে গেছেন ঃ 'I believe, within hundred years the whole of Europe, Particularly England, will embrace Islam.'—আমি বিশ্বাস করি, এক শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ, বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ড ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করবে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তির ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা দেখে আমার ধারণা, জর্জ বার্ণাড শ'র ভবিষ্যতবাণী একদিন সত্যে পরিণত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান (moral Institution)—সমাজজীবনে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য। তাই রাষ্ট্র পরিচালিত হতে হবে নীতিবান, সৎ ও মহৎ লোকদের দ্বারা—যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভুলেও চিন্তা না ক'রে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ধর্মের অনুসারী না হলে সে কোনদিনও খাঁটি হতে পারে না।

মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কাল্পনিক দর্শন নির্ভুল হতে পারে না। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দর্শন তার প্রমাণ। লেলিন, ষ্ট্যালিনের চিন্তা ও দর্শনকে যাঁরা নির্ভুল বলে বিশ্বাস করতেন, কালক্রমে তাঁরাই তা' নাকচ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামী দর্শন আল্লাহ্ সৃষ্ট বিধানহেতু বিশ্বের বুকে দিন দিন প্রসার লাভ করছে। অন্য ধর্মের লোকেরা কোরআন মজীদে সত্যের সন্ধান পেয়ে দলে দলে ইসলামে সামিল হচ্ছেন দিন দিন।

কোরআন মজীদে সূরা 'আনফাল'-এ(৭১—৭৪) বলা হয়েছে ঃ 'হে ঈমানদারগণ! যারা বিনা কারণে ঘরে বসে থাকে, তারা ঐ সকল ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে না—যারা আল্লাহ্র পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করে। যারা জেহাদ করে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট অনেক উচ্চে। তাদের জন্য আল্লাহ্র রহমতের আবাস—জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার, গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও ক্ষমা অবধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

ধর্মের অনুসারী মানুষ আদর্শের জন্য হাসিমুখে শাহাদৎ বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে ভীত নন, কেননা জিত্লে গাজী, অন্যথায় শহীদ। উভয় ক্ষেত্রেই জান্নাত তার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার।

ধর্ম পালনের গুরুত্ব

ধর্ম মানুষের মনের অন্ধকার দূর ক'রে তাঁকে আঁধার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে। সত্য ও বিভ্রান্তি আলো ও আঁধারের ন্যায় সুস্পষ্ট।

ধর্ম সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অন্তরের গভীর মর্মমূল থেকে উৎসারিত। হৃদয়ানুভূতি এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। অন্ধ ব্যক্তির নিকট যেমন দিন ও রাত একই বরাবর, ঠিক তেমনি ধর্মান্ধ ব্যক্তির নিকট ধর্ম ও অধর্ম। তার কাছে এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বা সীমারেখা নেই। ধর্ম তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় ন্যায় অন্যায় কাজ তাদের মর্জিনির্ভর। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোয়াক্কা না ক'রে মন যা চায়, তাই তারা করতে পারে। অন্যায় করতে তারা পরোয়া করে না।

ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ বা অবিশ্বাস অন্তরে কুবিশ্বাস বা ভ্রান্তবিশ্বাসের জন্ম দেয়। দ্বীনের জ্যোতি তাদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারে না। আঁধার-হৃদয়ে সত্য প্রতিভাত হতে পারে না। মানুষ অন্ধকারকে ভয় করে, কেননা অন্ধকারে সত্য উপলব্ধি করা যায় না। মিথ্যা ভয় মনের গহণে জাগ্রত হয়। মনকে দুর্বল ক'রে তোলে। মনের দুর্বলতাহেতু যে-কোন বিপদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অনুরূপ নাস্তিকদের মন। অবিশ্বাসের কারণে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মে না। তাদের মন থাকে সতত দুর্বল। সত্যের মুখোমুখী হতে তারা ভয় পায়। অন্যায়ের স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহে তারা গা ভাসিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গৃহপালিত পশু গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল তাদের মনিবের প্রতি আস্থাশীল, তাই তারা ঘরে বাইরে সর্বত্র নিশ্চিন্ত মনে থাকে, কিন্তু বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর কোন মনিব বা মালিক না থাকায় তারা মানুষের ভয়ে বনে জঙ্গলে লুকায়ে থাকে। এদের শারীরিক শক্তি যত বেশীই হোক না কেন, মন থাকে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই দিনের আলোতে নিশ্চিন্তে স্বাধীনভাবে চলতে তারা সাহস করে না। একইরূপ স্রষ্টার প্রতি আস্থাহীন মানুষের অবস্থা।

আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস আমার মনের জোর শতগুণে বর্দ্ধিত করে। মনের জোর বৃদ্ধির ফলে দেহের শক্তিও বেড়ে যায়।'

উপসংহার

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বের বুকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনন্য বিধান। অসম ধন বন্টনের কারণে কোন কোন দেশে এক শ্রেণীর লোক ক্ষমতা কুক্ষীগত ক'রে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, অপর দিকে বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণী তাদের শোষণের যাঁতাকলে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। একমাত্র ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পারে এটা রোধ করতে। ইসলামের বিধানে ধনীদের ধনসম্পদে অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্বদের হিস্যা রয়েছে। জাকাত, ফেৎরা, দান, সাদকা, ওসর, কোরবাণী তার প্রমাণ।

বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ অর্থনীতি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের সাহায্য ব্যতীত তাদের অর্থনীতি অচল। এক নায়কত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। গণতন্ত্র বিশ্ব দখল করে বসেছে। শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক বিধান ইসলামে নিহিত—এটা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। গণতন্ত্রের পথে ইসলামের বিজয় অনিবার্য

পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়, তা' বিলম্বে হলেও পাশ্চাত্য জগত উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তদ্‌হেতু ইসলামকে জানার আগ্রহ তাদের মধ্যে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র কোরআনিক নীতি দ্বারাই সম্ভব। একথা আজ বিশ্বের অনেক দেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বৃহত্তম কম্যুনিষ্ট দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আর সে-সব রাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ইসলামের পুনর্জাগরণ।

বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনের শিক্ষা—আল্লাহ্‌র নির্দেশ। একদিন বিশ্বের নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। তখন ইসলামের আদর্শ, ন্যায়নীতি, উদারতা ও শৌর্যবীর্যকে বিশ্বজনমত শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতো। আজ মুসলিম জাতি ধর্ম, ন্যায়নীতি ও ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ায় তারা সর্বত্র লান্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হচ্ছে। তাদের উপর চলছে অমানবিক নির্যাতন।

বিশ্বের শতাধিক কোটি মুসলমান দ্বীন ইসলামের মজবুত রজ্জুকে একতা-বদ্ধভাবে ধারণ করলে আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের হারানো সুদিন আবার ফিরে আস্‌বে। বিশ্ববাসী হানাহানি ও সংঘাত ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। দুনিয়ার বুকে নেমে আস্‌বে অনাবিল সুখশান্তি।

বিশ্ব-মুসলিম সংস্থা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ণ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তা' রোধ করতে হলে একটি শক্তিশালী বিশ্ব-মুস্‌লিম সংস্থা—'ইত্তেহাদুল মুস্‌লেমীন' (বা যে কোন নামে) গঠন করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমাজের বিশ্ব-নেতৃবর্গ বিষয়টি বাস্তবায়নে শীঘ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হর কারবালাকে বাদ'। মুসলমানদের উপর দিয়ে বহু কারবালার ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে—বিশ্বের দিকে দিকেঃ বসনিয়া, হার্জেগোভেনিয়া, আল্‌জিরিয়া, ভারত, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, ফিলিস্তীন, লেবানন, ইরাক, ঈজিপ্ট, আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে। এখনও কি মুসলমানদের জাগ্রত হবার সময় আসেনি?

আমেরিকায় বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী

১৯৯০ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট হতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ১১,৮৩৮ জন। বর্তমানে এক লক্ষে পৌঁছেছে বলে অনেকের ধারণা। বাঙ্গালী বলতে পশ্চিম বাংলার (ভারতের) বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের অধিবাসী বাংলাদেশী উভয়ই একত্রে ধরা আছে। বাংলাদেশীদের সংখ্যা অনুমান অর্ধেক হবে।

বিদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলা লোক পেলেই তাকে প্রাণের ভাইরূপে গণ্য করা হয়। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বাংলাদেশী, কে পশ্চিম বাংলার এ নিয়ে কোন বিভেদ টানা হয় না। সবাই যেন সহোদর ভাই। বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত দহরম মরম ও আন্তরিকতা দেখেছি। তাদের মিল মহব্বত প্রশংসনীয়। কৃষ্টি কালচারে প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আন্তরিক মমত্ববোধের অভাব নেই।

নিউইয়র্ক শহরে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী বাস করেন। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের বাবহারে ও আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকলেও শনি, রবি দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে নিকটের আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করেন। প্রত্যেক বাড়ীতে টেলিফোন থাকায় অধিকাংশক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে একে অপরের খবর নিয়ে থাকেন।

নিউইয়র্ক সিটি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত বাংলাদেশীগণ বিদেশে প্রবাসজীবন যাপন করলেও বাংলাদেশের খবর তাদের নখদর্পনে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশে দুর্যোগ দেখা দিলে দুর্দ্দশাগ্রস্থ দেশবাসীকে সাহায্য পাঠাবার জন্য তারা প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে থাকেন। তাদের অনেক সংস্থা দুর্গত মানবতার সাহায্যার্থে অনেকের নিকট ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ ক'রে দেশে পাঠায় অথবা বাংলাদেশ দূতাবাসে জমা দেয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য ফ্লোরিডায় বাংলাদেশীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কয়েক জন ভারতীয় ও পাকিস্তানী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে দ্রুত রিলিফ পৌঁছানোর সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকারকে দু'খানা হেলিকপ্টার কিনে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সফলকাম হয়েছেন কিনা জানিনা। সভাটিতে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটায় বিষয়টি জেনেছিলাম। উক্ত সভায় জনৈক ব্যক্তি কিছু অর্থ ও রিলিফ সামগ্রী পাঠাবার প্রস্তাব করলে, একজন বাংলাদেশের আমলাদের দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কথা

বলে প্রতিবাদ করেন। নিজের দেশের কর্মচারীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনে আমি চুপ থাকতে পারিনা ; প্রতিবাদ জানিয়ে বলি—সবাই একরূপ নন। ভাল অফিসারও আছেন।

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীগণ নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন। এ-কারণে বিদেশে তাদের সুনাম রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাদের অবদান প্রশংসনীয়। একমাত্র নিউইয়র্ক সিটি হ'তে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে বাংলাদেশের অনেক খবর থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, বিদেশে থেকে কি ক'রে তারা এত খবর সংগ্রহ করেন। কোন এক সাপ্তাহিক পত্রিকার শীর্ষদেশে লেখা পড়েছিলাম, 'আমরা আছি পরবাসে, আমাদের হৃদয় জুড়ে বাংলাদেশ।' স্বদেশপ্রীতি তাদের মধ্যে কতটা জাগ্রত তা' দু'ছত্র লেখা থেকেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের যোগাযোগের সুবিধার্থে নিউইয়র্কের কয়েকটি বাংলা পত্রিকার ঠিকানা উল্লেখ করছি ঃ

১। সাপ্তাহিক ঠিকানা, সম্পাদক এম, এম, শাহীন
১১—৩৫, ৪৫ এভিনিউ এল, আই, সি,
নিউইয়র্ক—১১১০১, ইউ, এস, এ,।

২। সাপ্তাহিক প্রবাসী, সম্পাদক— সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্
১১৩৩ ব্রডওয়ে, সুইট ৬০৫
নিউইয়র্ক—১০০১০, ইউ, এস, এ, (টেলি ঃ (২১২) ২৪২-৯৭২২)

৩। সাপ্তাহিক বাঙ্গালী,
১১৭০ ব্রডওয়ে, সুইট ৪১৪,
নিউইয়র্ক—১০০০১, ইউ, এস, এ, (ফোন ঃ (২১২) ৬৮৯-৩৩৪৪, ২১৩-৪৫৪৬)

সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' সূত্রে জানা যায়—'ভয়েস অব বাংলাদেশ' নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে পেন্টা কমিউনিকেশন ইন্‌ক, ব্রডওয়ে, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক থেকে। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবারে পত্রিকাটি বের হবার কথা।

বিদেশের অনেক দৈনিক পত্রিকা শতাধিক পৃষ্ঠার হ'য়ে থাকে। অবশ্য তার অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে ভরা থাকে। প্রতিটি পত্রিকার বহুল সার্কুলেশন রয়েছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' একটি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা স্যাটেলাইট প্রিন্টের (Sattelite print) সাহায্যে আমেরিকার ৩১টি অঙ্গরাজ্য হতে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে একমাত্র 'দৈনিক জনকন্ঠ' পত্রিকা একই সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বগুড়া হতে স্যাটেলাইট প্রিন্টে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ঢাকা হ'তে প্রকাশিত সৈয়দ জাফর সম্পাদিত দৈনিক 'দিনকাল' পত্রিকাটি আমেরিকায় পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিউইয়র্কে আগমন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিরাট তোড়জোড় নিউইয়র্কে দেখে এসেছি। জনাব ফারুখ বখ্‌ত চৌধুরীকে সমন্বয়কারী ক'রে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। তাঁর নিউইয়র্ক সফরের পূর্বেই আমাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় জন্য সম্বর্দ্ধনা সভা দেখে আসার সৌভাগ্য হয়নি। বাংলাদেশে যত-জন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয়। অনেকের মুখে তাঁর প্রশংসার কথা শুনেছি।

আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশীদের অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। শিক্ষা, কৃষ্টি ও সমাজসেবামূলক কাজে সংস্থাগুলো অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। কতিপয় সংস্থার কথা বলছি ঃ

১। ১৯৯১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ার ডাঃ জিয়া উদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক সাধারণ সভায় 'বাংলাদেশ ভলেন্টারী এসোসিয়েশন অব ইউ, এস, এ,' গঠিত হয়। কার্যকরী কমিটিতে আছেন ঃ সভাপতি—ডাঃ হাবিব সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি ঃ কাজী মতিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক—আবু তাহের মিয়া, সহঃ সাঃ সম্পাদক শেখ মোঃ খোরশেদ, প্রচার সম্পাদক—এনায়েতুল মনছুর, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ জহিরুল আলম (ডলার), ক্রীড়া সম্পাদক—মোঃ নাছিম, দপ্তর সম্পাদক ঃ মোঃ হেলাল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ—নূরুল কবির শিকদার। সদস্য ঃ ডাঃ জিয়া উদ্দিন আহম্মদ ও জাহানারা শরফুদ্দিন। (সাপ্তাহিক ঠিকানা, ৪-১০-৯১)।

২। বাংলাদেশ ইসলামী সংঘ, টরেন্টো ঃ সংস্থাটি মুসলিম ছেলে-মেয়েদের ইসলামী চরিত্র গঠনকল্পে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। এই সংঘের উদ্যোগে (সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯১) জনাব সওকত আলীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শোনায়। বক্তব্য রাখেন ঃ (১) জনাব আবদুল্লাহ্ হাকিম (বিষয় ঃ কোরআন কি ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য, না হেদায়েতের জন্য?), (২) ব্রাসিলি মসজিদের ইমাম জনাব মওলানা আবদুর রাজ্জাক (বিষয় ঃ অনৈসলামী সমাজে সন্তান লালন পালন ও শিক্ষাদানে মাতাপিতার দায়িত্ব), (৩) সংঘের সভাপতি জনাব মোঃ শমশের আলী (হেলাল) উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

৩। ইসলামী সেন্টার অব নর্থ আমেরিকা (ACNA), নিউইয়র্ক-এর সভাপতি জনাব আশরাফুজ্জামান খান। সংস্থাটির ঠিকানা ঃ
১৬৬—২৬, ৮৯ এ্যাভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ইউ, এস, এ,। সংস্থাটির বিভিন্ন স্থানে ৭০টি শাখা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইসলামের আদর্শ প্রচারই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য।

৪। ইসলামিক কমিউনিটি অব ব্রিয়ান, পোঃ বক্স নং ৬৩৫, কলেজ ষ্টেশন, টেক্সাস—৭৭৮৪০, ইউ, এস, এ, (টেলিফোন নম্বর (৪০৯) ৬৯৩—৮১৪৫। সংস্থাটির সভাপতি ঃ ডক্টর জিল্লুর রহীম। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারকল্পে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও রিলিজিয়াস ক্লাশের ব্যবস্থা করা প্রধান কর্মসূচী।

৫। আমেরিকান মুসলিম এসোসিয়েশন অব ওকলাহোমা, আইএনসি,
৩২০১ এন, ডব্লিউ, ৪৮ ষ্ট্রিট, ওকলাহোমা সিটি,
ওকলাহোমা—৭৩১১২, ইউ, এস, এ,। টেলিফোন ঃ (৪০৫) ৯৪৮—৬১৮৮
সংস্থাটির সভাপতি ঃ ডাঃ মোঃ শাকির, এম, ডি,
ফোন ঃ (৪০৫) ৮৪২—৭৮৭৭।
সম্পাদক ঃ জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ
ফোন ঃ (৪০৫) ৭৯৯-৫৬১৭

ইসলামী আদর্শ প্রচারই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লস এ্যাঞ্জেলস, মিসিগান, নিউজার্সি ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষা ও তমুদ্দন প্রচারের কাজে তৎপর আছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনুরূপ বহু সংস্থা রয়েছে।

আমেরিকায় বর্ণবাদ দাঙ্গা হাঙ্গামা

বিশ্বগণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অভিভাবক সভ্যতাগর্বী আমেরিকা মানবতাবাদের মূলনীতি 'মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ' থেকে এখনও দূরে অবস্থান করছে। সাদাকালোর প্রভেদ আজও দূর হয়নি। আমেরিকার শ্রমিকসমস্যা সমাধানের জন্য এককালে তারা আফ্রিকা হ'তে আমদানী করেছিল কালো আদমীদের। তাদের মাথার ঘাম পায়েফেলা পরিশ্রমের ফলেই আজ তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য দেশ। তাদের কৃষি খামারে, কলকারখানায় এখনও কলুর বলদের ন্যায় খেটে চলেছে অগণিত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক। অথচ তাদের প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কেন? সাদাকালো পারে না একত্রে চলতে, উঠতে, বসতে, এক রেষ্টুরেন্টে চা পান করতে, এক হোটেলে খেতে। কালো ছেলেমেয়েরা সাদাদের স্কুলে যেতে পারে না।

বিশ্বের এককালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে একদিন সাদা আদমীদের রেষ্টুরেন্টে চা পান করতে গিয়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। তাঁর

আত্মজীবনীতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। এরূপ বহু ঘটনা আছে। সাম্প্রতিককালে সাদা চামড়ার আমেরিকানগণ কালোদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রমাণ কোথায়? এখনও 'যথা পূর্বং তথা পরং' মনোভাবই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাগুজে আইনে উদারতার কথা লিখে রেখে বাস্তবে উদারতা না দেখালে তার নাম উদারতা নয়, কপটতা।

সাম্প্রতিককালে বর্ণবাদ সংক্রান্ত একটি ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করেছে। আমেরিকানদের সভ্যতার মুখোশ বিশ্ববাসীর নিকট উন্মোচিত হ'য়ে পড়েছে। পত্রিকাসূত্রে জানা যায়, ১৯৯২ সালের বর্ণ দাঙ্গায় ৫৮ জন নিহত এবং প্রায় আড়াই হাজার লোক আহত হয়। কয়েক শ' কোটি ডলারের সম্পত্তি ধ্বংস হয়।

ঘটনাটি ঃ লস এঞ্জেলস শহরে চারজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ রাতের অন্ধকারে ২৬ বৎসর বয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গ মটরচালক রডনি কিং-কে অমানবিক নির্যাতন করে। দৃশ্যটি দূর থেকে ভিডিও টেপে রেকর্ড করা হয়। বেদম প্রহারের দৃশ্যটি টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শিত হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৯৯১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে। প্রহারকারী চারজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। কিন্তু বর্ণবাদীসমাজে বিচারের নামে চলে এক নিষ্ঠুর প্রহসন। বিচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার বাইরে শ্বেতাঙ্গঅধ্যুষিত এলাকা ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্টুরা কাউন্টিতে। জুরীদের বাছাই করা হয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় হতে। বিচারে চারজন পুলিশকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

এই অবিচারের প্রতিবাদে এবং টরেন্টোর পুলিশের হাতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হওয়ার প্রতিবাদে টরেন্টো শহরে কৃষ্ণাঙ্গদের আহুত এক বিক্ষোভ মিছিলের উপর শ্বেতাঙ্গরা হামলা চালালে মিছিলটি সহিংসরূপ পরিগ্রহ করে। বিক্ষোভকারীরা দোকানপাটের দরজা জানালা ভাংচুর ও লুটতরাজ করে। উভয় সম্প্রদায়ের লোক লুটপাটে অংশ গ্রহণ করে বলে জানা যায়। শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। দাঙ্গার মূলকেন্দ্র ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস এঞ্জেলস। ক্রমে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ও বিভিন্ন শহরে। সানফ্রানসিসকো, আটলান্টা, লাসভেগাস ও সিটলসহ বিভিন্ন শহর বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক ঘটনার শহরে পরিণত হয়। চলে বেপরোয়া অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ। লস এঞ্জেলসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তথায় নিয়োজিত পুলিশ ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে সহায়তার জন্য পাঠানো হয় সাড়ে চার হাজার সৈন্য ও নৌসেনা এবং এক হাজার আইন প্রয়োগকারী অফিসার। বহু জানমালের ক্ষতির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ 'আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক বিচার ও নিরাপত্তা নেই। ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছে একটি পক্ষপাতমূলক রায়ের ফলে। আমরা সবাই দেখেছি, প্রহারের দৃশ্যটি খুবই অসহনীয়।' লিবিয়ার বেতারভাষ্যে বলা হয় ঃ আমেরিকার সমাজ

ব্যবস্থার মধ্যে কত যে অবিচার বিরাজমান এটাই তার প্রমাণ। ইন্দোনেশিয়ার শীর্ষস্থানীয় আইনপ্রণেতা মারজুকী দারসমান বলেছেন, 'মানবাধিকার সমস্যা যে কেবল তৃতীয় বিশ্বের একক সমস্যা নয়, এই দাঙ্গাই তার প্রমাণ। আমরা পরের ধনে পোদ্দারী করনেওয়ালাদের নিজ ঘরের দিকে নজর দেবার আহ্বান জানাই।' বৃটেনের 'ডেইলী মেইল' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে: খোদ আমেরিকা আজ বিচারের কাঠগড়ায়। কারণ এর বিচারব্যবস্থাই হচ্ছে পক্ষপাতদুষ্ট।' (পত্রিকাসূত্রে)।

কৃষ্ণাঙ্গগণ কেন অপরাধপ্রবণ?

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ দুষ্কৃতিকারীদের অপকর্মে জনগণ অতিষ্ঠ। কিন্তু কি কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের মনে অপরাধ প্রবণতা জন্মলাভ করে, কেন তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও খুনখারাবীতে লিপ্ত হয়, এ-সবের মূল কারণ কি, তা' সঠিকভাবে তলিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যাবে, তারা জাতঅপরাধী নয়। তাদের মধ্যেও যে মানবতাবোধ আছে, তারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের পরিবেশ, পরিস্থিতি, তাদের প্রতি জুলুম, অবিচার, নিপীড়ন তাদের অনেককেই বাধ্য করে দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে।

কৃষ্ণাঙ্গ হলেই সে খারাপ হবে, এমন কথা বলা যায়না। তাদের মধ্যে অনেক ভাল মানুষ আছেন, অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ডক্টরেট ও ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের আছেন। সমাজ তাদের জন্য গর্বিত। সুযোগ পেলে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্য হতে একদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও আছেন। কিন্তু তাঁদের সামনে তেমন সুযোগ নাই। কেননা অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ অল্প শিক্ষিত, বেকার, দরিদ্র ও বঞ্চনার শিকার। তারা বাস করে অত্যন্ত অবহেলিত পশ্চাৎপদ এলাকায়। নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক প্রবাসী পত্রিকায় (১৬/৮/৯১) জনাব নাঈম মোহায়মেন লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গরা সবচেয়ে গরীব। তাদের আবাসস্থল শহরের গরীব এলাকাগুলোতে। উচ্চ আয়ের পেশায় তাদের স্থান সবচেয়ে কম। তাদের মধ্যে পড়াশোনার হার খুবই কম। গত দশকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অংকে পি-এইচ, ডি, প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়।

অনেকেই বলেন, তাদের পড়াশোনা করতে কে নিষেধ করেছে? তাদের জন্য ত' নানা রকম স্কলারশিপ আছে, রিজার্ভ করা আসন আছে। কেন আমেরিকান স্কুলে ভারতীয়েরা এত ভাল করছে? অথচ কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে পাশের হার সবচেয়ে কম। সুযোগ ত' কিছু কম নয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আলোচনার খাতিরে একথা মানলাম যে, সুযোগ তাদের জন্য হয়তোবা সমান। কিন্তু তাদের পরিবেশটা তুলনা করি আমাদের পরিবেশের সাথে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের মা, বাবা পিটিয়ে হোক, আদর ক'রে হোক পড়াশোনার তাগাদা দেন। ..... আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী গেলে কম বয়সীদের

প্রশ্ন করা হয়—রেজাল্ট কেমন হল এবার? ..... মোট কথা, ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাথায় ঢোকানো হয় যে, পড়শোনা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ..... এর সঙ্গে তুলনা করুন, একটি কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানের পরিবেশ। তার বাবা হয়তো পুলিশের গুলিতে নিহত। মা হয়তো আট মাস অন্তঃসত্তা—সে সন্তানের বাবা হয়তো অপরিচিত কেউ। বড়ভাই হয়তো কারাগারে। চারদিকে বন্ধু-বান্ধব সবাই চুরি, ডাকাতি ক'রে বেড়াচ্ছে। ..... তাদের পাড়ার হিরো সেই যুবক, যার পায়ে চকচকে নতুন স্নীপার,—কারণ সেটি প্রমাণ করে যে, মাদকদ্রব্য বিক্রী ক'রে সে ভাল পয়সা কামাচ্ছে, সুতরাং পাড়ার মাস্তান সে-ই। পড়াশোনার তাগাদা তো দূরের কথা, সন্তানের প্রতি কৃষ্ণাঙ্গ মাতার সবচেয়ে বড় উপদেশ—'পুলিশের সামনে পড়োনা।'

সবকিছুর উপর আছে—মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি,-যা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে।

হ্যাভার্ড, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র এখন পড়ছে; কিন্তু একটু খোঁজ নিলে দেখা যায়, এরা এসেছে অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবার থেকে,—তাদের বাবা-মা কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী। আরও দেখা যায়, সকল কৃষ্ণাঙ্গ বাবা-মা সবার আগে যেটা করে, তা' হল পুরানো পাড়া থেকে সরে গিয়ে তারা ধনী পাড়ায় ওঠে। কারণ তারা চায় ছেলেমেয়ে মানুষ করার সুষ্ঠু পরিবেশ। ...

আমার কলেজে যেসব কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র আছে, তারা ক্যাম্পাসে বড়নেতা, নানা সংগঠনের শীর্ষে, নানা রকম পুরস্কার পায় এবং সবাই পাশ ক'রে মাস্টার্স, পি-এইচ, ডি, করতে নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে অথবা বড় বড় চাকুরী করছে। এরদ্বারা তারা প্রমাণ করেছে যে, চুরিচামারী কৃষ্ণাঙ্গদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য নয়। কালো মানুষ আদপে খারাপ-একথা মোটেই সত্য নয়।

তা' হলে প্রশ্ন উঠে, পরিবেশ এত খারাপ হল কিভাবে? কেন তারা অপরাধপ্রবণ? এর জবাব হচ্ছে—শ্বেতাঙ্গ জাতির অত্যাচার। সেই অত্যাচারের ইতিহাস ভয়ংকর। কিছুদিন আগে আমার কলেজের এক ভারতীয় ছেলের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সে বললো—'বোম্বে থেকে পয়সা-কড়ি ছাড়া লোকজন আমেরিকায় আসছে। এসে বড়লোক হ'য়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণাঙ্গরা এখানে থেকেও তা' পারেনা কেন?

তাকে বলেছিলাম, দুটি অবস্থা কোনমতেই এক নয়। ভারতীয় ছেলেটি আমেরিকায় আসে এয়ার ইণ্ডিয়ার ইকোনমি ক্লাশ টিকিটে। তার মাথায় থাকে বড়লোক হবার স্বপ্ন। তাই তার কাজ করার উদ্যম আর উৎসাহ থাকে। আর কৃষ্ণাঙ্গরা যখন এসেছে 'স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়' তখন তাদের হাতেপায়ে শিকল—দাসআনার জাহাজে তারা বন্দী। যারা এদেশে এসেছে দাসদাসী হিসেবে, তাদের বংশধরদের কিসের জন্য থাকবে উৎসাহ, কোথা থেকে আসবে স্বপ্ন?

অনেকে হয়তো বলবেন, সেগুলো তো পুরানো ইতিহাস,—এখন তারা মুক্ত। এ-টি হল আমেরিকার সবচেয়ে নিষ্ঠুর মরীচিকা। আসলে তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি এখনো আসেনি। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দু'শ' বছর আগে দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ করেছেন; কিন্তু একবার দেখুন, আইন বদলালেও মানুষের অত্যাচার কতটা বদলেছে? বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত আইন অনুসারে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে এক টেবিলে বস্‌তে পারতোনা, একই খাথরুমে যেতে পারতো না, একই বেসিনে হাতধুতে পারতোনা, একই স্কুলে পড়তে পারতো না। .....মাত্র ত্রিশ বছর আগেও আমেরিকায় এ-আইন বহাল ছিল।

একটি ঘটনা ঃ একদিন এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে বাস থেকে নেমে যেতে বলা হলো। সে রুখে দাঁড়ালো; সে বললো, আমি অনেক নেমেছি, আজ নামবোনা। সেই থেকে শুরু হল—'সিভিল রাইটস, সংগ্রাম।.....আমেরিকা স্বেচ্ছায় সব দিয়ে দেয়নি। কৃষ্ণাঙ্গদের আদায় ক'রে নিতে হয়েছে। প্রতিদিন খবরে দেখা যেতো—পুলিশ কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনকারীদের পিটিয়ে আধমরা ক'রে দিচ্ছে, হিংস্র পুলিশ 'কুকুর খা' বলে তাদের মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে,—তখন সরকার বাধ্য হ'য়ে পদক্ষেপ নিয়েছে—কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইনগুলো তুলে নিতে। তবুও অত্যাচার কম হয়নি। দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে এমনকি স্কুল বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে—যাতে কৃষ্ণাঙ্গরা স্কুলে যেতে না পারে। এক শ্বেতাঙ্গ পিতা আবেদন করেন—সব স্কুল-কলেজ বন্ধ ক'রে দাও। না হোক দেশে পড়াশোনা। তবু আমার ছেলে একটা কালো ছেলের সঙ্গে এক ক্লাশে বস্‌বে না।

আজও কি কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার কমেছে? মাত্র তিন চার মাস আগেও লস এঞ্জেলসের পুলিশ রডনি কিং নামের এক নির্দোষ কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে গাড়ী থেকে নামিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে। দূর থেকে একজন ভিডিও ক্যামেরায় তার ছবি তুলেছিল বলেই পত্রিকায় হৈ চৈ উঠে। কিন্তু এরূপ ঘটনা আরো যে কত ঘটে, তা' জানা যায় না।

নিউইয়র্কের হাওয়ার্ড বীচে একদল শ্বেতাঙ্গ ছেলে একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেকে ধাওয়া ক'রে মেরে ফেলে। নিউইয়র্কের বেনসনহার্স্টে ভুলক্রমে ঢোকা এক কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। প্রাক্তন 'কু ক্লাক্স ক্ল্যান' (উগ্র শ্বেতাঙ্গ দল, যারা ষাট দশকে কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যা করতো) এর সদস্য ডেভিড ডিউক এবং বর্ণবিদ্বেষী হেল্‌মস্ অবাধে আমেরিকার নির্বাচনে দাঁড়ায়। হেল্‌মস্ জিতে গেছে; ডিউক জিতেনি অল্পের জন্য।

দাসত্বপ্রথা বহু আগে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের অত্যাচার থামেনি। তাই কৃষ্ণাঙ্গরা আশাহত। তারা সাফল্যের চেষ্টা না ক'রে অনেকেই চুরি, ডাকাতী, মাদকদ্রব্য চালান ইত্যাদি কুকর্মের পথ

ধরেছে। এসব শুধুই যে বর্ণবিদ্বেষের কারণে ঘটে তা' নয়,—তবে বর্ণবিদ্বেষের ভূমিকা নগণ্য নয়। .....

কৃষ্ণাঙ্গদের অত্যাচারে নিউইয়র্কবাসীরা অতিষ্ঠ—এটা খুব দুঃখের কথা। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে কথা বলে দেখুন, তাদের প্রশ্ন করুন—সাদা মানুষের বিরুদ্ধে তাদের এত রাগ কেন? প্রশ্ন করুন—কেন তারা এত পিছিয়ে আছে? কেন তারা কিছু করতে পারছে না? কিসের ভারে তারা নুইয়ে আছে? সঠিক জবাব পাবেন।

যদি আমাকে কেউ বলে—'বাংলাদেশীরা জাতে অপদার্থ' অথবা 'বাংলাদেশীদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না'। আমি বলবো, ব্রিটিশরা আমাদের কি ক'রে দিয়ে গেছে তা' একবার ভাবুন। প্রথম বিশ্ব আজও আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ঠিক তেমনি কৃষ্ণাঙ্গদের সম্বন্ধে অভিযোগ করার আগে তাদের ইতিহাস ও পরিবেশ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করুন। অপরাধী অপরাধের জন্য অবশ্যই দায়ী, তবে সমাজের অবস্থান কিভাবে তাকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয় তাও জানা প্রয়োজন। সমাজের রোগ দূর করতে না পারলে সুস্থ সমাজ কোনদিনও আশা করা যায় না।' (সংক্ষেপিত)। *

---

* ('নিউজ উইকলি' প্রবাসী, নিউইয়র্ক—১৬-৮-১৯৯১)।

আমেরিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে দু'টি মহাদেশ অবস্থিত। একটি উত্তর আমেরিকা, অপরটি দক্ষিণ আমেরিকা। আমেরিকা উভয় মহাদেশের সাধারণ নাম হলেও প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা বলতে ইউ, এস, এ, বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকেই বুঝায়। এটি উত্তর আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত। আমেরিকা ৫০টি অঙ্গরাজ্যের একত্রিভূত রাষ্ট্র (Federation) হিসেবে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র' নামে অভিহিত।

উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় যেসকল দেশ অবস্থিত তার তালিকা রাজধানীর নামসহ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ (অক্ষর ক্রমিক)	রাজধানী
১। ইউ, এস, এ, (যুক্তরাষ্ট্র)	ওয়াশিংটন ডিসি
২। আল্ সালভেডের	স্যান সালভেডর
৩। এন্টিগুয়া	এন্ডস
৪। ক্যানাডা	অটোয়া
৫। কিউবা	হ্যাভানা
৬। কোস্টারিকা	সানজোসে
৭। গ্রীণল্যাণ্ড	গড্থাব
৮। গুয়েতেমালা	গুয়েতেমালা সিটি
৯। গোয়াডেলুপ দ্বীপপুঞ্জ	পয়েন্ট অ'পিটার
১০। জামাইকা	কিংস্টন
১১। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	সেন্টো ডোমিনগো
১২। ত্রিনিদাদ	পোর্ট অব স্পেন
১৩। নিকরাগুয়া	ম্যানাগুয়া
১৪। নেদারল্যাণ্ড এ্যান্টিলিস	উইলেমষ্ট্যাড্
১৫। পানামা	পানামা সিটি
১৬। পের্টোরিকো	স্যান হুয়ান
১৭। বাহামা দ্বীপপুঞ্জ	নাসাউ
১৮। বারগুদা	সেন্টজন্স
১৯। বারবাডোস	ব্রীজ টাউন
২০। বারমুডা	হ্যামিলটন
২১। বেলাইজ	বেলমোপান
২২। বৃটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ	রোডটাউন

২৩। বৃটিশ হন্ডুরাস	তেগু সিগাল্‌পা
২৪। মার্টিনিক দ্বীপ	ফোর্ট দ্যা ফ্রান্স
২৫। মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি
২৬। হাইতি	পোর্ট অ'প্রিন্স
২৭। হন্ডুরাস	ম্যানাগুয়া

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ ঃ	রাজধানী
১। আর্জেন্টিনা	বুয়েনস আয়ারস
২। ইকুয়েডর	কুইটো
৩। উরুগুয়ে	মন্টি ভিডিও
৪। কলোম্বিয়া	বোগোতা
৫। গায়েনা	জর্জ টাউন
৬। চিলি	সান্টিয়াগো
৭। প্যারাগুয়ে	অ্যাসুন সিয়ন
৮। পেরু	লিমা
৯। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ	পোর্ট স্ট্যান্‌লি
১০। ফ্রেন্স গায়ানা	কায়েন
১১। ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া
১২। বোলিভিয়া	লাপাজ ও সুক্রে
১৩। ভেনজুয়েলা	কারাকাস
১৪। সুরিনাম	প্যারামারিথো *

পানামা যোজক উভয় আমেরিকা মহাদেশকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিল। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পানামা খাল খননের ফলে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। সুগভীর পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল ও প্রশস্থ ৫০০ ফুট। উভয় মহাদেশের পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। উভয় মহাসাগরের জল-সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য খালটি খনিত হয়।

আমেরিকা আবিষ্কার

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর রাত্রি দুই ঘটিকায় ইটালিয়ান নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস সর্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইটালীর জেনোয়া প্রদেশে ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে বার্থমিলো ডিয়াজ ভাইপার কলম্বাস এক গরীব তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে পরলোকগমন করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

---

* দি ওয়ার্ল্ড এল্‌ম্যানাক, ১৯৮৫।

১৪৯২ সালের ৩রা আগষ্ট স্পেনের রাজা ফার্দিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সাহায্য, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ নিয়ে অজস্র ধনরত্নভরা স্বপ্নপুরী ভারতবর্ষ আবিষ্কারের আশায় তিনি তিনখানা পালের জাহাজ—শান্তামেরিয়া, নীনা ও পিন্টা নিয়ে এক শ' বিশজন নাবিকসহ সমুদ্রযাত্রা করেন। ১২ই অক্টোবর রাত্রি ২ ঘটিকায় তিনি পেঁৗছেন এক নতুন দেশে (আমেরিকায়); কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল—এটাই তাঁর কাঙ্খিত দেশ—ভারতবর্ষ। তাই তিনি দেশটির নাম দেন 'ইস্ট ইণ্ডিস' এবং অধিবাসীদের 'রেড ইণ্ডিয়ানস' বলে অভিহিত করেন, কেননা তাদের চেহারা ছিল রক্তিম বর্ণের। প্রকৃতপক্ষে নতুন দেশটি ছিল আমেরিকা-যা পরবর্তীকালে ইটালীর ফ্লোরেন্সের নাবিক আমেরিগো ভেসপুসি কর্তৃক ১৪৯৭ সালের ১৬ই জুন আবিষ্কারের দাবী করা হয়। তিনি বিশ্ব আবিষ্কারের নেশায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলপথে পরিভ্রমণ করেন। পশ্চিম গোলার্ধের এই বিশাল স্থলভাগকে তাঁর নাম অনুসারে ল্যাটিন ভাষায় নামকরণ করেন 'আমেরিকাস'—যা পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষায় 'আমেরিকায়' রূপান্তরিত হয়।

প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে কলম্বাসই আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারক হিসেবে সম্মানীত। আমেরিকায় প্রতি বৎসর ১২ই অক্টোবরে বিশেষ জাঁক-জমকের সঙ্গে 'কলম্বাস দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি তাঁদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানীত। সাত দিন যাবৎ কলম্বাস দিবসের উৎসব চলে। উদ্বোধনী দিবসের ভোরে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয় থেকে হাডসন নদী পাড়ি দেয় শত শত পালতোলা জাহাজ ও জলযান। কলম্বাসের ব্যবহৃত নিনা, পিন্টা ও শান্তামেরিয়া জাহাজের প্রতিকৃতি দর্শনীয় বস্তু হিসেবে প্রোতাশ্রয়ে নোঙ্গর ক'রে রাখা থাকে। ১৯৯২ সালের উৎসবে ২৬৫ খানা পালবাহী জাহাজ ও নৌযান অনুষ্ঠানটিতে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। কয়েক শত ক্যাডেট ও নাবিককে রাজকীয় ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব-পরিচিতির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বিশ্বকে জানার আকাঙ্খা মানুষের অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অচেনাকে চেনার ও বিশ্বরহস্য জানার নেশা মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

জনবসতি ঃ কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারকালে আমেরিকা ছিল জঙ্গলাবৃত এক আঁধারঘেরা দেশ। অধিবাসীগণ ছিল অসভ্য জংলী। কিন্তু এই নব আবিষ্কৃত দেশের অফুরন্ত সম্পদের খবর জেনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি এখানে আগমন করে এবং জঙ্গল কেটে যে যতটা পারে বিনামূল্যে জমি দখল ক'রে স্থায়ী বসত কায়েম করতে থাকে।

ইটালিয়ান, গ্রীক, স্পেনিশ, রোমান, ফ্রেন্স, ইংরেজ, ভারতীয়, চাইনীজ, জাপানীজ—এক কথায় এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ হতে বিভিন্ন জাতি এসে আমেরিকা দখল ক'রে বসে। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক ও স্পেনিশদের যে আধিপত্য ছিল, অধিক সংখ্যায় ইংরেজ জাতির আগমনে তা' ধীরে ধীরে লোপ

পেতে থাকে। পরিশেষে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ইংরেজ জাতি এদেশের শাসক ও মালিক হয়ে পড়েন। আমেরিকাবাসী বৃটিশরাজকে কর দিতে থাকে। প্রায় পৌনে তিন শ' বছর যাবৎ আমেরিকা বৃটিশের গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। নির্বিঘ্নে ধর্মচর্চার জন্য ১৬২০ খৃষ্টাব্দে যারা আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌সে এসে স্থায়ী বসত স্থাপন করেন, তাঁদিগকে 'তীর্থযাত্রী' বলে অভিহিত করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ সপ্তদশ শতকে বৃটেনে ষ্টুয়ার্ড রাজবংশের রাজত্ব-কালে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে উঠে। বিপদ দেখে অনেক শান্তিপ্রিয় ইংরেজ নিজ দেশ ছেড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে (আটলান্টিক সৈকতে) নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে থাকে। তাদের দেখাদেখি বিশ্বের নানা দেশের লোক আসতে থাকে। ক্রমে বহু জনবসতি স্থাপিত হয়। আমেরিকার বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠে তেরটি উপনিবেশ। তারা বিনা দ্বিধায় বৃটেনরাজকে খাজানা ও কর প্রদান করতে থাকে। এই করের সূত্র ধরে তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের গোলযোগ দেখা দেয়। আমেরিকায় বসবাসকারীগণ চায়ের জন্য বর্দ্ধিত কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে, তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমেরিকায় বৃটিশ সৈন্য বাহিনী প্রেরিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আমেরিকাবাসী ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ানগণ নিজেদের স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ আট বৎসর (১৭৭৫—৯৭৮৩) যাবৎ যুদ্ধ চলে। উপনিবেশিকদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন জর্জ ওয়াশিংটন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আপোষহীন নেতৃত্ব জনগণের মনে 'তারা এক নতুন জাতি' হিসেবে আত্মপ্রত্যায় গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যগণ পরাজয় বরণ করে।

আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ সম্মিলিতভাবে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয় ফিলাডেল-ফিয়ায়। প্রতিটি উপনিবেশ এক একটি অঙ্গ রাজ্যের (State) মর্যাদা লাভ করে। তেরটি অঙ্গরাজ্যের প্রতীকরূপে তৎকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় তেরটি স্ট্রিপ ও তেরটি তারকা স্থান লাভ করে। জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন জর্জ ওয়াশিংটন ও মিসেস বেটি রোজ (জেনারেল রোজ এর পত্নী)।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় তেরটি স্ট্রিপই রয়েছে, কিন্তু তারকার সংখ্যা পঞ্চাশটি, কেননা অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা পঞ্চাশ। যুক্তরাজ্যের বর্তমান জাতীয় পতাকায় সাতটি লালবর্ণের ফালিকে (Strips) ছয়টি সাদা বর্ণের ফালি বিভক্ত করেছে। নীলভূমিতে তারকাসমূহ সজ্জিত। পতাকার লাল রং সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্য, সাদা রং পবিত্রতা ও সাধুতা এবং নীল রং সতর্কতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক।

১৭৭৭ সালের ১৪ই জুন নিম্নোক্ত ১৩টি অঙ্গরাজ্য সমন্বয়ে প্রথমতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়ঃ

১। কানেকটিকাট
২। জর্জিয়া
৩। ডেলোয়ারা
৪। নর্থ ক্যারোলিনা
৫। নিউইয়র্ক
৬। নিউজার্সী
৭। নিউ হ্যাম্পশায়ার
৮। পেনসেলভেনিয়া
৯। ভার্জিনিয়া
১০। ম্যাসাসুচেটস্
১১। মেরীল্যাণ্ড
১২। রোড আইল্যাণ্ড
১৩। সাউথ ক্যারোলিনা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অঙ্গরাজ্য সমূহ (আয়তন অনুপাতে বৃহৎ হ'তে ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে সজ্জিত)ঃ

ক্রঃ নং	অঙ্গরাজ্যের নাম	আয়তন (বঃ মাঃ)	ডাকবিভাগীয় সঙ্কেত	জনসংখ্যা (১৯৯০)হাঃ	রাজধানী	যুক্তরাষ্ট্র ইউঃ যোগদানের সাল
১।	আলাস্কা	৫৯১,০০৪	AK	৫৩৪	জুনিয়া	১৯৫৯
২।	টেক্সাস	২৬৬,৮০৭	TOC	১৬,৬৮২	অস্টিন	১৮৪৬
৩।	ক্যালিফোর্নিয়া	১৫৮,৭০৬	CA	২৬,৯৮১	সাক্রামেন্টো	১৮৫১
৪।	মান্টানা	১৪৭,০৪৬	MT	৮,১৯	হেলেনা	১৮৯০
৫।	নিউমেক্সিকো	১২১,৫৯৩	NM	১,৪৭৯	সান্টাফে	১৯১২
৬।	অরিজোনা	১১৪,০০০	AZ	৩,৩১৭	ফণিক্স	১৯১২
৭।	নেভাডা	১১০,৫৬১	NE	৯৬৩	কারসনসিটি	১৮৬৫
৮।	কলোরাডো	১০৪,০৯১	CO	৩,২৬৭	ডেনভার	১৮৭৬
৯।	ইয়োমিং	৯৭,৮০৯	WY	৫০৭	চিয়েনি	১৮৯১
১০।	ওরেগণ	৯৭,০৭৩	OR	২,৬৯৮	সালেম	১৮৫৯
১১।	ইউতাহ	৮৪,৮৯৯	UT	১,৬৬৫	সল্টলেকসিটি	১৮৯৬
১২।	মিনেসোটা	৮৪,৪০২	MN	৪,২১৪	সেন্টপল	১৮৫৮
১৩।	আইডাহো	৮৩,৫৬৪	ID	১,০০৩	বয়িজ	১৮৯০
১৪।	ক্যানসাস	৮২,২৭৭	KS	২,৪৬১	টোপেকা	১৮৬৯
১৫।	নেব্রাস্কা	৭৭,৩৫৫	NB	১,৫৯৮	লিংকন	১৮৬৭
১৬।	সাউথ ডাকোটা	৭৭,১১৬	SD	৭০৮	পিয়েরে	১৮৯০
১৭।	নর্থ ডাকোটা	৭০,৭০২	ND	৬৭৯	বিসমার্ক	১৮৯০
১৮।	ওক্লাহোমা	৬৯,৯৫৬	OK	৩,৩০৫	ওকলাহোমাসিটি	১৯০৮
১৯।	মিসৌরী	৬৯,৬৯৭	MO	৫,০৬৬	জেফারসনসিটি	১৮২২
২০।	ওয়াশিংটন	৬৮,১৩৯	WA	৪,৪৬৩	ওলিম্পিয়া	১৮৯০
২১।	জর্জিয়া	৫৮,৯১০	GA	৫,৯৭৫	আটলান্টা	১৭৭৭
২২।	ফ্লোরিডা	৫৮,৬৬৪	FL	১১,৬৭৫	তেলাহাসি	১৮৪৫

২৩। মিচিগান	৫৮,৫২৭	MI	৯,৯৪৫	ল্যান্‌সিং	১৮৩৭
২৪। ইলিনয়েজ	৫৬,৩৪৫	IL	৯৯,৫৫৩	স্প্রিংফিল্ড	১৮৯৯
২৫। আইওয়া	৫৬,২৭৫	IA	২,৮৫৯	ডেসমইনস	১৮৪৭
২৬। উইসকন্‌সিন	৫৬,৯৫৩	WI	৪,৭৮৫	ম্যাডিসন	১৮৪৮
২৭। আরকানসাস	৫৩,১৮৭	AR	২,৩৭২	লিট্‌লরক	১৮৩৬
২৮। নর্থ ক্যারোলিনা	৫২,৬৬৯	NC	৬,৩৩৯	রেলী	১৭৭৭
২৯। অ্যালাবামা	৫১,৭০৫	AL	৪,০৫৩	মনটেগোমারী	১৮২০
৩০। নিউইয়র্ক	৪৯,১০৮	NY	১৭,৭৭২	অ্যালবানী	১৭৭৭
৩১। লুই জিয়ানা	৪৭,৭৫২	LA	৪,৫০১	ব্যাটনরোগ	১৮১২
৩২। মিসিসিপি	৪৭,৬৮৯	MS	২,৬২৫	জ্যাকসন	১৮১৮
৩৩। পেনসেলভেনিয়া	৪৫,৩০৮	PA	১১,৮৮৯	হ্যারিসবার্গ	১৭৭৭
৩৪। টেনেসি	৪২,১৪৪	TN	৪,৮০৩	নাশভিল	১৮১৮
৩৫। ওহাইও	৪১,৩৩০	OH	১০,৭৫২	কলাম্বাস	১৮০৩
৩৬। ভার্জিনিয়া	৪০,৭৬৭	VA	৫,৭৮৭	রীচমণ্ড	১৭৭৭
৩৭। কেন্টাকী	৪০,৪০৯	KY	৩,৭২৮	ফ্রাঙ্কফোর্ট	১৭৭৭
৩৮। ইণ্ডিয়ানা	৩৬,১৮৫	IN	৫,৫০৪	ইণ্ডিয়ানাপলিস	১৮১৭
৩৯। মেইন	৩৩,২৬৫	ME	১,১৭৪	মগাস্টা	১৮২০
৪০। সাউথক্যারোলিনা	৩১,১১৩	SC	৩,৩৭৮	কলাম্বিয়া	১৭৭৭
৪১। ওয়েস্টভার্জিনিয়া	২৪,২৩১	WV	১,১১৯	চারলেস্টন	১৮৬৩
৪২। মেরিল্যাণ্ড	১০,৪৬০	MD	৪,৪৬৩	এ্যানাপলিস	১৭৭৭
৪৩। ভারমন্ট	৯,৬১৪	VT	৫৪১	মন্টপেলিয়ার	১৭৯৫
৪৪। নিউহ্যাম্পশায়ার	৯,২৭৯	NH	১,০২৭	কনকর্ড	১৭৭৭
৪৫। ম্যাসাচুসেটস	৮,২৮৪	MA	৫,৮৩২	বস্টন	১৭৭৭
৪৬। নিউজার্সী	৭,৭৮৭	NJ	৭,৬২০	টেন্টন	১৭৭৭
৪৭। হাওয়াই	৬,৪৭১	HI	১,০৬২	হনুলুলু	১৯৬০
৪৮। কানেকটিকাট	৫,০১৮	CT	৩,১৮৯	হার্টফোর্ট	১৭৭৭
৪৯। ডেলাওয়ার	২,০৪৪	DE	৬৩৩	ডোভার	১৭৭৭
৫০। রোড আইল্যাণ্ড	১,২১২	RI	৯৭৫	প্রভিডেন্স	১৭৭৭*

বিভিন্ন বৎসরে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে (৪ঠা জুলাই) প্রথম তেরটি অঙ্গরাজ্য ব্যতীত পরবর্তী অঙ্গরাজ্য সমূহ আমেরিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য সমূহে ছোট বড় অনেক শহর আছে। ফ্লোরিডা ষ্টেটে আটটি মেট্রোপলিটান সিটি ও প্রায় পঞ্চাশটি শহর আছে। প্রতি মেট্রোপলিটান সিটির জন্য একজন মেয়র এবং কমিশনারবৃন্দ গণভোটে নির্বাচিত

* New Standard Encyclopedia (Vol, 6 FG) page 161—165,

হন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কমিশনারের সংখ্যা নিরূপিত হয়। প্রতি অঙ্গরাজ্যের জন্য একজন গভর্ণর গণভোটে নির্বাচিত হন। গভর্ণর তাঁর পছন্দমত প্রতি বিভাগ বা দপ্তরের জন্য এক একজন সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব পৃথক সংবিধান এবং পৃথক ভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং জাতীয় কংগ্রেস অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।

প্রতিটি অঙ্গরাজ্য নিজেদের প্রয়োজন মত স্থানীয় সরকার কাঠামো নিজেরাই তৈরী করে। এজন্য তাদের বিধিবিধানে তেমন সাদৃশ্য নেই।

স্বাধীনতা সনদ (Declaration of Independence) ঃ ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের (Colonies) প্রতিনিধিবর্গ বৃটেনের অধীনতা অস্বীকার পূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল স্বাক্ষর করেন। এই দলিলকে বলা হয় 'স্বাধীনতা সনদ'। এ-কারণে উক্ত তারিখ (৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পরিগণিত।

প্রেসিডেন্টদের তালিকা

বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঃ

ক্রঃ নং	নাম	সময়-কাল
১।	জর্জ ওয়াশিংটন	১৭৮৯-১৭৯৭
২।	জন এ্যাডামস	১৭৯৭-১৮০১
৩।	থমাস জেফারসন	১৮০১-১৮০৯
৪।	জেমস ম্যাডিসন	১৮০৯-১৮১৭
৫।	জেমস মনরো	১৮১৭-১৮২৫
৬।	জনকুইনসি এ্যাডামস	১৮২৫-১৮২৯
৭।	এনড্রিউ জ্যাকসন	১৮২৯-১৮৩৭
৮।	মার্টিন ভ্যানবুরেন	১৮৩৭-১৮৪১
৯।	উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন	১৮৪১-১৮৪১
১০।	জন টেইলার	১৮৪১-১৮৪৫
১১।	জেমস নক্সপক	১৮৪৫-১৮৪৯
১২।	জাকারী টেইলার	১৮৪৯-১৮৫০
১৩।	মিলার্ড ফিলমোর	১৮৫০-১৮৫৩
১৪।	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স	১৮৫৩-১৮৫৭
১৫।	জেমস বুকানন	১৮৫৭-১৮৬১
১৬।	আব্রাহাম লিংকন	১৮৬১-১৮৬৫
১৭।	এড্রিউ জনসন	১৮৬৫-১৮৬৯
১৮।	ইউলিসেস্ সিম্‌সন গ্রান্ট	১৮৬৯-১৮৭৭
১৯।	রাদার ফোর্ড রিচার্ড হাইজ	১৮৭৭-১৮৮১
২০।	জেমস আব্রাম গারফিল্ড	১৮৮১-১৮৮১
২১।	চেস্টার এলান আর্থার	১৮৮১-১৮৮৫
২২।	গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড	১৮৮৫-১৮৮৯
২৩।	বেন্‌জামিন হ্যারিসন	১৮৮৯-১৮৯৩
২৪।	গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড	১৮৯৩-১৮৯৭
২৫।	উইলিয়াম ম্যাকিনলী	১৮৯৭-১৯০১
২৬।	থিওডোর রুজভেল্ট	১৯০১-১৯০৯
২৭।	উইলিয়াম এইচটাফ্‌ট	১৯০৯-১৯১৩
২৮।	উড্‌রো উইলসন	১৯১৩-১৯২১
২৯।	ওয়ারেন জি,হারডিং	১৯২১-১৯২৩
৩০।	কেল্‌ভিন কলিজ	১৯২৩-১৯২৯
৩১।	হাবার্ট সি, হুভার	১৯২৯-১৯৩৩
৩২।	ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট	১৯৩৩-১৯৪৫
৩৩।	হ্যারী এস, ট্রুম্যান	১৯৪৫-১৯৫৩
৩৪।	ডুইট ডি, আইসেন হাওয়ার	১৯৫৩-১৯৬১

৩৫। জন, এফ, কেনেডি ১৯৬১-১৯৬৩
৩৬। লিণ্ডন বি, জনসন ১৯৬৩-১৯৬৯
৩৭। রিচার্ড এম, নিক্সন ১৯৬৯-১৯৭৪
৩৮। জিরাল্ড আর, ফোর্ড ১৯৭৪-১৯৭৭ (নিয়োগকৃত)
৩৯। জেমস আর্ল কার্টার ১৯৭৭-১৯৮১
৪০। রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮১-১৯৮৯
৪১। জর্জ বুশ ১৯৮৯—১৯৯২
৪২। বিল ক্লিনটন ১৯৯২—বর্তমান।

রাজনৈতিক কার্যক্রম

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি প্রধানতঃ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমিত। একটি রিপাবলিকান, অপরটি ডেমোক্রাটিক পার্টি। প্রথমোক্ত দলের সদস্যদিগকে বলা হয় রিপাবলিকানস্ এবং অপর দলের সদস্যগণ ডেমোক্র্যাট্স। উভয় পার্টির নেতা নির্বাচনের জন্য গণভোট গৃহীত হয়। প্রতি পার্টি হতে পাঁচ ছয়জন দাঁড়াতে পারেন। যিনি সর্বোচ্চ ভোট পান, তিনি দলনেতা নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। উভয় দলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থী ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ রিপাবলিকান দলের ছিলেন; ১৯৯২ সালের নির্বাচনে তিনি পরাজয় বরণ করেন।

জাতীয় কংগ্রেস

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কংগ্রেস বা আইন পরিষদে দু'টি হাউস আছে: (১) আপার হাউস বা সিনেট, (২) লোয়ার হাউস বা হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ। উভয় হাউসের সকল সদস্য প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সর্বনিম্ন আঠার বৎসর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা ভোটার হবার যোগ্য। কংগ্রেসে সমাজের বিভিন্ন পেশাভিত্তিক লোকদের প্রতিনিধি থাকেন।

সিনেটের সদস্যসংখ্যা ১০০ জন এবং লোয়ার হাউসের সদস্যসংখ্যা ২৬০ জন। উভয় হাউসের সকল সদস্য জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। আমেরিকার জাতীয় সরকারকে ফেডারেল সরকার বলা হয়। এর অধীনে অঙ্গরাজ্য সরকার, কাউন্টি, মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, টাউনশিপ ইত্যাকার বিভিন্ন স্তরের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা

(১) আপার হাউস বা সিনেটের সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ বৎসর এবং অন্ততঃ নয় বৎসর আমেরিকার নাগরিকত্ব থাকা প্রয়োজন।

(২) লোয়ার হাউস বা হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের সদস্য হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের সর্বনিম্ন বয়স ২৫ বৎসর এবং কমপক্ষে সাত বৎসরের আমেরিকার নাগরিকত্ব থাকতে হবে।

প্রেসিডেণ্ট পদের যোগ্যতা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বৎসর এবং কমপক্ষে ১৪ বৎসর যাবৎ জন্মসূত্রে আমেরিকার স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যও একই যোগ্যতা প্রয়োজন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হতে হলে স্ব স্ব দলের মনোনয়ন প্রয়োজন। উপরোক্ত সর্ত সাপেক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

সিনেটরের যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে ৩০ বৎসর বয়স এবং ৯ বৎসর আমেরিকার নাগরিক হিসাবে স্থায়ী বাস করতে হবে।

রিপ্রেজেনটেটিভের (Congressman) যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স এবং ৭ বৎসর আমেরিকার নাগরিক হিসাবে স্থায়ী বাস করতে হবে।

নির্বাচন

১। নিম্ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৬০ জন। প্রতি তিন লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন সদস্য হবেন। কোন অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা তিন লাখের কম থাক্‌লেও উক্ত ষ্টেটট হতে একজন নিম্ন পরিষদ সদস্য গণভোটে নির্বাচিত হবেন। মোট কথা প্রত্যেক ষ্টেটটের অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নিম্ন পরিষদে থাকবেন। প্রতি অঙ্গরাজ্যের জন্য নিম্ন পরিষদের আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ করা হয়।

নিম্ন পরিষদের জন্য স্পীকার নির্বাচন ও অন্যান্য অফিসার নিয়োগের এবং জবাবদিহীর পূর্ণক্ষমতা অত্র পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। প্রতি দুই বৎসর অন্তর বেজোড় বৎসরে নভেম্বর মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে নিম্ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২। সিনেটের নির্বাচন ঃ প্রতি অঙ্গরাজ্য হতে দুইজন সিনেটের সদস্য (সিনেটর) নিম্ন পরিষদের সদস্যদের ভোটে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি ছয় বৎসরে নভেম্বর মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে সিনেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সিনেটকে 'হাউস অব প্রেসিডেন্ট'ও বলা হয়। সিনেটের সদস্যসংখ্যা ১০০ জন (৫০টি ষ্টেটট হতে ২ জন ক'রে)।

৩। ভাইস প্রেসিডেণ্ট ঃ প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বৎসরের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রার্থী সমস্ত ভোটার সংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক ভোট না পেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন না। এরূপক্ষেত্রে সিনেটরগণ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুইজন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে তাঁদের ভোট প্রদান করবেন। যিনি সিনেটরদের সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে সিনেটরদের কোরাম হবে

$\frac{2}{3}$ অংশ সদস্যে, অর্থাৎ ৯০০ জনের মধ্যে কমপক্ষে ৬৭ জন ভোটদানের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে সিনেটের প্রেসিডেন্ট হবেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সিনেটরদের ভোটসংখ্যা পক্ষে বিপক্ষে সমান হলে তিনি একটি 'কাস্টিং ভোট' দিতে পারবেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে সিনেটরগণ তাঁদের মধ্য হতে তাঁদের ভোটে সিনেটের জন্য একজন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টে নির্বাচিত করবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর উক্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদ বিলুপ্ত হবে। ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ কোন কারণে শূণ্য হলে প্রেসিডেন্ট একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করবেন, কিন্তু তাঁর মনোনীত ভাইস প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেসের (নিম্ন ও উচ্চ পরিষদের সদস্যবর্গের) অধিকাংশের সমর্থন পেতে হবে।

৪। **প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঃ** গণভোটে চার বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর ভোট সংখ্যা ভোটার সংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক না হলে, যে তিনজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন, তাঁদের তিনজনের জন্য প্রত্যেক স্টেটের আইন সভার ভোট গ্রহণ করা হয়। যিনি $\frac{1}{2}$ স্টেটের অধিকাংশ ভোটে বিজয়ী হন, তিনি প্রেসিডেন্ট হন। এ-ক্ষেত্রে প্রতি স্টেটের এক ভোট, অর্থাৎ ৫০টি স্টেটের পঞ্চাশ ভোটের মধ্যে যিনি সর্বাধিক স্টেট হতে সর্বোচ্চ ভোট পাবেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ চার বৎসর। মেয়াদ উত্তীর্ণের বৎসরে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মঙ্গলবারে প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একই ব্যক্তি দুই বারের অধিক প্রেসিডেন্ট হতে বা প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখে মধ্যাহ্নে পূবতন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হবে। তারা দায়িত্ব অর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করবেন। একই দিনে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হলেও কংগ্রেস বা আইন পরিষদ সার্বভৌম। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস।

প্রেসিডেন্ট কোন কারণে কংগ্রেসের $\frac{2}{3}$ অংশ সদস্যদের ভোটে অভিযুক্ত হলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন এবং কংগ্রেস-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট অক্ষম হলে, পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন ; অভাবে হাউসের স্পীকার অথবা 'প্রেসিডেন্ট প্রো-টেম্পর অব সিনেট' (সিনেট মনোনীত সিনিয়র সদস্য) প্রেসিডেন্টে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রেসিডেন্টের শপথ (President's Oath) ঃ

নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রাজধানী ভবনের সামনে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর তাঁর ডানহাত স্থাপনপূর্বক নিম্নোক্ত শপথ গ্রহণ করবেন। শপথ করাবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.

এতদ্বারা আমি যথাবিধি শপথ করছি যে, আমি সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার প্রতি অর্পিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার সাধ্যমত সুষ্ঠুভাবে পালন করবো এবং যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের হেফাজত সংরক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষা করবো।

শপথ গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করবেন। অনুরূপভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করবেন।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা

(১) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকে।

(২) তিনি সামরিক বাহিনীর (Armed Force) প্রধান থাকেন।

(৩) তিনি সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন (সিনেটের সঙ্গে পরামর্শক্রমে)। সুপ্রিম কোর্টের মোট ৯ জন জাস্টিস বা বিচারপতি থাকবেন।

(৪) তিনি কোন দেশের সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধি করতে এবং বিদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করবেন (সিনেটের পরামর্শ, সমর্থন ও অনুমোদনক্রমে)।

(৫) তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করতে, তার শাস্তি লাঘব করতে বা শাস্তি কার্যকর করা বিলম্বিত করতে পারবেন।

(৬) ফেডারেল কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত প্রেসিডেন্ট কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবলমাত্র ফেডারেল সরকার বিদেশের সঙ্গে যেকোন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

(৭) তিনি জাতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় মেহমানদের গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

(৮) তিনি ফেডারেল কংগ্রেসের পাশকরা বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৯) তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশের রাজধানী সফর ক'রে তথাকার রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারবেন।

(১০) তিনি জেট এয়ারক্র্যাফট সমূহ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(১১) তিনি বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে বা যুদ্ধকালীন সময়ে অধিক ক্ষমতা (গঠনতন্ত্রে অলিখিত) প্রয়োগ করতে পারবেন। এরূপক্ষেত্রে তিনি ফেডারেল কংগ্রেস বা সিনেটের অনুমোদন ছাড়াই যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা' কার্যকর করতে পারবেন কিন্তু সঙ্কট কেটে গেলে তাঁর হাতে এই বিশেষ ক্ষমতা থাকবে না।

(১২) প্রতি ষ্টেট কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট যে সকল আইন পাশ করা বিশেষ জরুরী প্রয়োজন মনে করেন, সে-বিষয়ে কংগ্রেসকে অবহিত করবেন। এ জন্য তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেস তার অভিমত সমর্থন না-ও করতে পারেন। তবে কোন ষ্টেট কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের দলের সদস্যসংখ্যা বা তাঁর সমর্থনসংখ্যা অধিকাংশ হলে তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হতে পারে।

(১৩) তিনি জাতীয় রেডক্রসের প্রধান হিসেবে রেডক্রসের সাহায্য দান অনুমোদন করবেন।

(১৪) তিনি জাতীয় রক্ষাকবচ হিসাবে জাতীয় সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং তাঁর সঙ্গে দর্শনপ্রার্থীদের সাক্ষাৎকার প্রদান করবেন।

(১৫) তিনি বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর প্রদান করবেন।

(১৬) জাতীয় নেতা হিসাবে প্রয়োজনবোধে যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবেন, অবশ্য ফেডারেল সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে। অনুমোদিত না হলে কার্যকরী হবে না।

প্রেসিডেন্টের কেবিনেট

প্রেসিডেন্ট তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে ১১ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তাঁরা হবেন বিভিন্ন দপ্তরের সেক্রেটারী (মন্ত্রীতুল্য)। দপ্তর সমূহ: রাষ্ট্র, অর্থ, দেশরক্ষা, আর্মী, নেভী, এয়ার ফোর্স, এ্যাটোর্ণি জেনারেল (আইন বিষয়ক), আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি, বাণিজ্য, শ্রমিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা, যোগাযোগ, সংস্থাপন, হাউজিং, শহরোন্নয়ন, ভারত বিষয়ক ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রধান বিভাগসমূহ

১। প্রশাসন বিভাগ
২। আইন বিভাগ
৩। বিচার বিভাগ।

কংগ্রেসের ক্ষমতা

জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স, ডিউটি, শুল্ক ও আবগারী কর ধার্য এবং আদায়ের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ, দেশরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। ট্যাক্স ধার্যেরক্ষেত্রে প্রত্যেক ষ্টেটের মধ্যে সমতা

ও ন্যায়বিচার রক্ষা করতে হবে। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর উপর ন্যস্ত থাকে।

কংগ্রেসে কোন বিল পাশ হলে তা' আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করতে হবে। তিনি বিল অনুমোদন ক'রে তাতে স্বাক্ষর দান করবেন অথবা আপত্তি উত্থাপন ক'রে বিল ফেরৎ দিতে পারবেন। প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা বা ভেটো ক্ষমতা আছে। প্রেসিডেন্ট যাকিছু করবেন, তা' কংগ্রেস কর্তৃক পাশ হতে হবে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত কোন অর্ডিন্যান্স কংগ্রেসের অনুমোদন না পেলে তা' আইনে পরিণত হবে না। প্রেসিডেন্ট-ঘোষিত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার বা বাতিল ঘোষণা করতে হবে। প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্যাবিনেট সেক্রেটারীদের নিয়োগ করবেন। ক্যাবিনেট সেক্রেটারীগণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করলে ফেডারেল কংগ্রেসের ⅔ অংশ সদস্যের ভোটে বিলটি পুনঃ বিবেচনা ক'রে পাশ করলে তা' বৈধ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র ফেডারেল কংগ্রেসের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা প্রদান করেছে।

অধিবেশন

বৎসরে অন্ততঃ একবার ফেডারেল কংগ্রেসের অধিবেশন বস্‌বে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের ৩ তারিখে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য বিধান মোতাবেক অন্য কোন তারিখেও অধিবেশন আহবান করা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যে কোরাম হবে। ফেডারেল কংগ্রেস অধিবেশনে নিম্ন পরিষদ ও উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ যোগদান করবেন। তাঁরা সকলেই ফেডারেল কংগ্রেস বা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। *

প্রেসিডেন্ট অভিযুক্ত

আমেরিকা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে প্রেসিডেন্ট বা তাঁর কোন কর্মচারী বা দলীয় সদস্য কোন অন্যায় করলে তার জন্য প্রেসিডেন্টকে জবাবদীহি করতে হয়। এতে প্রেসিডেন্টের শুধু মর্যাদাহানিই হয় না, অপরাধ প্রমাণিত হলে, তিনি প্রেসিডেন্টপদে সমাসীন থাকতে পারেন না। তাঁকে পদত্যাগ করে বিদায় গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় তাঁকে ছাঁটাই ঘোষণা করা হয়। দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ঐকমত্যে প্রেসিডেন্টকে ইম্পিচ বা অভিযুক্ত করা যায়।

রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমলে আমেরিকার 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী'র খবর গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে; যার ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়। ঘটনাটি ছিল, ১৯৭২ সালের ১৭ই জুন ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটার গেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটির

* Ref : The First Book of Presidents'—Harold Coy (Pub. 1981).

অফিসের তালা ভেঙ্গে কিছু মূল্যবান দলিলপত্র চুরির অপরাধে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান জেমস ম্যাককর্ড জুনিয়র ও আরো চারজন গ্রেপ্তার হন। তাদের নিকট হতে আড়িপেতে শোনা টেপ ও আলোক চিত্র উদ্ধার করা হয়। ১৯৭২ সালের শেষ থেকে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত তদন্ত চলে এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে দোষী সাব্যাস্ত করা হয়। কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য প্রেসিডেন্টকে অপসারণের জন্য ঐকমত্যে পৌঁছেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ১৯৭৪ সালের ৯ই আগষ্ট নিক্সন পদত্যাগ করেন।

আর একটি ঘটনা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিপরো এ্যাগনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি মেরীল্যাণ্ডের গভর্ণর থাকাকালে আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। তিনি অভিযোগের মোকাবেলা করতে অসমর্থ হওয়ায় ১৯৭৩ সালের ১০ই অক্টোবর পদত্যাগ করেন।

অপর পক্ষে তৃতীয় বিশ্বে কী দেখা যায়? এর চেয়ে শত সহস্রগুণ অন্যায় বা অপরাধ করা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী কোন সময়ই পদত্যাগ করেন না, বরং তারা উন্নতমস্তকে বহাল তবিয়তে থাকেন। তাঁদের দেখাদেখি সে-সব দেশের নেতা ও কর্মচারীরা দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসায়।

অঙ্গরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা

ষ্টেট গভর্ণর ঃ প্রতি ষ্টেটে (অঙ্গরাজ্যে) একজন গভর্ণর উক্ত ষ্টেটের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের ভোটে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি সরকার প্রধান। তাঁর পছন্দমত বিভাগীয় সেক্রেটারীদিগকে নিয়োগ করেন। সেক্রেটারীগণ ষ্টেট কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন, নাও হতে পারেন। বিভাগ সমূহ ঃ ষ্টেট, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শ্রমিক কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

বিভিন্ন দপ্তরের সেক্রেটারীগণ মন্ত্রী পর্যায়ের অঙ্গরাজ্য কংগ্রেস বা ফেডারেল কংগ্রেসে কোন মন্ত্রীর পদ নাই। সেক্রেটারীগণই মন্ত্রী। ষ্টেট সমূহের নিজস্ব গার্ড বাহিনী আছে। তা'দিগকে 'ন্যাশন্যাল গার্ড' (জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী) বলা হয়। তাঁরা ষ্টেটের অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

প্রতি ষ্টেট কতিপয় কাউন্টিতে বিভক্ত। কাউন্টিসমূহ বাংলাদেশের থানার ন্যায়। কাউন্টি প্রধানকে চেয়ারম্যান বলা হয়। বড় বড় শহর বা সিটি কতিপয় কাউন্টিতে বিভক্ত থাকে। সিটি করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের প্রধান শাসনকর্তাকে 'মেয়র' বলা হয়। তিনি গণভোটে নির্বাচিত হন। মেয়াদকাল চার বৎসর।

অঙ্গরাজ্যে সংসদ (State Assembly) ঃ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে ষ্টেট এসেমব্লী আছে। তাতে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন-টেটিভসের সদস্যগণ থাকেন। অঙ্গরাজ্যের প্রাপ্তবয়স্কদের গণভোটে আইনসভার সদস্যবর্গ নির্বাচিত হন। এই সভা অঙ্গরাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।

কোর্ট সমূহ ঃ ফেডারেল কোর্ট (ওয়াশিংটন ডি, সি-তে), সার্কিট কোর্ট (State Court) ও জেলা আদালতে বিচারকার্য নিষ্পত্তি হয়। ফেডারেল বিচারকগণ আজীবন বিচারক থাকেন (অক্ষম বা কোন অপরাধের কারণে অপসারিত না হলে)।

দেয় কর ঃ জনগণকে দ্বিবিধ ট্যাক্স প্রদান করতে হয় ঃ (১) ফেডারেল গভঃ ট্যাক্স, (২) ষ্টেট গভঃ ট্যাক্স।

পাবলিক সেক্টর ঃ জনগণের বিবিধ বিষয় পাবলিক সেক্টরের আওতাভুক্ত। এমনকি ডাক বিভাগ পর্যন্ত আধা সরকারী পাবলিক সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত। শতকরা নব্বই ভাগ হাসপাতাল, অনেক রাস্তা, ব্রীজ, পার্ক, ইত্যাদি পাবলিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের পরিচালনাধীন। কয়েকটি বড় শহরে সিটি হাসপাতাল আছে।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের 'ভেটারেন হস্‌পিটালে' বিনা খরচে চিকিৎসা করা হয়। আমেরিকায় প্রায় সবারই স্বাস্থ্যবীমা থাকে। তাঁরা বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ পান। আমেরিকার পঁচিশ কোটি বাসিন্দার মধ্যে প্রায় তিন কোটি মানুষের স্বাস্থ্যবীমা নাই। তারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে নিজেদেরকে চিকিৎসার ব্যয়বহণ করতে হয়। স্বাস্থ্যবীমা বিহীন কারো চিকিৎসা ব্যয়বহণ করার সঙ্গতি না থাকলে চিকিৎসকগণ নগদ অর্থ ছাড়াই চিকিৎসা করেন, পরে মাসিক কিস্তিতে বিলের অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

হাসপাতালে ভর্তি রুগীদের চিকিৎসাব্যয় সরকার বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহণ করেন। প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাব্যয় অসম্ভব বেশী। সাধারণতঃ প্রাইভেট চিকিৎসক রুগী প্রতি পনর হতে পঁচিশ ডলার ফি নিয়ে রুগী দেখে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। বাইরের দোকান হ'তে তা'দিগকে ঔষধ কিনতে হয়।

গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

ষ্টেট আইন সভার ¾ ভোটে এবং ফেডারেল কংগ্রেসের ¾ অংশ ভোটে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাশ হলে তা' গৃহীত হয়। গঠনতন্ত্রের প্রথম দশটি সংশোধনীকে 'বিল অব রাইটস' বলা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের মূল কথা ঃ স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায় বিচার।

আর্টিকেলস অব কনফেডারেশন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নের সর্বপ্রথম গঠনতন্ত্রকে বলা হয় Articles of Confederation ঃ এ-টি পাশ হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তৎকালীন রাজধানী ফিলাডেলফিয়ায় তেরটি কলোনিয়াল ষ্টেটের প্রতিনিধিদের দ্বারা।

অভিষেক অনুষ্ঠান

১৯৯৩ সালের ২০শে জানুয়ারী বুধবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-চীফ জাস্টিস উইলিয়াম রণকুইস্ট নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ আলগোরকে শপথবাক্য পাঠ করান এবং তাঁ'দিগকে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত করেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে মিসেস হিলারী ক্লিনটন, সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যবর্গ, পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং বহু দর্শক ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

এবারই প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়রূপে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। এতে আল্ কোরআনের প্রতি আমেরিকার গুরুত্ব দান নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছে।

আমেরিকান নাগরিক

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বসবাসকারীগণ প্রায় সবাই বহিরাগত। অন্ধকার যুগের জংলী আদিবাসীদের (রেড ইণ্ডিয়ানসদের) বংশধর আজ আমেরিকায় খুব কমই আছে। এককালে এই দেশ ছিল অজ্ঞাত, অখ্যাত, জঙ্গলাবৃত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়ে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরে বিশ্বময় ছড়িয়ে পরে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের খবর। তখন থেকে বিভিন্ন দেশের লোকজন দলে দলে এসে এখানে বসতি গড়ে তুল্‌তে থাকে। তারা সবাই আজ 'আমেরিকান'। বহু ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও চেহারার মানুষ এখানে একত্রে মিশে আছে। তাদের প্রতিজ্ঞা—তারা স্বাধীন সুখশান্তির নীড় ঐশ্বর্যশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকা গড়ে তুল্‌বে। তারা আমেরিকার নাগরিক জন্য গর্বিত। এটাই তাদের সর্বাধিক অহঙ্কার।

দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে আমেরিকাবাসী সজাগ। জনৈক ব্যক্তি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ, কেনেডিকে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমেরিকা তোমাকে কী দিয়েছে প্রশ্ন না ক'রে, তোমার মনকে প্রশ্ন করো—দেশকে তুমি কি দিয়েছো?

জাতীয় চেতনাবোধ যুক্তরাষ্ট্রকে উন্নতির শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বজনীন চেতনাবোধ বিকশিত হলে সমগ্র বিশ্ব আমেরিকাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শক্তি ও পরাক্রমের দাপটে ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হলে জাতীয় পতন ঘটা অসম্ভব নয়। এর ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ রয়েছে বিশ্বের বুকে।

কোন জাতির মধ্যে বিভেদ ও সংঘাতের দেয়াল বিরাজমান থাক্‌লে, সে জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি উল্লেখযোগ্য উৎসব দিবস ঃ

১। **স্বাধীনতা উৎসব ঃ** ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি বিশেষ জাঁক-জমকের সঙ্গে ৩রা জুলাই হতে ৭ই জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মস্থান এবং প্রথম রাজধানী ফিলাডেলফিয়া সিটিতে মহাসমারোহে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বাদ্যসহ কুচকাওয়াজ, প্যারেড, শোভাযাত্রা, খেলাধূলা, বেলুন রেস, আতসবাজী, ভোজ অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

শুধুমাত্র ফিলাডেলফিয়াতেই নয়, অন্যান্য স্থানেও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ৪ঠা জুলাই সরকারী ছুটির দিন।

২। ধন্যবাদ প্রদান দিবস (Thanks giving Day) ঃ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। দিবসটিকে চিরস্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে এই দিবসে মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকগণ এই দিনে উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার দানের এবং টার্কী মোরগের মাংস সহযোগে উন্নতমানের ভোজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানটিতে অনেকেই মিটকুমড়ার সাহায্যে সঙ সেজে আমোদপ্রমোদ করেন।

অনুষ্ঠানটি নিয়মিত পালিত না হাওয়ায় প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সাল হতে দিবসটি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেন। তখন হতে প্রতি বৎসর বিশেষ গুরুত্বসহ 'থ্যাংক্স গিভিং ডে' নিয়মিত পালিত হয়। এই দিনে সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী ছুটি পালিত হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

আমেরিকায় শতকরা ৭৫ ভাগ বনাঞ্চল। এতদসত্ত্বেও পারমাণুবিক পরীক্ষার কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেখা দেয়া আদৌ অসম্ভব নয়। পারমাণুবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশ্বপরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। পারমাণুবিক শক্তি যে কিরূপ মারাত্মক তা' ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগষ্ট তারিখে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত এটম বোমার ধ্বংসলীলা তার বাস্তব প্রমাণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মাত্র দু'টি পারমাণুবিক বোমার কবলে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক প্রাণ হারায়; যারা বেঁচে ছিল তাদের হতে হয়েছে নানারূপ জটিল-ব্যাধি ও মরণযন্তনার শিকার। পারমাণুবিক পরীক্ষাও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ।

পারমাণুবিক অস্ত্র তৈরী এবং ধ্বংসাত্মক পারমাণুবিক পরীক্ষা বন্ধের জন্য জাতিসংঘের সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ একান্ত বান্ছনীয়। মানবতার কল্যাণকামী সকল জাতিকে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

'১৯৬৩ সাল হতে আমেরিকার নেভাদা মরুভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন ৬৭০টি পরমাণুবোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে বিশ্বের আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক তেজঃস্ক্রীয়তা। অনুরূপ

আরো বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। একই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি তৈরী করছে উচ্চ তেজঃস্ক্রীয়তা সম্পন্ন পারমাণবিক জঞ্জাল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা। তাদের নিক্ষিপ্ত বিষের স্পর্শে শুধু মানব জাতিই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, মারা যাচ্ছে নানা প্রজাতির মাছ, বৃক্ষলতা ও বন্য প্রাণী। এই ক্ষতির নৈতিক দায়িত্ব কার ?

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ ভাগ বনাঞ্চল বা বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র নয় ভাগ। ফলে প্রায়ই দেখা দেয় অনাবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিক্ষয়, মরুকরণ ইত্যাকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিভিন্নভাবে পরিবেশ দুষণের জন্য আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছি। এর ফলে বিশ্বে খাদ্যাভাব ও নানা প্রকার নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা অসম্ভব নয়। অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্বের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। সমুদ্রের গভীরতা হ্রাসের কারণে অতিবন্যা হতে পারে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও যান বাহনের ধুম্র উদ্গীরণ এবং ধুমপানের দরুণ বাতাস দুষিত হ'য়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। মানুষের অজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ পানি দুষণ যে কি পরিমাণ ক্ষতিকর তা' প্রতিটি ব্যক্তির অবহিত থাকা প্রয়োজন। ধূমপানের কারণে মানুষের আয়ুক্ষয় ও ক্যান্সার রোগের উৎপত্তি ঘটে। পশুপাখীর মৃতদেহ, গলিজ পদার্থ, মলমূত্র, পানি ও বাতাসকে চরমভাবে দুষিত করে। দুষিত পানি ও বাতাসের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ জীবানু বিস্তার লাভ করে।

অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব ত্যাগ ক'রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়রোধকল্পে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। অন্যথায় মানব জাতি সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

বহিরাগত পুনর্বাসন ঃ যুক্তরাষ্ট্র একটি বিরাট দেশ। সমগ্র দেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমিতে জনবসতি, আবাদ, কলকারখানা, অফিস ইত্যাদি অবস্থিত। অবশিষ্ট এলাকা পড়ে আছে পতিত, বনাঞ্চল, পাহাড় ও মরুভূমি। তাতে মনে হয়, আরো কয়েক কোটি লোক আমেরিকায় সচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। এদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার উদারনীতি গ্রহণ করেছেন।

'ইন্টারন্যাশন্যাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার এক খবরে জানা যায়, গত বৎসর (১৯৯০) যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ লক্ষ বহিরাগতকে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

১৯৮৬ সালের বহিরাগত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ আইনে অবৈধ বিদেশীদের ক্ষমা ক'রে তা'দিগকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে পঁচিশ লক্ষ বিদেশী স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৯১ সালে ও, পি-১ এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ হতে কয়েক লক্ষ বিদেশী আমেরিকায় বসবাসের সুযোগ লাভ করেছে। ইমিগ্রেশন আইন মোতাবেক এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গুপ্ত সংস্থা ঃ

১। **সি, আই, এ, (সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ১৯৪৭ সালে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফষ্টার ডালেস সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দপ্তর ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। এই সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষাকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সদা কর্মতৎপর।

২। **কু-ক্লাক্স ক্লান (Ku Klux Klan) ঃ** আমেরিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের একটি গোপন সংস্থা। কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনমূলক আধিপত্য এবং বর্ণ বৈষম্যনীতি বজায় রাখা এই সংস্থার লক্ষ্য।

৩। **ব্ল্যাক প্যান্থার ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের (কৃষ্ণাঙ্গদের) একটি গোপন সংস্থা। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার প্রতিহত করা, সমাজসেবা এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

বিশ্ব-শক্তি বলয়

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে সমগ্র বিশ্ব প্রধানতঃ তিনটি শক্তি বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ঃ যেমন—১ম, ২য় ও তৃতীয় বিশ্ব।

১। **প্রথম বিশ্ব ঃ** পাশ্চাত্য জগৎ (Western Block) যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া ইটালী, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ এবং এইসব দেশের নেতৃত্বাধীন দেশসমূহ নিয়ে প্রথম বিশ্ব। এইসব ধনতান্ত্রিক দেশকে মুক্ত বিশ্ব (Free World) বলা হয়। নেতৃত্বদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র।

২। **দ্বিতীয় বিশ্ব ঃ** (কম্যুনিষ্ট বুক) ঃ রাশিয়া, চীন, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী ও পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশ এবং তার নেতৃত্বাধীন দেশসমূহ সমন্বয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব বা কম্যুনিষ্ট বুক। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের সর্বরহৎ কম্যুনিষ্ট দেশ—যা বর্তমানে খণ্ড বিখণ্ডিত। কম্যুনিষ্ট বুকের কোন কোন দেশ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে।

৩। **তৃতীয় বিশ্ব ঃ** এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র। এই অনুন্নত দেশসমূহকে পাশ্চাত্য জগৎ 'পশ্চাৎপদ বা দরিদ্র দেশ' না বলে 'উন্নয়নশীল দেশ' বলেন।

মদন মোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা' প্রথম ভাগে পড়েছিলাম ঃ

'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না,
তাহা বলিলে, তাহারা মনে বড় কষ্ট পায়।'

অনুরূপ, অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের খুশী করার জন্য কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখা হয়েছে বৈকি ! অবশ্যই আমাদের শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক

দিয়ে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করা কর্তব্য। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি (গড়ে ২·৯%) তৃতীয় বিশ্বের আরও একটি সমস্যা। দেশের উন্নতির জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এ-সব দেশের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থবিরতা জাতীয় উন্নতির মূলে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন। এ-সব দেশে বিদেশ থেকে অধিক পরিমাণ আমদানী করা হয়, কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ কম। ফলে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তা' ছাড়া দরিদ্র দেশ সমূহের বৈদেশিক ঋণ সাত হাজার কোটি ডলারেরও অধিক বলে জানা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশ-সমূহকে স্বনির্ভর হবার কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত।

কতিপয় রাজনৈতিক গোষ্ঠি বা জোট ঃ

১। আসিয়ান (ASEAN) ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। উদ্দেশ্য ঃ পরস্পর সহযোগিতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

সদস্যদেশ ঃ ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আসিয়ান দেশসমূহ অনেক উন্নত।

২। এ্যাপেক (এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের অর্থনৈতিক সংস্থা। কম্যুনিষ্ট অগ্রগতিরোধ প্রধান উদ্দেশ্য।

সদস্যদেশ ঃ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন, তাইওয়ান, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আসিয়ান দেশসমূহ (১নং দ্রঃ)।
মোট ১৫টি রাষ্ট্র এ্যাপেক জোটভুক্ত।

৩। সিয়াটো (SEATO) ঃ সাউথ ইষ্ট এশিয়া ট্রিটি অরগানিজেশন। ১৯৫৪ সালে গঠিত। সদস্যদেশ ঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান। সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি—কমিউনিজমের প্রসাররোধকল্পে।

৪। ন্যাটো (NATO) ঃ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানিজেশন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কতিপয় দেশ সমন্বয়ে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটন ডি, সি-তে চুক্তিবদ্ধ। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম—এই দশটি রাষ্ট্র নিয়ে সংস্থাটি গঠিত হবার পর নিম্নোক্ত আরও তিনটি রাষ্ট্র গ্রীস, তুরস্ক ও পশ্চিম জার্মানী সংস্থাটিতে যোগদান করে। বর্তমানে পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী একত্রীভূত হওয়ায়—পশ্চিম জার্মানীর পরিবর্তে শুধু জার্মানী হবে। কম্যুনিষ্ট আগ্রাসন থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে এই সামরিক মৈত্রী জোট গঠিত হয়।

৫। সার্ক (SAARC) ঃ সাউথ এশিয়া রিজিওন্যাল কন্ফারেন্স (দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলন)। ১৯৮৩ সালের ২রা আগষ্ট দিল্লীতে সংস্থাটির মূলনীতি গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এই সংস্থা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (১৯৭৭-৮০)। তাঁর সম্মানে সার্কের প্রথম অধিবেশন ১৯৮৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

সার্কভুক্ত দেশ ঃ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ দেশসমূহের সামগ্রিক উন্নতি ও নিরাপত্তা প্রধান উদ্দেশ্য।

৬। ওপেক (Oil Producing Countries) ঃ সৌদি আরব, আরব আমীরাত, ইরান, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি।

এক নজরে নিউইয়র্ক

আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্য—নিউইয়র্কের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি ঃ *

১। আয়তন ঃ ৪৭,৮৩১ বর্গমাইল (শুধু স্থলভাগ)। আভ্যন্তরীণ জলভাগের আয়তন ১,৭৪৫ বর্গমাইল। অতএব, মোট আয়তন ৪৯,৫৭৬ বঃ মাঃ। পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ৪৩২ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য ৩০৭ মাইল।

২। আটলান্টিক মহাসাগর সৈকত ১২৭ মাইল। মোট সামুদ্রিক সৈকত ৭৭৫ মাইল।

৩। প্রাকৃতিক হ্রদ সংখ্যা ঃ চার হাজারের অধিক।

৪। নদনদীর দৈর্ঘ্য ঃ ৭০,০০০ মাইল।

৫। নায়েগ্রা জলপ্রপাত ঃ উচ্চতা ১৮২ ফিট।

৬। সর্বোচ্চ ভবন (Sky Craper) ঃ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার (১১০ তলা), উচ্চতা ১৩৫০´ (টি, ভি, টাওয়ার বাদ) শিকাগো শহরে ১১২ তলা ভবন আছে ; উচ্চতা ১৪৫১´ (৩৪৪ টি, ভি, টাওয়ারসহ)।

৭। লোকসংখ্যা ঃ ১৭৫,৫৭,২৮৮ (প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ)।

৮। রাজধানী সিটি আলবানীর লোকসংখ্যা ঃ ১,০১,৭২৭।

৯। নিউইয়র্ক সিটির লোকসংখ্যা ঃ ৭,০৭১,৬৩৯।

১০। লোকসংখ্যার ঘনত্ব ঃ প্রতি বর্গ মাইলে ৩৭১ জন (নিউইয়র্ক ষ্টেটে)।

১১। ,, ,, ,, ঃ নিউইয়র্ক সিটিতে ঃ ২৩,৪৯৪ (প্রতি বর্গ মাইলে)।

১২। মোট সিটি সংখ্যা ঃ ৬২ (তন্মধ্যে নিউইয়র্ক সর্ববৃহৎ সিটি)।

১৩। থানার সংখ্যা ঃ ৭৫ ; শহর সংখ্যা ঃ ৯৩১ ; গ্রামের সংখ্যা ঃ ৫৫৭।

১৪। লোক-বসতি ঃ গ্রাম এলাকায় ঃ ১৫·৪% ; শহর এলাকায় ঃ ৮৪·৬%।

১৫। হাইওয়ে (রাজপথ) ঃ ১০৯,৪৮৫ মাইল ; নিউইয়র্ক শহরে ঃ ১৪,৬০৬ মাইল।

* বর্তমানে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪টিতে পৌঁছেছে বলে জানা যায়।

১৬। ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহন ঃ ৭৮ লক্ষ (প্রায়)।
১৭। বিমান অবতরণক্ষেত্র ঃ ৪৭১ (৩৬৫টি প্রাইভেট বিমানবন্দরসহ)। বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঃ জন, এফ. কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, নিউইয়র্ক, বৃহৎ আভ্যন্তরীণ সার্ভিসের বিমান বন্দর ঃ লাগুয়ারডিয়া (La Guardia)। (নিউয়ার্ক (Newark) বিমান বন্দর নিউজার্সী ষ্টেটে অবস্থিত)।
১৮। কৃষিফার্মের সংখ্যা ঃ ৪৯,০০০ ; কৃষি জমির পরিমাণ ঃ ৯১৯ মিলিয়ন একর।
১৯। প্রতিটি কৃষিফার্মের আয়তন ঃ ২০২ একর (গড়ে)।
২০। মদ উৎপাদন কারখানা ঃ ৫২টি (বৃহৎ)।
২১। উৎপন্ন মদের পরিমাণ ঃ ৩৪ মিলিয়ন গ্যালন। *১

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী প্রভাব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যা পঁচিশ কোটি। সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে খৃষ্টানদের পরেই ইহুদীদের স্থান। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও তাদের ভাষা, চালচলন, বেশভূষা, আদব কায়দা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে প্রচুর মিল পরিলক্ষিত হয়। উভয় জাতি ভদ্র, আত্মমর্যাদাশীল ও পরিশ্রমী। মনোভাবের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বলা যায়।

ইহুদী সম্প্রদায় নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, লসএঞ্জেলসের মত কয়েকটি জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণকেন্দ্রে নিজেদের সংখ্যাধিক্য ঘটানোর ব্যাপারে প্রয়াসী। এইসব এলাকায় তাদের সংখ্যা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমগ্র দেশেই তারা প্রভাবশালী। আমেরিকার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তারের জন্য গোষ্ঠিগত জনসংখ্যা প্রধান শক্তি। ইহুদী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নত। তাদের প্রতিপত্তির এটাও আর একটি কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ তথ্য

১। জাতীয় সঙ্গীত ঃ 'The Star Spangled Banner'—মারীল্যাণ্ডের বিশিষ্ট আইনজীবী ফ্রান্সিস স্কট কী কর্তৃক (১৮১৪ খৃঃ) রচিত। কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীতরূপে ১৯৩১ সালে গৃহীত।
২। স্বাধীনতা যুদ্ধ (Revolutionery war) ঃ বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকার তেরটি কলোনীয়াল ষ্টেটের যুদ্ধ (১৭৭৫—১৭৮৩ খৃঃ)। বৃটেনের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল উদ্দেশ্য।
৩। সিভিল ওয়ার ঃ আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে (১৮৬১—৬৫ খৃঃ) ক্রীতদাস প্রথা ও অর্থনৈতিক কারণে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের ষ্টেটস (নর্দার্ণ ইউনিয়ন) এবং দক্ষিণাঞ্চলের কনফেডারেল ষ্টেটস্

*১ Source : New york--by Suzanne Levert (1987).

স্বাধীনতা ঘোষণা করে কাগজের নোটের প্রচলন করে। নর্দার্ণ ষ্টেটটসের কারেন্সী নোট—১০ সেন্ট, ২০সেন্ট, ১ ডলার, ৩ ডলার, ৫ ডলার ও ১০ ডলার মূল্যের এবং কন্‌ফেডারেট ষ্টেটটসের ৫০ সেন্ট, ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ ডলারের নোট প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধে উত্তরাঞ্চল জয়লাভ করে। (পৃঃ ৩৮—৩৯ দ্রঃ)।

৪। লোকসংখ্যা ঃ ১৯৯০ সালের আদম শুমারী (Census) মতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ২৪,৮৭,১০,০০০। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা ৫২০ কোটি। এর অর্ধেক একমাত্র এশিয়া মহাদেশে বাস করে। উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক।

৫। ট্যাক্স ও কর ঃ আমেরিকার জনগণকে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। তন্মধ্যে আয়কর, শিক্ষাকর, সোস্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স, বিক্রয় কর, মৃত্যুকর, রোড ট্যাক্স ইত্যাদি প্রধান।

(ক) আয়কর ঃ বার্ষিক ৭০০০ ডলার আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় না। এর অধিক আয়ের জন্য মূল বেতনের ২৫% হতে ৪০% হিসেবে আয় অনুপাতে মাসিক বেতন হতে আয়কর কর্তন করা হয়।

(খ) বিক্রয় কর ঃ খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রীর উপর কোন বিক্রয় কর (Sale Tax) দিতে হয় না। খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর সাধারণতঃ বিক্রয় মূল্যের ৬% বিক্রয় কর দিতে হয়। স্থান বিশেষে বিক্রয় করের হার কিছু কমবেশী আছে। আয়কর ও বিক্রয় কর ফেডারেল কংগ্রেসের প্রাপ্য। শিক্ষাকর, পথ ও অন্যান্য কর ও লেভি অঙ্গরাজ্যের প্রাপ্য।

৬। ঋণ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতি গড় ঋণ ১৬ হাজার ডলার। মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। চাকুরীজীবীদের মাসিক বা সাপ্তাহিক বেতন হতে আয়কর ও ঋণের কিস্তি কর্তনপূর্বক বেতন প্রদান করা হয়।

৭। ডাক বিভাগ ঃ আধাসরকারী। ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট সরকারী।

৮। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ পর্বত ঃ রকি পর্বতমালা।

৯। যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম নদী ঃ মিসিসিপি (৮০৯৫ কিঃ মিঃ)

১০। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক ঃ নেড়ে মাথা ঈগল পাখী।

১১। সড়ক ও মহাসড়ক ঃ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সংযুক্তি মহাসড়ক ও ব্রীজ-সমূহ ফেডারেল সরকার নির্মিত। বিভিন্ন শহরের ও অঙ্গরাজ্যের আভ্যন্তরীণ সড়কসমূহ অঙ্গরাজ্য, সিটি করপোরেশন ও প্রাইভেট সেক্টর নির্মিত।

তিন মাস যাবৎ আমরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যতকিছু দেখেছি, তন্মধ্যে পথঘাট, ব্রীজ, টানেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাকে সর্বাধিক মুগ্ধ করেছে। ১১০ তলা (Sky Craper) বিল্ডিং দেখে আশ্চর্য হয়েছি, কিন্তু প্রশান্তি লাভ করিনি। আমার মতে পথঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিই জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি।

১২। আমেরিকার খনিজ সম্পদঃ কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, লোহা, সোনা, রূপা, তামা, সীসা, দস্তা, অ্যাসবেস্‌টস, চুনা পাথর প্রধান।

১৩। কৃষি সম্পদঃ (ক) গম, ভুট্টা, তামাক, ধান, আখ, বীট, কোকা, কফি, রাবার ইত্যাদি।

(খ) ফলমূলঃ আঙ্গুর, কমলা, আপেল, আনারস, কলা অন্যতম।

(গ) মূল্যবান কাঠঃ পাইন, স্প্রুস, বার্চ, ওক, মেপেল বিখ্যাত।

১৪। বন্যপশু সম্পদঃ শ্বেত ভল্লুক, হরিণ, আরমিন, সেবল, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, পিউমা, বাইসন (বন্যমহিষ) প্রভৃতি।

১৫। শিল্পঃ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। এখানে ইস্পাত শিল্প, বয়নশিল্প, মোটর কার, জলজাহাজ, এরোপ্লেন, কাগজ, সিমেন্ট ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

১৬। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিন জনের একজন মোটর কারের অধিকারী। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ।

১৭। বেরিং প্রণালী (৫৮ কিঃ মিঃ প্রশস্ত) উত্তর আমেরিকা ও সোভিয়েট এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত।

১৮। পানামা খাল, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে অবস্থিত।

১৯। কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীঃ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১১ জন কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসী আদিম অধিবাসী (রেড ইণ্ডিয়ানস)গণ সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া হতে আগত মঙ্গোলিয়ান জাতির বংশধর। বর্তমানে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

●

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

পাশ্চাত্যের সব দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা দেখে আমার মনে যে প্রতীতি জমেছে, তাই সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। উদ্দেশ্য উন্নত পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনা ক'রে যেন আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে পারি। পাশ্চাত্যের গ্রহনীয় ও বর্জনীয় উভয় দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিছু 'অপ্রিয় সত্য' বলার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চেয়ে রাখ্‌ছি।

১। **মৌলিকত্ব ঃ** কোন দেশের উন্নতির মাপকাঠি প্রধানতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ-সম্পদ, আহার, বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিক্ষার দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের শতকরা এক শ' জনই শিক্ষিত। সেখানে শুধু নাম লেখা জানা লোককে শিক্ষিত ধরা হয় না। সর্বনিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। সবার জন্য ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার বহণ করেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট পড়ার নিয়ম নাই বা প্রয়োজন হয় না। তাদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ মন প্রাণ ঢেলে শিক্ষা দান ক'রে থাকেন। তাঁরা ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসা করেন না। ছাত্রেরা কোন প্রকার রাজনীতিতে জড়িত হয় না; মনোযোগ সহকারে লেখা-পড়া ক'রে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্যতা অর্জন করাই তাদের মূল লক্ষ্য। পাঠ্যসূচী বহির্ভূত জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ আছে। এটা ছাত্রদের মেধা-বিকাশের সহায়ক।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের জনগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। স্বাস্থ্য গড়ার জন্য বাল্যকাল হতেই ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ক'রে থাকে। তারা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহন করে। পাশ্চাত্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের বা রোগাক্রান্ত লোক বিরল! কারো অসুখ হলে সরকারী খরচে চিকিৎসা করা হয়। সুস্বাস্থ্যের কারণে তাদের গড় পরমায়ু অনেক বেশী।

অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ বাসিন্দার আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত। অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবারও আছে। আমাদের দেশের ন্যায় গরীব বা অভাবী লোক নেই। তথায় কোন পেশাদার ভিক্ষুক নেই। ভিক্ষাবৃত্তিকে তারা অন্তর থেকে ঘৃণা করেন—যা' ইসলামের শিক্ষা। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অনেক দেশে পথেঘাটে ভিক্ষুকের ছড়াছড়ি।

পাশ্চাত্যের প্রতি বাড়ীতে অন্ততঃ একটি কার (Car), ফ্রীজ, ওয়াশিং মেশিন, হিটার, টেলিফোন, টিভি, বাথটাব, ঠাণ্ডা ও গরম পানির ট্যাপ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন (Rest room) ইত্যাদি আছে। কোন কোন পরিবারে ২/৩ খানা বা তারও অধিক কার, ভি, সি, আর, ফ্যাক্স ও বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি থাকে। মেশিনের সাহায্যে ঘরের মেঝে, কার্পেট, রাস্তা ঝাড়ু দেয়া হয়। সোফাসেট, কার্পেট, রেডিও, ট্রানজিস্টার ত' মামূলী জিনিষ, সবার ঘরেই থাকে। প্রত্যেক বাড়ীঘর ঝকঝকে তকতকে। কোন বাড়ীর দেয়ালে কোন কিছু লেখা বা পোস্টার-বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রতি কক্ষের দরজা, জানালায় নেট থাকায় মশামাছি, কীটপতঙ্গ প্রবেশ করতে পারে না। নেটের জানালার সঙ্গে আলো প্রবেশের জন্য আর একটি কাঁচের জানালা থাকে। দরজাও অনুরূপ। অনেক কক্ষে ডবল দরজা থাকে ঃ একটি নেট-বিশিষ্ট অপরটি কাঁচের। কোন কোন কক্ষে একটি মাত্র কাঠের দরজাও আছে।

কুলী, মজুর, কামার, কুমার, মেথর সবারই কার আছে। তারা যেখানে যে কাজেই যাক না কেন, নিজের কারে বা ট্যাক্সিতে যাতায়াত করে। হেঁটে চলা লোক রাস্তায় কচিৎ চোখে পড়ে।

শহর, গ্রাম, কৃষি খামার সর্বত্র সুন্দর পাকা রাস্তা রয়েছে। প্রতিটি রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক টুকরা ছেড়া কাগজ, গাছের পাতা, সিগারেটের টুকরা বা চিনা বাদামের খোসাও রাস্তায় দেখা যায় না।

সবাই পাকা ঘরে ও দালানে বাস করে। টিনের বা টালির চালাবিশিষ্ট উন্নতমানের একতলা বা দ্বিতল বাড়ী বসত এলাকায় বা গ্রামে দেখা যায়। অনেক বাড়ীর দেয়াল সম্পূর্ণ কাঠের। পারটিশন ওয়াল পারটেক্সের। কাঠের দেয়ালের উভয় পাশে পারটেক্স দেয়া থাকে দেখে মনে হয় পাকা দেয়াল। বসত এলাকায় অধিকাংশ ঘর দোচালা বাংলো প্যাটার্নের। চার চাল বিশিষ্ট ঘরও দেখা যায়। ছাদ বা চাল তৈরীর জন্য প্রথমে কাঠের ফ্রেম তৈরী ক'রে তার উপর হার্ডবোর্ড স্থাপন করা হয়। অতঃপর বোর্ডের উপর কাল রং-এর ক্রেপ কাগজ দিয়ে তার উপর টালি বা টিন বসান হয়। প্রতি বাড়ীতে ফুলের বাগান আছে।

তাদের প্রধান খাদ্য রুটি, স্যাণ্ডউইচ, শাকসব্জী, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী ও ফলমূল। পানির পরিবর্তে তারা দুধ, কোকাকোলা ও বিভিন্ন ফলের রস পান করে থাকে। চা, কফিও তাদের প্রিয় পানীয়। স্বাস্থ্য সম্মত খাবারের প্রতি তাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রী হয় না। কেউ খাবারদ্রব্যে ভেজাল মিশালে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২। যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত মানের। সুপ্রশস্ত রাস্তা, মজবুত ব্রীজ, ভূগর্ভস্থ ট্রেন ও নদীর তলদেশের টানেল পথ পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য। কোথাও কোন নতুন রাস্তা তৈরী করতে হলে

প্রথমে চার ফুট গভীর ক'রে মাটি কাটা হয়, অতঃপর পানি ঢেলে রোলারের সাহায্যে মাটি দাবানো হয়। তার উপর দেড় ফুট কাল মাটি ফেলে পানি ঢেলে পুনরায় রোলার করা হয়। তার উপর এক ফুট সাদা মাটি (সিমেন্টের ন্যায়) ফেলে পানি মিশিয়ে রোলার করে। তার উপর পাথর কুচি ফেলে পানি দিয়ে রোলার করার পর পিউমিক ষ্টোন ও এ্যাসফল্ট মিশিয়ে রোলার মেশিনের সাহায্যে রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়। মাটি কাটা ও পানি দেবার কাজ মেশিনের সাহায্যে করে। রাস্তা নির্মাণের পর কম্পিউটারের সাহায্যে রাস্তার দোষগুণ পরীক্ষাকালে কোথাও কোন দোষ দেখা গেলে ঠিকাদারকে রাস্তা খনন ক'রে সব তুলে ফেলে দিয়ে নতুনভাবে একই নিয়মে রাস্তা গড়তে হয়। কোন রাস্তা, ব্রীজ বা বিল্ডিং নির্মাণের পর দু'বৎসরের মধ্যে কোন দোষ দেখা দিলে বা ফাটল ধরলে ঠিকাদার নিজ খরচে মেরামত ক'রে দিতে বাধ্য থাকে। এজন্য ঠিকাদারের আংশিক বিল বা জামানত দু'বছর পর্যন্ত জমা রাখা হয়। ঠিকাদারদের লাভের হার অত্যন্ত কম। তাদের সঙ্গে কোন ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার বা তদারককারীর কোন ভাগ বা বখ্‌রার প্রশ্ন থাকে না। এখানে ঘুষ অচল।

রাস্তাসমূহ প্রশস্ত ও দীর্ঘ। হাজার মাইল বা তারও বেশী লম্বা হাই রোড আছে। রাস্তার মাঝে আইল্যান্ড এবং উভয় পাশে চারখানা করে গাড়ী পাশাপাশি উভয় দিকে চলার জন্য ট্রাক চিহ্নিত রয়েছে। রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা থাকায় রাত্রিকালে রাস্তাসমূহ দিনের ন্যায় আলোকিত থাকে। রাস্তায় পিলারের সঙ্গে আলো এবং নীচে রিফ্লেকটর সন্নিবেশিত আছে। দিনে আলো বন্ধ করা থাকে। সারা দিনরাত রাস্তায় গাড়ী চলে। কোন সন্ত্রাস, দস্যুতা বা রাহাজানির ভয়ভীতি নাই। এ-কারণে লোকে রাতভর নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারে।

রাস্তায় উভয় পাশে অসংখ্য গাছপালা আছে। খেজুর ও তালগাছ জাতীয় কিছুসংখ্যক গাছ দেখেছি। তাতে খাবারযোগ্য ফল হয় না। বৃহদাকার বৃক্ষের মধ্যে ওক, ঝাউ ও পাইন প্রধান। এ ছাড়া আরো অনেক অচেনা গাছ রয়েছে। আমেরিকার এক-চতুর্থাংশ আবাদী জমি ও বসত ভূমি। অবশিষ্ট শতকরা ৭৫ ভাগ পাহাড়, বনাঞ্চল ও মরুভূমি।

প্রত্যেক রাস্তায় ছোট বড় অনেক ব্রীজ আছে। ব্রীজ সমূহ বেশ মজবুত ও প্রশস্ত। ব্রীজের জন্য প্রত্যেক গাড়ী থেকে টোল আদায় করা হয়। কোন কোন স্থানে দু'তলা, তিনতলা ব্রীজও আছে। এক ব্রীজের উপরের রাস্তায় অন্য ব্রীজ, মাটির নীচের রাস্তায় ব্রীজ—এইভাবে একই স্থানে উপরে নীচে, তিনচারটি পর্যন্ত ব্রীজ দেখা যায়। এইসব ব্রীজ নির্মাণে যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তা' কল্পনাতীত। প্রত্যেক রাস্তার মাথায় বা মোড়ে নির্দেশক বোর্ডে রাস্তাটি কোথায় গেছে দূরত্বসহ লেখা থাকে।

৩। **যানবাহণ ঃ** কোন শহরের মধ্যে এবং এক শহর হতে অন্য শহরে যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস আছে। বাসগুলো আকারে বেশ বড়। সিট চওড়া। বাসের পিছনে টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা আছে। একটি বাসে যে কয়টি সিট থাকে, তার অতিরিক্ত একজন যাত্রীও তোলা হয় না। বাসষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাসে যে কয়টি সিট খালি থাকে, শুধু-মাত্র সেই কয়জন লাইনের প্রথম হ'তে গাড়ীতে ওঠেন, বাদবাকী অপেক্ষা করতে থাকেন আসনসংখ্যার অতিরিক্ত একজন যাত্রীও গাড়ীতে দাঁড়িয়ে বা গাড়ীর ছাদে দেখা যায় না। এইরূপ বে-আইনী কাজ তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে বহুল প্রচলিত, যেখানে আইনের শাসন নেই। প্রতি দুই মিনিট পরপর বাস আসে। সুতরাং লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সিট পান না, তাঁদের পরবর্তী বাস পেতে বড়জোর আর দু'মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। বাসে মেয়েদের জন্য কোন পৃথক আসন থাকে না। পুরুষ ও মহিলা যাত্রী পাশাপাশি বসেন। সার্ভিস বাসে মালামাল পরিবহণ করা হয় না। কোন ষ্টেশনে কখন বাস পৌঁছবে, তার সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে। দু'এক মিনিটও কমবেশী হয় না।

বাসে ড্রাইভার ছাড়া তার কোন সহকারী বা কণ্ডাক্টর থাকে না। ড্রাইভারের পাশে রাখা "কয়েন বক্সে" ভাড়ার পয়সা ফেললেই আপনা আপনি টিকিট বের হয়ে আসে। উক্ত টিকিট হাতে নিয়ে পাশে রাখা "ষ্ট্যাম্প মেশিনে" দিয়ে চাপ দিলে টিকিটে তারিখ ও সময়ের ছাপ উঠে। টিকিট দু'ঘন্টার জন্য বলবৎ থাকে। দু' এক হাজার মাইল দূরে যাতায়াতের জন্য পূর্বাহ্নে দূরপাল্লার বাস ষ্টেশন হতে টিকিট কিনতে হয়। এরূপ বাসের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অত্যন্ত আরামপ্রদ। এক নাগারে দুই তিন দিন বাস ভ্রমণ করলেও কোন প্রকার বিরক্তির ভাব মনে উদয় হয় না।

বাসে উপবিষ্ট যাত্রীগণ একে অপরের সঙ্গে কোন কথা বলেন না বা আলাপ করেন না। তাঁদের অধিকাংশই বই বা খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটান। দূরপাল্লার বাসের ষ্টেশন ৫০/৬০ মাইল পরপর বড় বড় শহরে ও সিটিতে। পথিমধ্যে কোন যাত্রী উঠা-নামার বিধান নাই। চা-নাস্তা ও লাঞ্চের জন্য বাস নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে আধঘন্টা বা একঘন্টা "ভ্রমণকার্ড" মোতাবেক অপেক্ষা করে। বাসের সিট পিছিয়ে দিয়ে আরামে ঘুমানো যায়। প্রত্যেক যাত্রীকে "ভ্রমণকার্ড" সরবরাহ করা হয়। কার্ড থেকে জানা যায়—কখন কোন ষ্টেশনে কতক্ষণের জন্য বাস থামবে। অনুন্নত দেশ-সমূহে বাসে ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর ও বিড়ম্বনাপূর্ণ। কেননা প্রায়ই দেখা যায় আসনসংখ্যার দ্বিগুণ বা তারও অধিক যাত্রী দাঁড় করায়ে ও ছাদে বহণ করা হয়। তা' ছাড়া সার্ভিস বাসে রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে গাড়ীর ছাদে মাল তুলতে ও নামাতে যাত্রীদের বহু সময় নষ্ট করা হয়। এক ঘন্টার পথ যেতে কোন কোন সময়

তিন ঘন্টা লাগে। চালক ও কণ্ডাক্টররা সময়ের কোন মূল্য দেয়না। এ-সব বিষয়ে কোন আইন বা নীতি আছে বলে মনে হয় না।

৪। **ট্রেন ব্যবস্থা ঃ** শহরের অধিকাংশ যাত্রী এক স্থান হতে অন্য স্থানে ট্রেনে যাতায়াত করে। ইংল্যাণ্ডে ভূগর্ভস্থ রেলকে 'টিউব লাইন' এবং আমেরিকায় 'সাব-ওয়ে' বলা হয়। সারা শহরে মাটির নীচে জালের ন্যায় বিস্তৃত ভূগর্ভস্থ রেল লাইন। এমনকি বিরাট নদীর তলদেশ দিয়ে ট্রেন, বাস ইত্যাদি যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত টানেল রয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোতে টানেল সমূহ সব সময় আলোকিত থাকে।

শহর হতে ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনে প্রবেশ পথেই টিকিট ঘর থাকে। সেখান থেকে যাত্রীদের টিকিট কিন্‌তে হয়। আমেরিকায় সাব-ওয়ের প্রতি টিকিটের মূল্য এক ডলার পনর সেন্ট। টিকিট কাগজের নয়। এটা একটি পিতলের চাক্‌তি মাঝে ফুটো বিশিষ্ট।

ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনে প্রবেশকালে গেটে তিন পা বিশিষ্ট একটি চাকা 'প্রবেশ পথ' বন্ধ রাখে। চাকার সঙ্গে রাখা "কয়েন বাক্সে" টোকেনটি ফেলামাত্র পথ খুলে যায় এবং একজন ভিতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ হয়। যতবার টোকেন ফেলা হবে, ততবার গেট খুলবে। একটি টোকেন ফেলে দু'জনের প্রবেশের কোন উপায় নাই। সারাদিন সাব-ওয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করা যায়, আর টিকিট কিন্‌তে হয় না। কিন্তু নীচের ষ্টেশন থেকে উপরে শহরে উঠ্‌লে বিনা টোকেনে আর নীচে যাওয়া যায় না কিন্তু "প্রবেশ পথ" বন্ধ রাখা চাকাটি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আসাকালে বাধা দেয় না।

ট্রেনে ওঠাকালে লাইন ধরে উঠ্‌তে হয়। ষ্টপেজ প্রতি ষ্টেশনে মাত্র ৩০ সেকেণ্ড। এর মধ্যে ওঠানামা শেষ করতে হয়। সুতরাং অবতরণকারী যাত্রীরা ষ্টেশন পাবার পূর্বেই দরজার নিকটে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ট্রেন থামামাত্র দরজা খুলে গেলে তারা নেমে পড়েন। নতুন যাত্রী ট্রেনে চাপেন। আবার ট্রেন চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা সমূহ আপনা আপনি বন্ধ হয় এবং পরবর্তী ষ্টেশনে ট্রেন থামলেই সব দরজা খুলে যায়। ট্রেন সমূহ বিদ্যুৎ-চালিত। মাটির নীচে দু'তিন শ' ফুট গভীরতায় হাজার হাজার মাইল সাব-ওয়ে রয়েছে। কোন কোন স্থানে এক লাইনের উপর আর এক লাইন, তার উপর অন্য লাইনে উপরে নীচে তিনটি ট্রেন ছুটে চল্‌তে দেখেছি।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্রেন ছাড়াও অনেক সিটিতে ট্রাম, মাটির বুকে চলা ট্রেন এবং শূণ্যপথে চলা ট্রেন (মনোরেল) আছে। কোন যানবাহণে ওঠানামা করতে ধাক্কাধাক্কি বা হৈহল্লোর নাই। কোন কণ্ডাক্টর বা সহকারীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কথা বা ঝগড়ার কারবার নাই। সবার জন্য একই ভাড়া। অনেকেই এক সঙ্গে অনেক টোকেন কিনে রাখেন। সেগুলো প্রয়োজনমত কাজে লাগান।

৫। বিমান ঃ আমেরিকার প্রতিটি বড় বড় শহরে অনেক বিমান বন্দর আছে। অধিক দূরত্বে যাতায়াতে সময় বাঁচানোর জন্য অধিকাংশ যাত্রী বিমানে ভ্রমণ করা পছন্দ করেন, যদিও বিমান ভাড়া অন্যান্য যানবাহণের তুলনায় অনেক বেশী। দেশের মধ্যে চলাচলের জন্য ডোমেষ্টিক সার্ভিসের বিমান ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। পাশ্চাত্যে বিমানের মালিক শুধু সরকারই নন। অনেক প্রাইভেট কোম্পানীর ও ধনাঢ্য ব্যক্তির নিজস্ব বিমান আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক লক্ষ প্রাইভেট বিমান রয়েছে।

নিউ ইয়র্কের জন, এফ, কেনেডী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বিশ্বে সর্ববৃহৎ। শুধু মাত্র নিউইয়র্ক সিটিতে ৩৬৫টি এয়ারপোর্ট সহ সর্বমোট ৪৭১টি ল্যাণ্ডিং স্পেস আছে।

আমেরিকায় 'বিুপ' নামে বড় রাবার-বেলুন দিয়ে তৈরী এক প্রকার প্লেন দেখেছি। তাতে সাত আটজন যাত্রী যাতায়াত করতে পারে। "বিুপ" ঘন্টায় দশ মাইল চলে। লম্বাকৃতি মোটা বেলুনের নীচে যাত্রীদের সিট ও ইঞ্জিন সন্নিবেশিত করে "বিুপ" তৈরী করা হয়। 'কনকর্ড' বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান। গতিবেগ ঘন্টায় সাড়ে তিন হাজার মাইল।

বাস, ট্রেন ও বিমান ছাড়াও জলপথে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহণের জন্য অসংখ্য লঞ্চ, ষ্টিমার, কার্গো ও জলজাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে। একলক্ষ টন বা তারও অধিক মালামাল, স্থানান্তরযোগ্য সামুদ্রিক বন্দর শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই তেরটি রয়েছে।

৬। প্রাইভেট ট্যাক্সি ঃ শহরের মধ্যে বা দশ বিশ মাইল নিকট দূরত্বে যাতায়াতের জন্য প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়। সঙ্গে ড্রাইভার থাকে। ড্রাইভার ছাড়া শুধু ট্যাক্সিও ভাড়া করা যায়। ভাড়ার জন্য তিন প্রকারের ট্যাক্সি থাকে। সবচেয়ে উন্নতমানের অধিক ভাড়ার ট্যাক্সি 'লিমোজিন'। মধ্যম ভাড়ার ট্যাক্সি 'ইয়ালো কার' (হলুদ রং এর)। অল্প ভাড়ার ট্যাক্সি 'লিবারী'। ড্রাইভারসহ ট্যাক্সির জন্য ভাড়া মিটাতে হয় না। ট্যাক্সির 'মিটার বক্সে' যা ভাড়া উঠবে, তাই দিতে হয়। অবশ্য ভাড়ার সঙ্গে কিছু বক্‌শিশ দিলে ড্রাইভার খুশী হয় এবং সালাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। বক্‌শিশ না পেলে যাত্রী 'অভদ্র' ভেবে মন ভার ক'রে চলে যায়। ড্রাইভার ছাড়া শুধু ট্যাক্সি ভাড়া করলে তা নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হয়। অন্যথায় মোটা জরিমানা লাগে।

৭। ট্রেনের নাম ঃ পাশ্চাত্যে ট্রেনের নাম সাধারণতঃ 'এ' হতে 'জেড়' (A—Z) পযন্ত অক্ষর সমূহ দ্বারা দেয়া থাকে। রেল ষ্টেশন সমূহের নাম নিকটবর্তী রাস্তার নামে বা এলাকার নামে হয়; যেমন, ইউনিয়ন টার্ণ-পাইক ও কিউ গার্ডেন নিউইয়র্কের দু'টি রেল ষ্টেশন। এ-গুলো মূলতঃ রাস্তা ও সংলগ্ন এলাকার নাম। মানুষের নামেও রেল ষ্টেশনের নাম দেখেছি যেমন—

রুজভেল্ট ষ্টেশন, কেনেডি ষ্টেশন ইত্যাদি। সার্ভিস বাসের নাম বা পরিচিতি প্রকাশ করা হয় অক্ষর এবং সংখ্যা দ্বারা। যেমন একটি বাসের নাম কিউ-১০। এ-টি কিউ এলাকায় গমনাগমণকারী দশ নম্বর বাস।

৮। কার পার্কিং ঃ কার পাকিং এর জন্য শহরের বিভিন্ন বাজার ও অফিস এলাকায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাকিং লন বা তিন চার তলা পর্যন্ত পাকিং ভবন থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও কার পাকিং এর স্থানাভাব প্রকট। কেননা যানবাহনের সংখ্যা অসংখ্য। শুধুমাত্র নিউইয়র্ক ষ্টেটে রেজিষ্ট্রিকৃত প্যাসেঞ্জার-বাহী গাড়ীর সংখ্যা ৭৮ লক্ষ (প্রায়)। নিউইয়র্কের জনসংখ্যা এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ।

স্থানাভাববশতঃ অধিকাংশ গাড়ী রাস্তায় পার্ক করে রাখা হয়। কেউ পাহারায় থাকে না। তবুও গাড়ী চুরি হয় না বা কেউ হাইজ্যাক করে না। কোন কোন জায়গায় গাড়ী পাকিং স্থানে পিলারের সঙ্গে 'মিটার বক্স' সেট করা থাকে। গাড়ী রাখার জন্য ঘন্টা প্রতি পঞ্চাশ সেন্ট হিসেবে মিটার বক্সে ফেলতে হয়। মিটারে টাইম রেকর্ড হতে থাকে। কেউ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ী না সরালে তাকে ২৫ ডলার বা অধিক জরিমানা দিতে হয়। জরিমানা মাফ হয় না। কারে বা ট্যাক্সিতে চলাকালে প্রত্যেক যাত্রীকে সিটবেল্ট বাঁধতে হয়। অন্যথায় জরিমানা আশি ডলার। সিটবেল্ট না বাঁধলে চলন্ত গাড়ী হঠাৎ থামলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এ সতর্কতা।

৯। বাস দুর্ঘটনা ঃ পাশ্চাত্যে বাস দুর্ঘটনা ঘটেনা বললেই চলে। গাড়ীর চালকগণ অত্যন্ত দক্ষ ও দায়িত্বশীল। তারা সাবধানে গাড়ী চালায়। গাড়ীর গতিবেগ শহরের বাইরের রাস্তায় প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে ষাট মাইল। শহরের মধ্যে ৩৫ থেকে ৪৫ মাইল বেগে গাড়ী চালানোর বিধান। কোন স্থানে কত বেগে গাড়ী চালাতে হবে তার নির্দেশ রাস্তায় সাইন বোর্ডে লেখা থাকে। শহরের মধ্যে কোথাও গাড়ী থামালে চালক এমনভাবে গাড়ী রাখে, যেন মানুষের পথ চলতে বা কোন গাড়ী পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। অনুন্নত দেশ সমূহে রিক্সা, ভ্যান, বাস, ট্রাক প্রায়ই রাস্তা জাম করে অপরের চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। পাশ্চাত্যে কোন যানবাহণ চালক দুর্ঘটনা ঘটালে এবং তজ্জন্য কারো ক্ষতি হলে বা মৃত্যু ঘটালে চালককে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্তির ভয়ে রাস্তায় লক্ষ লক্ষ গাড়ী চলাচল করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে না। অথচ অনেক অনুন্নত দেশে দুর্ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কঠোর শাস্তির বিধান না থাকার কারণেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ—বাসের লাইসেন্সে যে আসন সংখ্যা নির্দ্ধারিত থাকে তার দ্বিগুণ, তিন গুণ যাত্রী বহণ করা হয়—সিটে, দাঁড় করায়ে এবং বাসের ছাদের উপর। শাসন কর্তৃপক্ষ এই বে-আইনী কাজ দেখেও কেন প্রতিকার করেন না—এটা রহস্য-জনক। অপর দিকে লাগামহীন ভাড়াবৃদ্ধি এবং যাত্রীবাহী বাসে মালামাল উঠানো যাত্রীদের জন্য চরম ভোগান্তির কারণ।

১০। **অফিসের সময়ঃ** আমেরিকায় অফিসের সময় সকাল ৭টা হ'তে বিকেল তিনটা পর্যন্ত অথবা সকাল ৮টা হ'তে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আট ঘন্টার মধ্যে অর্ধ ঘন্টা টিফিনের জন্য বরাদ্দ থাকে। কেউ আধঘন্টার মধ্যে টিফিন করে কাজ শুরু করতে না পারলে বা টিফিনে অতিরিক্ত সময় লাগালে তাকে অফিস সময়ের পরে অতিরিক্ত সময়টুকু কাজ করতে হয়। অধিকাংশ কর্মচারী বাড়ী থেকে 'টিফিন বক্সে' নাস্তা নিয়ে অফিসে যান এবং টিফিনের সময় অফিসে বসেই নাস্তা করেন। কেউ অফিসে গল্প ক'রে, বই বা খবরের কাগজ পড়ে, চিঠি লিখে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাইরে যেয়ে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করেন না। তাঁরা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ।

অফিস কর্মচারীগণ সেবার মনোভাব নিয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তাই তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, কাজে ফাঁকি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাকার অপরাধপ্রবণতা নাই। তাঁদের কর্তব্যপালনে আন্তরিকতা এবং উদার মনোভাব অতীব প্রশংসনীয়। অপরপক্ষে, অনুন্নত দেশসমূহে ঘুষ ও দুর্নীতি তাদের হীনমানসিকতার প্রমাণ। এরূপ দেশে এমন অনেক অফিস আছে, যেখানে বেতন না পেলেও চাকরী করা লাভজনক, কেননা বেতনের চেয়ে তাদের 'উপরি আয়' বা ঘুষ বহুগুণে বেশী। তাদের অন্তরে দেশাত্মবোধ ও ধর্মীয় চেতনা না থাকায় ঘুষ খেতে তারা সিদ্ধহস্ত। পাশ্চাত্য জগতে এরূপ কল্পনাতীত।

১১। **ঘুষ প্রথাঃ** পাশ্চাত্যে কোন অফিসে ঘুষের কারবার আছে—এমন প্রমাণ পাই নাই। ঘুষ খাওয়ার মত হীনমনোবৃত্তি তাদের নেই। ধর্ম পালনের দিক দিয়ে অনেকের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা থাকলেও আইন মেনে চলার ব্যাপারে তারা পাহাড়ের ন্যায় অচল, অটল।

কোন কর্মচারীর নিকট কোন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বা বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা এম, পি, কোন ব্যাপারে সুপারিশ করেন না। সুপারিশ আইনতঃ অবৈধ। অফিসে কোন কাজে গেলে তাদের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যত সম্মানীত ব্যক্তিই হন না কেন, তাঁর সামনের লোকদের কাজ শেষ করার পর তাঁর কথা শোনা হয়। এর ব্যতিক্রম হয় না। সর্বত্র কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মানা হয়। আগন্তুক যত মর্যাদাবান লোকই হোক না কেন, কোন কর্মচারী নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে বসতে দেন না। তাঁদের কাছে ব্যক্তির চেয়ে কর্তব্য বড়। কর্মচারীগণ মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন। অফিসের এককক্ষে দু'তিন জন কর্মচারী বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন; তাঁদের অধিকাংশই মহিলা। তারা কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ করায় দশজনের কাজ একজনে করতে পারেন।

১২। **সত্যনিষ্ঠাঃ** পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। তারা মিথ্যা বলতে ঘৃণাবোধ করেন। এমনকি কেউ কোন কারণে কাউকে

খুন করলেও তা' গোপন করেন না। কোর্টে উপস্থিত হ'য়ে স্বীকার করে কেন তাকে খুন করেছে। তার উক্তি মোতাবেক বিচার হয়। সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষিত হয়। অপরাধী বিনা দ্বিধায় শাস্তি গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের যেকোন মামলার রায় দুই একদিন শুনানীর ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক মামলা দশ বিশ বৎসর বা তারও অধিককাল ধরে চলে। কোন কোন সত্ত্বের মামলা দুই তিন পুরুষ পর্যন্ত চলে। এ-কারণে দেখা যায়, বিভিন্ন কোর্টে দশ বিশ বৎসরের কয়েক হাজার মামলা নিষ্পত্তি না হয়ে জমতে থাকে। আইন শাস্ত্রে বলে—'Justice delayed is justice denied' অর্থাৎ বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা অবিচারের সামীল।

ফ্লোরিডায় একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম। কোন ব্যাংকের এক মহিলা কর্মচারীর কয়েক হাজার ডলার কোন কাজে প্রয়োজন পড়ে। মহিলাটি কারো কাছে হাওলাত না পেয়ে তার ব্যাংকের কয়েকজনের একাউন্ট থেকে তার নিজের একাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ট্রান্সফার করেন এবং উক্ত টাকা তুলে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটান। বিষয়টি ধরা পড়ে না। কিছুদিন পর মহিলাটি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু পরের অর্থ আত্মসাতের কারণে বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি ব্যাংকে গিয়ে নির্দিষ্ট একাউন্ট সমূহে হস্তান্তরিত টাকা জমা দেন। অতঃপর কোর্টে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়। মহিলাটি জেলখানায় প্রবেশকালে বলেন, আজ আমি অন্তরে পরম শান্তি পাচ্ছি, কেননা পরকালে আমার অপরাধের জন্য মহান স্রষ্টার নিকট ক্ষমা পাবার আশা করতে পারি।

১৩। **স্পষ্টবাদিতা ঃ** পাশ্চাত্যের জনগণের একটি প্রশংসনীয় দিক ভদ্রতা ও স্পষ্টবাদিতা। অভদ্র ব্যবহার বা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ তাঁদের নীতিবহির্ভূত। কাউকে উচু গলায় বা চেঁচিয়ে কথা বল্‌তে শুনিনি। যানবাহনে, অফিসে, বাড়ীতে কোথাও ঝগড়া ঝাটি নাই। তারা মুক্ত মনের অধিকারী। তাদের মধ্যে কোন প্রকার কুটিলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলচাতুরী ও কুৎসা রটনার প্রবণতা নেই। পাশ্চাত্যের কোন পুরুষ বা মহিলা কাউকে পছন্দ না করলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়—'আমি তোমাকে পছন্দ করি না, আমার কাছে আর এসোনা।' কারো পশ্চাতে নিন্দা করা তাদের স্বভাববিরোধী। কোন জাতি তাদের গুণপনার জন্য উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করে থাকে। পাশ্চাত্য জগৎ তা' প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১৪। **সৌজন্যবোধ ঃ** পথ চলতে বা কোথাও কোন মহিলার সঙ্গে কোন পুরুষের যদি হঠাৎ গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, পুরুষটি 'দুঃখিত (Sorry) বললেই মহিলাটি কিছু মনে করেন না; একটু হাসি দিয়ে তার পথে চলে যান। কিন্তু 'দুঃখিত' না বললে মহিলাটি মনে মনে লোকটিকে 'অভদ্র' ভেবে মন খারাপ করেন, অথবা এজন্য আশে পাশের লোকেরা পথিককে ধরে গোলমালও করতে পারে।

কোন বাড়ীর উপর তলায় যারা বাস করে, তারা তাদের শিশুদের মার্বেল বল বা শব্দ হয় এমন কোন খেলনা দিয়ে খেলতে দেয় না, কারণ শব্দে নীচের তলার লোকদের লেখাপড়ায় বা কাজে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অনুরূপ নীচের তলার ছেলেমেয়েদেরও বাড়ীর লোকেরা শব্দ করে খেলতে বা চেঁচামেচি করতে দেয় না, যেন পাশের বা উপর তলার কারো অসুবিধা না হয়। এদিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সতর্ক। তারা অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা বলেন। দুই পরিবার অনেক দিন পাশাপাশি বাসকরা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর আলাপ পরিচয় হয় না। একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়াকে অনেকেই অপছন্দ করেন।

বিভিন্ন ধর্মের লোক পাশাপাশি বাসকরা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সবাই নির্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ বা হানাহানি নেই। মসজিদ, মন্দির গীর্জা, ইত্যাদি নির্মাণে ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকার অকৃপণ হাতে সাহায্য ক'রে থাকেন।

১৫। **জাতীয় ঐক্য ঃ** পাশ্চাত্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি তাদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রধানতঃ এ-কারণেই তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। যে দেশে জাতীয় ঐক্য নাই, সে-দেশ কোনদিনও উন্নতি করতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নের পূর্বসর্ত একতা, সংহতি ও মমত্ববোধ। পাশ্চাত্যজগৎ এদিক দিয়ে হুঁশিয়ার। কোনমতেই তারা জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে দেন না। কিন্তু উন্নয়নশীল অনেক দেশে সম্যক জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ না থাকায় বিশ্বসভায় তাদের স্থান পিছনের সারিতে। দেশে যাদের মর্যাদা নেই, তাদের পক্ষে বিদেশে মর্যাদার আশা করা বৃথা।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও বেশভূষায় প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা থাকে। পাশ্চাত্যে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তাদের একই রূপ পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরণ। তারা কোন অবস্থাতেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে অপর জাতির অনুকরণ করেন না। এমনকি ভাষার দিক দিয়েও এটা লক্ষ্যণীয়।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী। তাদের একই মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও জাতি হিসেবে তারা আলাদা। ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ ইংরেজ বা বৃটিশ, আর আমেরিকার নাগরিকগণ আমেরিকান। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে আমেরিকার ইংরেজী অনেক শব্দের বানানে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইংরেজগণ Centre, Programme, Honour, Night, Committee, Cheque, High লেখেন, সে-ক্ষেত্রে আমেরিকানগণ Center, Program, Honer nite, Comity, Check, Hi লেখেন। মাতৃভাষা এক হলেও পৃথক জাতির কারণে এই পার্থক্য গড়ে তোলা হয়েছে।

অনুরূপ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা বাংলা, আবার ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দাদের মাতৃভাষাও বাংলা। কিন্তু পৃথক দেশের

কারণে দু'দেশের ভাষার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান। এ-কারণে এখানকার বাংলা ভাষায় আরবী, উর্দু ও পারসী শব্দ দিদার ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষা অনুরূপ শব্দ বর্জিত এবং তাতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রকাশ সুস্পষ্ট। জাতীয়তা দেশভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক নয়। তাই বাংলাদেশের নাগরিকগণ জাতি হিসেবে 'বাংলাদেশী' এবং পশ্চিম বঙ্গের নাগরিকগণ ভারতীয়,—যদিও প্রদেশ ভিত্তিতে তারা নিজদিগকে 'বাঙ্গালী' বলে থাকেন। বাংলাদেশের কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃত বহুল বাংলাভাষা এবং তথাকার সংস্কৃতি অনুকরণ ক'রে নিজদিগকে 'বাঙ্গালী' বলে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করেন। ইসলামের প্রতি তাঁদের অনীহা থাকা স্বাভাবিক; কেননা তাঁদের মন ও মগজ গড়ে উঠেছে অন্য ধাঁচে।

১৬। জাতীয়তাবোধ ঃ নিজেদের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে তুলে ধরা এবং অপর দেশ বা জাতির স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাতিকে মহীয়ান ও গরীয়ান করে। এ দিক দিয়ে পাশ্চাত্য জগত যদিও সচেতন, তবুও পক্ষপাতিত্বের কারণে বিশ্বের সার্বিক উপলব্ধি তাদিগকে সমর্থন জোগাতে পারছে না। উদাহরণ স্বরূপ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল এবং মুসলিম বাসভূমি ফিলিস্তিন, লেবানন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এ-কারণে অনেকেই ভাবেন—পাশ্চাত্য জগৎ মুসলিমবিদ্বেষী; কিন্তু এ-কথা পুরোপুরি মানা যায় না, কেননা পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুসলমানগণ শান্তির সঙ্গে বসবাস করছেন।

মুসলমানদের কাছে পাশ্চাত্য চিরঋণী—এই ঐতিহাসিক সত্য তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। ইউরোপ আমেরিকা যখন বর্বরতার অন্ধকার যুগে ছিল, তখন ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আলো তাদের পথ চলতে সাহায্য করে। একদিন মুসলিম জাহান সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞান বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করেছিল। বিশ্বের শিক্ষাগুরু মুসলমান জাতি—এ কথা সমগ্র বিশ্ব চিরকাল অবনত মস্তকে স্বীকার করবে। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শণ, ধর্ম, সংস্কৃতি সর্বস্তরে মুসলমানদের কাছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আদিপাঠ শিক্ষা করেছে। এদিক দিয়ে মুসলিম জাতি নিজদিগকে বিশ্বের শিক্ষাগুরু বলে দাবী করতে পারেন।

ইংরেজদের জাতীয়তাবোধের প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ্য ঃ ভারত উপমহাদেশে মুঘল সম্রাটদের শাসন আমলে ইংল্যাণ্ডের 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ভারতে ব্যবসা করতে আসেন। এজন্য তাদিগকে শুল্ক প্রদান করতে হোত। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁর কন্যা জাহানারা হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হন। ইংরেজ চিকিৎসক ডাঃ গ্যাব্রিল বাওটনের চিকিৎসায় সম্রাট তনয় নিরাময় হ'য়ে উঠেন। সম্রাট ডাক্তারকে পুরস্কৃত করতে চান; কিন্তু মিঃ বাওটন

কোন পুরস্কার গ্রহণ না ক'রে ইংরেজ জাতির জন্য ভারতে বিনা শুল্কে ব্যবসা ও কুঠি স্থাপনের অনুমতি চান। সম্রাট মঞ্জুর করেন। পরিণামে তাঁরা সমগ্র ভারত দখল ক'রে দু'শ বছর ধরে দেশটি শাসন করেন।

১৭। **শ্রমের মর্যাদা ঃ** পাশ্চাত্যে আঠার বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক সকল মহিলা ও পুরুষ বিভিন্ন অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ক্লিনিকে, দোকানে ও কারখানায় কাজ করে। তারা কঠোর পরিশ্রমী। মহিলাগণ অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও টোল আদায় ও চুল কাটার কাজ করে। কারখানার অধিক পরিশ্রমের কাজে সাধারণতঃ পুরুষেরা নিয়োজিত থাকে।

বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লম্বা ছুটিতে হোটেল, মোটেল, রেঁস্তরা ও দোকানে অস্থায়ীভাবে কাজ ক'রে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য অর্থোপার্জন করে। যত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের ছেলেমেয়েই হোক না কেন, কাজ করাকে তারা অমর্যাদার মনে করে না। অভিভাবকদের তরফ থেকে তাদের কাজ করতে বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহিত করা হয়।

প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা নিজের কার নিজে চালায়। ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য তাদিগকে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। ড্রাইভারের অত্যধিক বেতনের জন্য তারা ড্রাইভার রাখা সমীচীন মনে করে না।

পাশ্চাত্যের মহিলাদের কর্মদক্ষতা ও কর্মোদ্যম অন্যান্য দেশের মহিলাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁরা বাজার, ঘরকন্যা রান্নাবান্না, সন্তান পালন ছাড়াও অফিসে কাজ করেন। তাদের সংসারে কোন চাকর-চাকরাণী বা বয় বাবুর্চি থাকে না; গৃহকর্তা ও গৃহকর্তী মিলে সংসারের সকল কাজ ক'রে উভয়েই সময়মতো অফিসে যায়। নিয়মানুবর্ত্তিতা তাদের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

১৮। **ঋণদান ঃ** পাশ্চাত্যে জনগণের মধ্যে প্রচুর ঋণ দানের ব্যবস্থা আছে। গৃহীত ঋণ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের জন্য উপার্জনের পথও রয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদের বেতন হতে মাসিক কিস্তিতে ২০/২৫ বছরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ হ'য়ে যায়। ফলে, তাদের পক্ষে ঋণ আদৌ বোঝা বলে বোধ হয় না। আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হলে যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গিয়ে বাস করে তারা ঋণ নিয়ে বা কিস্তিচুক্তিতে বাড়ী, গাড়ী, ফ্রীজ ইত্যাদি কিনে রাজার হালে দিন কাটায়। ঋণের অর্থ পরিশোধ করা তাদের জন্য কোন সমস্যাই হয় না।

আমাদের দেশে এককালে মহাজনেরা অভাবগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে উচ্চহারে সুদে টাকা লগ্নি দিতেন। শেষে দেখা যেত দু'তিন বছরের মধ্যেই ঋণের অংক সুদেআসলে দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে পড়েছে। ঋণজর্জরিত কৃষককে নিজের বাড়ীঘর, ভিটেমাটি, থালা-বাসন সবকিছু বিক্রী ক'রে ঋণ পরিশোধ করতে হোত। ঋণ পরিশোধের পর অনেকেই পথে বসতো। অবিভক্ত বাংলার উদার প্রাণ প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ঋণশালিসী বোর্ড

গঠন ক'রে কৃষকদের ঋণের কবল থেকে উদ্ধার করেন। এজন্য দেশবাসী চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

আজ পুরাতন মদ নতুন বোতলে পরিবেশনের ন্যায় দেশের অনেক ব্যাংক বা সংস্থা ঋণ দানের ব্যবসা শুরু করেছে। অভাবের দরুণ কৃষকেরা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; কিন্তু এটা যে তাদের জন্য মাছের বরশী গলাধঃকরণের সামীল, তা' তারা বুঝতে পারে না। বোঝে তখন, যখন ঋণের টাকা সুদে-আসলে দ্বিগুণ তিন গুণ বা তারও বেশী হ'য়ে পড়ে। অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ঋণ গ্রহণ সাময়িক উপকারী হলেও—এতে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। বরং ঋণ তাদের সর্বনাশই ডেকে আনে।

অতীতের ঋণদাতা মহাজনের স্থলে নতুন নতুন মহাজনের সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে দেখা যায়, ধনাঢ্য শিল্পপতিদের অনেকেই কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ ক'রে নিশ্চিন্তে দিন কাটান। তাঁদের নিকট হতে সুদসহ ঋণের টাকা কি পরিমাণ আদায় হয়, তা' একমাত্র ভবিতব্যই জানেন। অনাদায়ী ঋণের জন্য দেশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অনেক বড় বড় রুই কাতলা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, আর মরে চুনোপঠিরা। অনেক ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে জানা যায়, অসাধু কর্মচারীদের কারসাজিতে অজস্র টাকা মিথ্যা লোন বিতরণ করা আছে—যার কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঋণদানের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘাপলা অত্যন্ত অশুভ ও মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

১৯। পরিবেশ দুষণ ঃ আবহাওয়া ও পরিবেশ যেন কোনক্রমেই দুষিত হতে না পারে, পাশ্চাত্যের জনগণ তৎপ্রতি বিশেষ সচেতন। কোন বাড়ীর অঙ্গন, অফিস বা দোকান প্রাঙ্গনে কোন ময়লা বা আবর্জনা দেখা যায় না। সবাই ডাষ্টবিনে আবর্জনা ফেলে এবং তা' নিয়মিত অপসারণের ব্যবস্থা আছে। একটুকরা বাদামের খোসাও কেউ বাইরে বা রাস্তায় ফেলে না। ফেললে তার শাস্তি পঞ্চাশ ডলার জরিমানা। রাস্তায় থুথু বা কফ ফেললে আরো অধিক জরিমানা দিতে হয়।

প্রতি বাড়ীতে প্রায় সব কক্ষেই স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও বাথরুম থাকে এবং তা' প্রতিদিন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। অনুন্নত দেশের পল্লীতে রাস্তার পাশের কাঁচা পায়খানা ও পানির মধ্যে মল মূত্র ত্যাগের কথা পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের ধারণার অতীত। আমাদের অজ্ঞ মূর্খ সমাজ আদৌ ভাবে না—এরূপ পরিবেশ দুষণকারী কাজের জন্য জাতির কিরূপ মারাত্মক ক্ষতি হয়। অনুন্নত দেশের অশিক্ষিতা মেয়েরা বাড়ীর শিশুদের রাস্তায় পায়খানা করতে পাঠায়। ফলে বাতাসে রোগজীবানু ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। এ-কারণে পল্লীর জনগণ অল্প বয়সেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা কর্তৃপক্ষ এরূপ অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

২০। **ডাষ্টবিন ঃ** পাশ্চাত্যের প্রতি শহর ও গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে, পথে ঘাটে ও পার্কে সর্বত্র ডাষ্টবিন (ময়লা আবর্জনা ফেলার পাত্র) থাকে। তার মধ্যে সবাই সব রকম জঞ্জাল ফেলে। এমনকি দু'তিন বৎসর বয়স্ক ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত চিনা বাদামের খোসা, আইসক্রীমের কাঠি বা কাগজ নিজের হাতে ডাষ্টবিনে ফেলে আসে। পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাদের শিশুকাল থেকেই এরূপ করতে শিক্ষা দেয়। কেউ ছেড়া কাগজ ও ঠোঙ্গা রাস্তায় ফেলে রাস্তা নোংড়া করে না। কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন ডাষ্টবিন পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

২১। **রাজনীতি ঃ** পাশ্চাত্যের জনসাধারণ রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি বা হৈ চৈ করেন না। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল ও দলের কর্মীগণ রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন। ইংল্যাণ্ডে (১) লেবার পার্টি ও (২) কনজারভেটিভ (রক্ষণশীল) পার্টি এবং আমেরিকায় (১) ডেমোক্রেটিক পার্টি ও (২) রিপাবলিকান পার্টি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। পার্টির সমর্থক ব্যতীত ভোটারগণ প্রার্থীর যোগ্যতা, গুণাগুণ ও দলের আদর্শ বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠ প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন।

ছাত্রছাত্রীগণ কোন প্রার্থী বা দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করে না। তারা নিজেদের লেখাপড়া নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে। কোন প্রার্থীর জন্য ক্যানভাস করতে যাওয়া তারা অসম্মানজনক এবং সময়ের অপচয় মনে করে। মনোযোগসহ লেখাপড়া করায় ছাত্রজীবনে তারা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ক'রে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়।

২২। **নির্মল বাতাস ঃ** পাশ্চাত্যের বাতাসে ধূলোমাটি বা বালুকণা নাই বললেই চলে। এজন্য একই বস্ত্র সাত দিন পরিধান করলেও ময়লা হয় না। ঠাণ্ডা দেশহেতু শরীর ঘামে না। অত্যধিক পরিশ্রমেও দেহে ক্লান্তি আসে না।

কিন্তু সে দেশেও নির্মল বাতাস কতিপয় কারণে দূষিত হ'য়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। সিগারেট বা তামাকের ধূম্র, চিমনির ধূয়া ও মোটর যানের কালো ধূয়া এবং গ্রীণহাউস (Conservatory wastage) প্রতিক্রিয়া চরম বিপর্যয়ের কারণ। এ-থেকে বিভিন্ন রোগ বিস্তার লাভ করে। গাড়ীর কালো ধূয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। মোটর যানে 'গ্যাসোলিন' ব্যবহার করা হ'লে কালো ধূয়ার ক্ষতির হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। জরুরী ভিত্তিতে 'গ্যাসোলিন' ব্যবহারের প্রচলন করা কর্তৃপক্ষের একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বিশ্ব একদিন রোগের আকরে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার ক্ষতি আরও ব্যাপক। এর দরুণ সমুদ্রের উচ্চতা এবং বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে আবহাওয়া পরিবর্তন, অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, জলস্তম্ভ, ঝড় ইত্যাদি হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতশৃঙ্গ হতে বরফ

গলে অসময়ে বন্যা ও অতিবন্যা ঘটাতে পারে।

ভারতের ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশ একদিকে বর্ষাকালে অস্বাভাবিক বন্যার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হচ্ছে; অপরদিকে গ্রীষ্মে পানি অভাবে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে।

গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলার জন্য ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন বান্ছনীয়। বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ সরকার ও জনগণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও 'সিয়ারস' পরিচালিত গবেষণায় জানা গেছে, গত দশবৎসরে প্রতি বৎসর গড়ে আট মিলিমিটার সামুদ্রিক উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বসংস্থার বিষয় সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ বান্ছনীয়।

২৩। হাসি মুখঃ পাশ্চাত্যের পুরুষ ও মহিলাদের মুখমণ্ডলে প্রায়ই উজ্জ্বল হাসির ঢেউ খেলে। 'মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন' বাংলার কবি লিখে গেলেও এর বাস্তব রূপায়ন খুঁজে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য জগতে। তাদের মুখ দেখেই চিন্তাহীন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তার বলীরেখা কারো কপালে দেখিনি। আমোদ স্ফূর্তিতে তাদের জীবন-যৌবন কেটে যায়। কোন এক দার্শনিক বলেছেন, 'হাসি মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করে।' মনে হয় এটা তাঁরা সবাই ভাল করেই জানেন। সম্মান বা প্রশংসা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না; অর্জন করতে হয়। এটা অর্জনের স্পৃহা তাদের মধ্যে ষোলকলায় বিরাজমান।

২৪। কৃষি খামারঃ আমেরিকায় বিরাট বিরাট কৃষি খামার আছে। অল্পসংখ্যক লোক কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। তথাকার কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত। তাদের বাসস্থান বা ফার্ম হাউসে শহরবাসীদের ন্যায় সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে। সর্বত্র পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির ব্যবস্থা আছে। বাড়ীঘর পাকা। তাদের কার, ট্রাক, ফ্রীজ, টেলিফোন, হিটার এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, হ্যারো, কাটিং মেশিন, থ্রাশিং মেশিন ইত্যাদি সবারই রয়েছে। এক একটি কৃষিফার্ম দুই তিন শ' একর জমি নিয়ে। যন্ত্রের সাহায্যে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। এমনকি মাটিকাটা, গাভী দোহন, ঝাড়ু দেয়া, রান্না করা, তরকারী কাটা সব কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হয়।

কৃষিজাত ফসল সমূহের মধ্যে গম, ভুট্টা, আখ, তুলা, তামাক, ধান, কফি, রাবার, চা, কাঠ, ফলমূল ও সাকসবজি উল্লেখযোগ্য। ফলের মধ্যে অরেঞ্জ আঙ্গুর, মাল্টা, আপেল, পিয়ার্স, চেরী, পীচ, প্লাম, কিউই, এ্যাভোক্যাডো, হানিমেলন, আনারস ও কলা প্রধান।

কৃষিকাজ ব্যতীত পশু পালন তাদের একটি অর্থকরী ব্যবসা। পশু পালনের জন্য আমেরিকায় অনেক চারণ ভূমি রয়েছে। প্রধানতঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ও শূকর তাদের গৃহপালিত পশু।

২৫। শিল্প কারখানা ঃ পাশ্চাত্য জগত শিল্প ও কলকারখানায় বিশেষ উন্নত। সূচ থেকে শুরু ক'রে মটর, প্লেন, রকেট, জলজাহাজ, সাবমেরিণ, বিবিধ সমরাস্ত্র—এককথায় সবকিছু তথায় তৈরী হয়। কৃষি অপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োজিত থাকে। শিল্পের প্রসারহেতু বেকারদের কর্ম-সংস্থান সহজেই হয়ে থাকে। এ-কারণে পাশ্চাত্যে বেকারের সংখ্যা কম।

আমাদের দেশ শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত। কলকারখানা হতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে শতকরা মাত্র নয় ভাগ। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতে যথাক্রমে শতকরা পনর, সতর ও উনিশ ভাগ। শিল্পের প্রসার ভিন্ন দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের বিকল্প পথ নেই। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর ক'রে কোন দেশ চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করতে পারে না। বিবিধ সমস্যার কারণে আমাদের দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হ'তে চলেছে। এ-কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকাজের পরিবর্তে চাকুরী ও ব্যবসার প্রতি অধিক মনোযোগী। বর্তমানে সেচপ্রথায় চাষ-আবাদে কৃষকদের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, কৃষিজাত ফসলের উপযুক্ত মূল্য না থাকায় লাভ দূরের কথা, খরচ পোষানই তাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ-কারণে কৃষকসমাজ দিনে দিনে হীনবল হয়ে পড়ছে। শিল্পক্ষেত্রেও মন্দা দশা বিরাজমান। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে লাভের চেয়ে লোকসানের অংক অধিক দেখা যায়। অপচয়, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অব্যবস্থা-পনাই মূলতঃ এজন্য দায়ী।

২৬। গ্রাম ও শহর ঃ পাশ্চাত্যের গ্রাম ও শহরের মধ্যে আমাদের দেশের মত আকাশ পাতাল পার্থক্য নাই। শহরে বড় বড় দালান কোঠা ও অধিক জনবসতি থাকে। গ্রামেও পাকা ঘরবাড়ী, ফুল-ফলের বাগান, পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, কৃষিফার্ম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকান পাট সবকিছু আছে। গ্রামে বাড়ী-গুলো সাধারণতঃ একতলা বা দ্বিতল। কৃষিফার্মকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রাম গড়ে ওঠে। গ্রামে বাড়ীর সংখ্যা অল্প এবং পাতলা বসতি। আমাদের দেশের ন্যায় দুই তিন শত বাড়ী বিশিষ্ট বড় গ্রাম দেখা যায় না।

গ্রাম দেখে বোঝা কঠিন—এটি গ্রাম না শহর? গ্রামের বাসিন্দাদের উন্নত জীবন যাপনের সব রকম ব্যবস্থা আছে। গ্রামেরও শতকরা এক শ' জনই শিক্ষিত এবং তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল।

সুখ, শান্তি ও সৌন্দর্যের লীলানিকেতন গ্রাম। নিত্য প্রয়োজনীয় সব-কিছুই গ্রামে পাওয়া যায়। গ্রামে নানারূপ ফসল সাকসব্জী, তরিতরকারী ও ফলমূল উৎপন্ন হয় এবং টাটকা পাওয়া যায়। গ্রামে বড় বড় ফলের বাগান, কৃষিক্ষেত, খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা সবই আছে। কোনকিছুর অভাব নাই।

২৭। সংস্কৃতি ঃ পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি মধ্যে বহু প্রশংসনীয় দিক থাকা স্বত্ত্বেও একফোঁটা গোচনা যেমন একমণ দুধকে নষ্ট করে, তেমনি দু'একটি

বিষয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। তন্মধ্যে অনেকের চারিত্রিক দিক অন্যতম। 'খাও, দাও, ফূর্তি করো, প্রেমানন্দে বয়ে যাক জীবন যৌবন' (Eat, drink and be merry) মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া সমীচীন নয়। ধর্মীয় বিধান সম্মত সুশৃঙ্খল জীবন মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের অভাব বা ধর্ম পালনে শিথিলতা চরিত্র হানির কারণরূপে দেখা দেয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, অনাচার, ব্যভিচার, পর্ণপত্রিকায় ও নানাবিধ অপসংস্কৃতির মাধ্যমে। এ-সব একটি জাতিকে বিপথগামী করার জন্য মারাত্মক হাতিয়ার যা, মানুষকে শুধু ধ্বংসের আবর্তে টেনে নামায় এবং তাদের মানবতাবোধ ভূলুণ্ঠিত করে।

ব্যক্তিচরিত্রের উপর জাতীয় চরিত্র নির্ভরশীল। যে জাতির অধিকাংশ লোক চরিত্রবান, তারা চরিত্রবান জাতি হিসেবে সম্মানের অধিকারী। এর বিপরীত হলে তাদের ললাটে কলঙ্কের কালিমা প্রতিভাত হয়। তাদের জীবনে চরম অশান্তি সৃষ্টি করে; এমনকি জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এরূপ মনোভাব লক্ষণীয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের অভাবহেতু উচ্ছৃঙ্খল ও আদর্শহীন জীবন তাদের বিপথে পরিচালিত করে। তাদের জন্য সমাজে অশান্তির আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে সমাজকে দগ্ধীভূত করে। ন্যায়নীতি তাদের অভিধান বহির্ভূত। হীনমানসিকতা ও অনাচার সমাজদেহে ক্যান্সারতুল্য দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধির ভয়াবহ পরিণতির কবল হতে রক্ষা পেতে হলে সুস্থ মানসিকতা গঠন অপরিহার্য। যা' পারে একমাত্র ধর্মীয় বিধিবিধান ও আইনের শাসন।

কোন কুসংস্কার বা অন্যায় অবিচার চিরকাল জাতির বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে থাকতে পারে না। কালক্রমে তা' অপসারিত হয় এবং জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। এককালে (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত) ইউরোপে অসংখ্য মেয়েকে ডাইনী সন্দেহ ক'রে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ১৮২৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে 'সতীদাহ' প্রথা বলবৎ থাকায় লক্ষ লক্ষ বিধবা নারীকে মৃতস্বামীর চিতায় দগ্ধীভূত করে হত্যা করা হয়েছে। বিধবা সতীত্বে অক্ষুন্ন থাকবে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে এবং ধর্মীয় বিধান মনে ক'রে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করা হোত। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দ্বারকা নাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইন ক'রে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে (অজ্ঞতার যুগে) আরবদেশে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হোত। বহুকাল যাবৎ এ রেওয়াজ প্রচলিত

ছিল। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর আবির্ভাবে ইসলামী রেনেসাঁর যুগে কন্যা সন্তান হত্যার জঘন্য প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। আল্-কোরআন নারী জাতিকে দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। নারী জাতির পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার সর্ব প্রথমে ইসলামেই স্বীকৃত হয়েছে। ইসলামী বিধানে মেয়েরা পিতামাতার সম্পত্তির অংশীদার। বিশ্বের অনেক ধর্মে এরূপ বিধান নাই।

২৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের সমাজে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। পোষাক পরিচ্ছদ, আহার বিহার, আচার ব্যবহারে আমরা অনেকটা ইংরেজ বা আমেরিকান বণে উঠেছি।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদের একটি ক্ষুরধার হাতিয়ার। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অপসংস্কৃতি আমদানীর মাধ্যমে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করা প্রধান কাজ। এককালে স্পেনে মুসলমানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। মুসলিম সেনাপতি মহাবীর তারেক খৃষ্টান শক্তিকে পরাভূত ক'রে স্পেন বিজয়ের পর সাড়ে সাত শ' বছর দেশটি ছিল মুসলিম শাসনাধীন। মুসলমানদের হীনবল ক'রে তাদের কবল হ'তে স্পেন উদ্ধারকল্পে খৃষ্টান জগৎ 'সুগার কোটেড কুইনাইনের' ন্যায় তাদের গলাধঃকরণ করায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পিল। ফলে তাদের মধ্যে যে ঈমান ও ইসলামী শৌর্য বীর্য ছিল তা' ধীরে ধীরে লোপ পায়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও মনোবল হারিয়ে তারা খৃষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। ফলে, দীর্ঘ সাড়ে সাত শ' বছরের মুসলিম শাসনের ঘটে অবসান। শুধু অবসানই নয়; চির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে মুসলিম জাতিকে এবং তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, বই পুস্তক সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। যাতে মুসলমান জাতি আর কোনদিনও মাথা তুলতে না পারে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে অনুরূপ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুস্বাদু পিল বিতরণের কাজ ব্যাপক হারে চল্‌ছে। ইংরেজের 'Divide and rule policy' জাতীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাদের জন্য সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যাপক হারে গড়ে উঠ্‌ছে 'জাতির শত্রু বিভীষণ'। বলা হয় 'An invasion of Army can be resisted, but an invasion of mind cannot be resisted'—সামরিক অভিযানকে বাধা দিয়ে রোধ করা যায়, কিন্তু মানসিক বা সাংস্কৃতিক অভিযানকে কেউ বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। নিজেদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগে বাংলাদেশেও অনুপ্রবেশ করেছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অপসংস্কৃতি। হিপ্পী বা কাউবয়ের চুলের ফ্যাশান, বেশভূষা, দাঁড়িয়ে পেশাব করা, ধর্ম নিয়ে তামাসা বিদ্রূপ প্রকাশ্যভাবে চল্‌ছে। দেখে মনে হয়—তারাই যেন বাহাদুর। টেডি পোষাক, পপ, জাজ, রক, ডিস্কো, বলড্যান্স, ব্যালেড্যান্স, নাইট ক্লাব, মদ, মাদকদ্রব্য হিরোইন, ফ্যান্সিডিল কোনটা বাদ আছে? সংখ্যায় তারা কম হতে পারে।

কিন্তু তাদের শক্তি অনেক বেশী। কেননা তারা জোটবদ্ধ। একদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কয়েকজন ইংরেজ ভারতে ব্যবসা করতে এসে গোটা দেশের মালিক হ'য়ে বসেন। আগ্রাসনবাদীদের মনে অনুরূপ অভিলাষ থাকা অসম্ভব নয়। দিকে দিকে ইসলামের বিজয় ইসলাম বিরোধীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তুলেছে। আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রদীপকে তারা ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চায়; যেমন চেয়েছিল সাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, কারূণ ও আরো অনেকে। তাদের পরিণতি চিন্তা ক'রে সঠিক পথ ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অপসংস্কৃতির আগ্রাসনবাদীদের ইচ্ছা তাদের সাগরেদদের দ্বারা কোন দেশকে হয় গ্রাস করা অথবা তাদের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা। বড়র অভিভাবকত্ব তারা অনেকেই মূল্যবান আশ্রয় মনে করেন। কিন্তু তারা ভাবেন না, তাবেদার রাষ্ট্রের অবস্থা ঘরের পোষা মুরগীর ন্যায়; প্রয়োজনবোধে জবাই করলে কারো বাধা দেবার প্রশ্ন আসে না। যে রক্ষক, সেই যদি ভক্ষক হয়, কার কি বলার আছে? বিশ্বের প্রতিটি জাতির কর্তব্য—নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করা। অন্যথায় বিপর্যয় অনিবার্য।

২৯। **শিক্ষাব্যবস্থা ঃ** পাশ্চাত্যে হাইস্কুল পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। উচ্চ মাধ্যমিক (H. S. C.) স্তর পর্যন্ত হাই স্কুলে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে কোন বেতন দিতে হয় না। তদুপরি যাবতীয় বই পুস্তক সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করেন। প্রত্যেক শ্রেণীর বই বার্ষিক বা ফাইনাল পরীক্ষার পর স্কুলে ফেরৎ দিতে হয়। কেউ কোন বই হারিয়ে ফেললে উক্ত বইয়ের সমমূল্যের অর্থ স্কুলকে প্রদান করতে বাধ্য থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য এটা এক ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী ও উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীর মাসিক বেতন ২৫০—৩০০ ডলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক বেতন ৫০০০—৬০০০ ডলার (যুক্তরাষ্ট্রে)।

প্রত্যেক পরিবারের কর্মকর্তা বা গৃহস্বামীকে তার নিজস্ব অর্থ-সম্পদ ও উপার্জন অনুপাতে বার্ষিক ১০০—২০০ ডলার শিক্ষাকর সরকারকে প্রদান করতে হয়। সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুইদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকে শনি ও রবিবারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির কারণেই পাশ্চাত্য জগৎ উন্নত। আমাদের দেশে শিক্ষার হার শতকরা মাত্র পঁচিশ। সার্বিক জাতীয় উন্নতির জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকে জাতীয়-করণ নীতি সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

৩০। **লোক সাহিত্য ঃ** পাশ্চাত্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে এমন কোন দিক নেই, যেখানে তাদের পদচারণা না আছে। লোক-সাহিত্য ক্ষেত্রেও

যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। সেখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-সাহিত্য একটি পাঠ্য বিষয়রূপে স্বকৃতি লাভ করেছে। তাদের কল্যাণে লোক-সাহিত্য আন্তর্জাতিক আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ২১-২৫শে জুন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সোসাইটি ফর এশিয়ান ফোক্‌লোর' এবং 'ফোক্‌লোর ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ানা ইউনিভারসিটি' আয়োজিত ফোক্‌লোর সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য সিলেট জেলার বৃন্দাবনপুরের অন্যতম লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্য-রত্ন আমন্ত্রিত হন, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার কারণে তিনি সম্মেলনে যোগদান করতে অসমর্থ হন। পরে ১৯৭৭ সালে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাউথ এণ্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ান ফোক্‌লোর স্টাডিজ' বিভাগ কর্তৃক নিউইয়র্ক সিটিতে ২৫-২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ফোক্‌লোর সম্মেলনে' চৌধুরী গোলাম আকবর যোগদান করেন। তাঁর ন্যায় এদেশের আরো অনেকেই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত লোক-সাহিত্য সেমিনার বা সম্মেলনে যোগদান করেছেন। তন্মধ্যে ডঃ মাযহারুল ইসলাম, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ জহুরুল হক, শামসুজ্জামান খান প্রমুখ উল্লেখ্য।

৩১। নারীর মর্যাদা ঃ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী জাতির অংশ গ্রহণ ব্যতীত জাতীয় উন্নতি যে আদৌ সম্ভব নয় এটা পাশ্চাত্যের জনগণ বিশেষভাবে অনুধাবন করেন। তাদের নারী সমাজ শিক্ষা ও অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রগামী।

অনুন্নত দেশে পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল পুরুষের আয়ের উপর চলে আট-দশজনের এক একটি সংসার। মেয়েরা রান্নাবান্না, সন্তান পালন ও অন্যান্য গৃহকর্ম ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক অর্থ উপার্জনের কাজ করে। তাই অভাব তাদের নিত্যসহচর। অবশ্য অধুনা আমাদের দেশের কিছু মহিলা চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। নারী জাতিকে তাচ্ছিল্য করা কোন জাতির জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না।

পাশ্চাত্যে বহুবিবাহ প্রথা নাই। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও অধিক সন্তান উৎপাদন গরীব দেশে অশিক্ষিত সমাজে বহুল প্রচলিত। পাশ্চাত্য সমাজে এ-সব বর্জনীয়। তাদের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পরিবার কল্যাণনীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। পাশ্চাত্যের মহিলাদের দু'একটির অধিক সন্তান খুব কমই দেখা যায়।

৩২। শ্রমজীবী ঃ পাশ্চাত্যে শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের হার প্রচুর যেজন্য তারা স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করতে সক্ষম। একজন সাধারণ শ্রমিক প্রতি ঘন্টায় ১৫—১৬ ডলার (বাংলাদেশী ছয় শত টাকা) পারিশ্রমিক পায়। একজন দক্ষ শ্রমিক প্রতি ঘন্টায় পায় ২০—২৫ ডলার। শ্রমিকদের ও প্রত্যেকের কার, টেলিফোন, পাকা বাড়ী, ফ্রীজ টিভি—যা কিছু প্রয়োজন সবই আছে। সেখানে

কোন শ্রমিক-মালিক বিরোধ, অসন্তোষ, ধর্মঘট, হরতাল, লক-আপ, মিছিল, ভাংচুর ইত্যাদি নেই। শ্রমিকগণ গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগসহ কর্তব্য সম্পাদন ক'রে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করে। কাজে অবহেলা তাঁদের স্বভাববিরোধী।

পাশ্চাত্যে যারা কাজ করতে অক্ষম বা বেকার, তারাও সরকার থেকে প্রচুর পরিমাণে 'বেকার ভাতা' পায়। ফলে অভাব কাকে বলে, তা তাদের অজানা। তুষারাবৃত দেশ ফিনল্যাণ্ড থেকে সম্প্রতি আমার এক নিকট প্রতিবেশী (পাবনার) স্নেহভাজন সন্তোষ কুমার (জীবন) এক পত্রে লিখেছে ঃ 'বর্তমানে আমার কোন চাকরী নাই অর্থাৎ বেকার। অবশ্য এ দেশের বেকার আর আমাদের দেশের (বাংলাদেশের) বেকারের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি বেকার হলেও সরকার থেকে খাওয়া বাবদ মাসিক বাংলাদেশী টাকায় বিশ হাজার এবং বাসা ভাড়া বাবদ এগার হাজার টাকা পাই। আসার যখন বাসা ছিল না, হোটেলে থাকতাম, তখন ফিনল্যাণ্ড সরকার আমাকে হোটেল ভাড়া বাবদ ৩৫ হাজার এবং খাওয়া বাবদ বিশ হাজার টাকা দিতো। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সব দেশেই 'বেকার ভাতা' প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ফিনল্যাণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ ; তন্মধ্যে চার লক্ষ বেকার। তারা সবাই সরকার থেকে 'বেকার ভাতা' পেয়ে সুখী জীবন যাপন করে।'

আমাদের গরীব দেশে কে ভাবে বেকারদের কথা ? আয়ের গুটাতে ব্যস্ত কোন ব্যক্তি অপরের কথা চিন্তা করতে পারে না। এ-দেশের বেকারদের অনেকেই অসৎ পথে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। তাদের দিকে মনোযোগ প্রদান জাতীয় কর্তব্য নয় কি ?

বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষের মূলকারণ—তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও যা' পারিশ্রমিক পায় তা' দিয়ে পরিবার পরিজনের পেটের ভাতই জোটে না ; অন্যান্য অভাব মোচন দূরের কথা। অপরদিকে মালিক মহাজনেরা শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। এ-কারণে অনেক উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক অসন্তোষ, মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকে।

অনুন্নত দেশের শ্রমিক আন্দোলন দূর করতে হলে শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান ও কারখানার অংশীদারিত্ব দেয়া উচিত। তাদের প্রাপ্য মাসিক বেতন বা সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক থেকে শতকরা দু'এক টাকা নিয়মিত শেয়ার হিসেবে কেটে রাখলে তারা সহজেই অংশীদাররূপে গণ্য হতে পারেন। এরূপ করা হলে তারা নিজদেরকে কারখানার লাভ লোকসানের ভাগী জেনে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পণ্য মনপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করবেন। তাদের মধ্যে ধর্মঘট বা আন্দোলনের কোন প্রশ্নই থাকবে না। তারা তখন নিজেদের শুধু শ্রমিকই মনে করবেন না, ভাববেন তারাও প্রতিষ্ঠানের মালিক। গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠবে। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেড়ে যাবে। অধিক মুনাফার আশায় তারা অধিক পরিশ্রম করবেন। এরূপক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী ও

কর্মকর্তাদের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে, তারা অসৎ হলে আন্দোলন কোনদিনও থামবে না।

যারা সত্যিকার ধর্মপরায়ণ তাঁরা অবশ্যই সৎ হবেন। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি পরকালের শাস্তির ভয়ে কোন প্রকার দুর্নীতি বা অন্যায় করতে পারেন না। কোন প্রতিষ্ঠানে উর্দ্ধতন কর্মচারী বা কর্মকর্তা নিয়োগকালে তাদের ধর্মীয় মনোভাব ও চরিত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় জেনে শুনে বিষ পান করলে মরণযন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

৩৩। **ঝি-চাকর ঃ** পাশ্চাত্যে রান্নাবান্না, কাপড় কাচা ও অন্যান্য গৃহকর্মের জন্য ঝি, চাকর পাওয়া যায় না। যিনি যত বড় লোক বা সম্পদশালীই হোন না কেন, গৃহকর্ম তাদের নিজ হাতেই করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে রান্না ক'রে একত্রে খেয়ে তারা অফিসে যান। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়। গৃহের কাজ লাঘব করার জন্য খাবার পর যার যার থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি নিজেকেই ধৌত ক'রে যথাস্থানে রাখ্‌তে হয়। এমনকি মেহমানের ক্ষেত্রেও রেহাই নেই। যত উঁচু দরের বা উচ্চ পদমর্যাদার মেহমানই হোক না কেন, তার নিজের থালাবাটি নিজেকেই ধৌত ক'রে যথাস্থানে রেখে আস্‌তে হবে। ধৌতকর্মের জন্য বেসিনে সাবান স্পঞ্জ রাখা থাকে। তা' ব্যবহার ক'রে উত্তমরূপে ধৌতকর্ম সমাধা করতে হয়।

এ-ব্যবস্থার বিষয় সবারই জানা, অন্য কাউকে বলতে হয় না। অবশ্য বড় বড় ডিনার পার্টিতে প্লাষ্টিকের তৈরী থালা, গ্লাস, চামচ, বাটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়—যা ব্যবহারের পর নিজ হাতে ডাষ্টবিনে ফেলে আস্‌তে হয়। সে-গুলো দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয় না।

পাশ্চাত্যে ঝি, চাকর না পাওয়ার কারণ, তথায় গরীব বা অভাবী লোক নাই। সবার অবস্থা স্বচ্ছল। কে যাবে পরের ঘরে গোলামী করতে?

৩৪। **অর্থনৈতিক মুক্তি ঃ** পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও কারখানায় চাকুরীরত ব্যক্তিগণ উচ্চ হারে বেতন পাওয়ায় তাদের কোন আর্থিক অভাব থাকে না। এ কারণে তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। তারা মোটামুটি সুখী জীবন যাপন করেন। অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন কাটায়, সে দেশের স্বাধীনতা অর্থহীন।

দরিদ্র ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে দেখা যায়, অধিকাংশ স্বার্থপর নেতৃত্ব ও কর্মচারী নিজের ও গোষ্ঠিস্বার্থে পারে না—এমন কাজই নাই। তাদের অনেকেই ভাবে—দেশ গোল্লায় যাক, তাতে তার কিছু আসে যায় না। তার নিজের ভবিষ্যৎ রমরমা হলেই যথেষ্ট। তাদের কাজকর্মে এরূপ চিন্তাধারাই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কোন গরীব দেশে—যেখানে জনগণ দু'বেলা দু'মুঠো পেটপুরে খেতে পায় না, সেখানে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে তাদের খুশী করার জন্য তোরণ নির্মাণ,

ভেট প্রদান অন্যায় ও অযৌক্তিক নয় কি? পাশ্চাত্যে এরূপ করা হয় না। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সরকার কি এ ধরনের ফজুল ব্যয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না? আর্থিক অপচয় নিষিদ্ধ করতে অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন হয় না, শুধু একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উদার মন ও মানসিকতা। কোন গরীব দেশে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের জন্য উচ্চ ভাতা ও আজীবন পেন্‌শনের বিধান থাকা কি যুক্তিযুক্ত?

শ্রমিক, নিম্ন বেতনের চাকুরীজীবী ও কৃষক সমাজের দুরবস্থার খবর কয়জন রাখেন? তাদের অনাহারক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে কি ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করা উচিৎ নয়? প্রায় সবদেশেই দেখা যায়, যারা জনগণের নেতা, তারা প্রত্যেকেই ধনাঢ্য বা অর্থ-সম্পদশালী পরিবারের সন্তান। তাঁদের আদর্শ ত্যাগী ও সংবেদনশীল মনের অধিকারী হওয়া বান্ছনীয় নয় কি? রাজার নীতি প্রজাপালন থেকেই 'রাজনীতি' শব্দের উৎপত্তি। রাজনীতিবিদদের কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

৩৫। দারিদ্র্যসীমা ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯০ সালের লোক গণনার রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, তথায় প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। সেই হিসেবে ৩৩·৬ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে জীবন যাপন করেন। দারিদ্র্যসীমা ধরা হয় একজনের পরিবারের বার্ষিক আয় ৬,৬৫২ ডলার (বাংলাদেশী টাকায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০ টাকা) হ'লে।

তথ্যটি সংগ্রহ করেন আমেরিকান সেন্সাস ব্যুরো। ব্যুরোর কর্মকর্তাগণ ষাট হাজার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের আর্থিক অবস্থা তথা বার্ষিক আয় সম্পর্কে অবহিত হন। তার ফলাফল দৃষ্টে দরিদ্র-সংখ্যা নিরূপিত হয়। সাধারণতঃ দরিদ্র পরিবার বা ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার, হিস্পানিজ, শিশু ও বিধবা প্রধান। দরিদ্রের মধ্যে শতকরা চল্লিশজন অথবা তের মিলিয়নের অধিক শিশু। (দি ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার, সেপ্টেম্বর, ২৭-১৯৬১)।

অবশ্য পরবর্তীকালে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে আমেরিকার শতকরা ৮৬টি পরিবার ধনাঢ্য এবং তারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। ঐশ্বর্য ও ভোগ বিলাস দিয়ে সভ্যতার পরিমাপ হয় না। মানবতা ও ভদ্রতাই সভ্যতার মাপকাঠি। পাশ্চাত্য দর্শনে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পুঁজিবাদ পরীক্ষিত উত্তম পন্থা; কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে তার চেয়েও উত্তম—এ সম্পর্কে তারা আজও অজ্ঞ। তবে আশার কথা যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইসলামকে জানার জন্য ক্রমে আগ্রহী হ'য়ে উঠ্‌ছে। পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের একটি বিশেষ গুণ তারা তুলনামূলকভাবে যেটি ভাল বিবেচনা করেন এবং তাই গ্রহণ করতে আগ্রহী হন।

ইউ, এন, ডি, পি-এর মানব উন্নয়ন সংস্থার এক জরীপে জানা যায়, বাংলা-দেশে শতকরা ৮৬ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন যাপন করেন।

নেপালে শতকরা ৬০ ভাগ, ভারতে ৪৮ ভাগ এবং পাকিস্তানে ৩০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষিসংস্থার হিসাব মতে বিশ্বে দরিদ্র দেশের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ১৯৫০—৭০ সাল পর্যন্ত ২৭টি দেশ দরিদ্র দেশের তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬টিতে পৌঁছেছে (আফ্রিকায়—৩২ ও এশিয়ায় ১৪টি)। এর সঙ্গে যোগ হবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশ। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দরিদ্রতম দেশ : বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ। এইসব দেশের মাথাপ্রতি সর্বাধিক আয় ২০০ ডলার। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৬০ ডলার ছিল। বর্তমানে সরকারী হিসেব মতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র দেশসমূহের পোষাকী নাম স্বল্পোন্নত দেশ বা L. D. C. (least Development Country)। এ-সব দেশের শিক্ষার হার শতকরা ২০—৩০। মহিলা শিক্ষার হার আরো কম। চিকিৎসা ব্যয় মাথাপ্রতি মাত্র ৫ ডলার। অপর পক্ষে উন্নত দেশ সমূহে মাথাপ্রতি চিকিৎসা ব্যয় বার্ষিক ২০০০ ডলার। অনুন্নত দেশের লোকের গড় পরমায়ু ৪৭ বৎসর। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিম্নমানের। দ্বিতীয়তঃ অধিক জনসংখ্যা ও নোংড়া পরিবেশ স্বাস্থ্য হানির আর একটি কারণ। উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে এ-সব দেশের বহু লোক অপরিণত বয়সে এবং বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। বেকার সমস্যা, গৃহসংস্থান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলার অভাব, অত্যধিক জন্মহার, অশিক্ষা ও ভগ্ন স্বাস্থ্য দরিদ্র দেশ সমূহের প্রধান সমস্যা। F A O এর হিসাব মতে শুধু দরিদ্র দেশের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে না, দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে ৫০ কোটির অধিক লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে।

৩৬। **ক্রীড়া চর্চা** : পাশ্চাত্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া ও ব্যায়াম চর্চা বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে রুটিন মাফিক শরীর চর্চার ও বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। যথোপযুক্ত চর্চার ফলে বিশ্ব অলিম্পিকে তারা গৌরবজনক স্থান দখল করতে সমর্থ হয়। বিশ্বের বহু অনুন্নত দেশে খেলাধূলার উপযুক্ত চর্চা না থাকায় তারা বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ দূরের কথা হিটেই টিকে থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যে কুস্তি, বেস বল ও সকার (ফুটবল জাতীয়) খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

আধুনিক অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারণ পিয়েরে দ্য কুর্বাতা (ফ্রান্সের) প্যারীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর জেনেভায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রথমে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের এথেন্স শহরে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সালের ১৬ই জুন প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ১৪টি দেশ যোগদান করে। তিনি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরকাল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি ছিলেন।

৩৭। **বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ** পাশ্চাত্যে শহর, গ্রাম, সড়ক, কৃষিকার্য সর্বত্র সব সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধের ঘটনা তথাকার অধিবাসীদের অজানা। অনেকেই বলেছেন, তারা চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোনদিন এক মিনিটের জন্যও বিদ্যুৎ ফেল করা দেখেন নাই। রাতদিন সব সময়ই বিদ্যুৎ থাকে। অথচ আমাদের দেশে বিদ্যুৎ যায় না—এমন দিন পাওয়া দুর্লভ। অনুন্নত দেশে বিদ্যুৎ ফেলের জন্য প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। 'লোড শেডিং' এর কারণেও কম ক্ষতি হয় না। বিদ্যুৎ বিভাগে চাকুরীরত কর্মচারীদের বাড়ীতে মিটার থাকেনা, তাদের বিদ্যুৎ চার্জ লাগে না। এরূপ লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর জন্যও ক্ষতি কম হয় না।

দেশের সার্বিক উন্নতি বিদ্যুতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিদ্যুতের অসুবিধার কারণে জাতি অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। অনুন্নত দেশের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী ও লোকদের জন্য বিদ্যুতের 'সিস্টেম লস' জাতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। অসাধু মিটার রীডারগণ অল্পদিন চাকুরী ক'রে বিরাট অর্থ সম্পদের মালিক কিরূপে হয় কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত নয় কি ?

৩৮। **বিক্রয় কর ঃ** পাশ্চাত্যে বিক্রীত প্রতিটি জিনিষের উপর ছয় শতাংশ হারে বিক্রয় কর (Sale Tax) দিতে হয়। একদিন টেশা শহরে মাত্র ছয় ডলার মূল্যের ভিউ কার্ড কেনায় আমাকে ছয় সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে দাম ও ট্যাক্স আদায় করা হয় জন্য কোন দোকানী ইচ্ছা করলেও ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে না। প্রত্যেক দোকানেই কম্পিউটার থাকে। খাদ্য দ্রব্যাদির উপর কোন বিক্রয় কর নাই। কম্পিউটার সার্ভিস ব্যাপকভাবে চালু করা হলে অনুন্নত দেশসমূহ দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

৩৯। **সার্ভিস চার্জ ঃ** একদিন ছরু কাজী মামার সঙ্গে এক রেস্টুরেন্টে দু'জন দু'টা পুডিং খাই। পূর্বাহ্নেই জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, প্রতিটি পুডিং এর দাম দুই ডলার। আমরা পুডিং এর প্লেট হাতে নিয়ে রেস্টুরেন্টের চেয়ার টেবিলে বসে খাই। খাবার পর আমাদের বিল দেয় সাত ডলারের। আমি জিজ্ঞেস করি—দু'টা পুডিং এর দাম চার ডলার, কিন্তু সাত ডলারের বিল কেন ? কাজী মামা বলেন, ঠিক আছে, তিন ডলার 'সার্ভিস চার্জ'। আমরা চেয়ার টেবিল ব্যবহার করেছি, রেস্টুরেন্টের বয় দু'গ্লাস পানি দিয়েছে, তার জন্য প্রত্যেকের দেড় ডলার সার্ভিস চার্জ ধরা হয়েছে। ভাবুন ব্যাপারখানা। আমাদের দেশেই ভাল কোন 'সার্ভিস চার্জ' লাগে না।

৪০। **চুল ছাটা ঃ** আমার মাথার বার আনা অংশেই চুল নাই। মাথার পিছনে ও ধারে পাশে যেটুকু চুল আছে, তা' দেড়মাস পর পর কাটাতে হয়। নইলে অস্বস্তি লাগে। আমেরিকায় তিনমাস থাকায় আমাকে দু'বার চুল ছাটাতে হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটিতে বিভিন্ন সেলুনে চুল ছাটার চার্জ সাত ডলার হতে বার ডলার পর্যন্ত (সেলুনের মান অনুযায়ী)। আমি বাংলাদেশী 'গরীব ভদ্র' হিসেবে নিউইয়র্কের একটি নিম্নমানের সেলুনে চুল কাটাতে যাই। সেলুনটিতে যারা চুল কাটেন, সবাই মহিলা। চুলকাটা চার্জ কত জিজ্ঞেস করায় উত্তর পাই আট ডলার (বাংলাদেশী ৩২০ টাকা প্রায়) দাঁড়ি মোচ বানাতে বা শেভ করতে লাগে আরও পাঁচ ডলার। আমি শুধু চুল কাটায়ে আট ডলার দিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

আর একদিন কাজী মামার সঙ্গে অন্য একটি নিম্নমানের সেলুনে যাই। সেখানেও সবাই মহিলা। চুল ছাটা চার্জ সাত ডলার। কাজী মামা আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এক ডলার বকশিশসহ মোট আট ডলার দিতে হবে। বক্‌শিশ না দিলে মাইণ্ড করবে এবং ভাববে লোকটা 'অভদ্র'। চুল কাটা পর আট ডলার দিয়ে বিদায় হই। পথে কাজী মামাকে বললাম, মামা, 'অভদ্র' হয়ে থাকলাম যে! তিনি বললেন—কি রকম? বল্লাম, আর একদিন অন্য সেলুনে চুল কাটায়ে কোন বক্‌শিশ দেই নাই। আজ ওটা দিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু আমার ত' সে—সেলুন চেনা নাই। তিনি বললেন, তা' আর দেয়া চলে না, বক্‌শিশ সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হয়।

ভাবলাম, আমাদের দেশই ত' ভাল, চুল কাটাতে বকশিশ লাগে না। তা' ছাড়া এক ডলার অর্থাৎ চল্লিশ টাকা হলে পাঁচ সাত জনের চুল কাটা যায়।

৪১। **মদ্যপান ঃ** পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন মদ পান করেন। অনেকেই অতিরিক্ত মদ পানের জন্য নেশাগ্রস্থ হয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত হন। আমেরিকায় মদ্যপান জনিত অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকান গঠনতন্ত্রের ১৮ নং সংশোধনী দ্বারা সকল অঙ্গরাজ্যে তথা সমগ্র আমেরিকায় মদ পান নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মদাসক্ত জাতি দেশের আইনকে অগ্রাহ্য ক'রে গোপনে মদ পান অব্যাহত রাখে। মদ নিষিদ্ধ করার পূর্বে সমগ্র দেশে চার হাজার মদের দোকান ছিল। সব মদের দোকান সরকার বন্ধ করে দিলে, ৯১,০০০ চোরাই মদের দোকানে গোপনে মদ কেনা বেচা চল্‌তে থাকে। সরকার পনর বৎসর যাবৎ চেষ্টা ক'রে কয়েক লক্ষ লোককে জেলে পুরে, ছয় কোটি ডলার ব্যয় করেও মদপান বন্ধ করতে পারেন না। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসে 'মদ্যপান নিষিদ্ধ আইন' বাতিল করা হয়। একটি সভ্য জাতি ব্যর্থ হয় নিজেদের সরকার প্রবর্তিত আইন মেনে চল্‌তে। মানব রচিত আইন ব্যর্থ হয়।

কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে আমরা কী দেখতে পাই? এক সময়ে আরব দেশে প্রায় সবাই মদ পান করতো। আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে যখন মদ খারাপ জিনিষ বলে ঘোষণা করেন, তখন অনেক লোক মদ পান বর্জন করেন। পরে মদ পান করে নামাজে আসা নিষিদ্ধ করা হলে আরো অনেক লোক মদ

ত্যাগ করেন। অতঃপর যেদিন মদ হারাম বা নিষিদ্ধ বলে আয়াত নাযিল হয়, সেদিন থেকে তারা মদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন এবং সমস্ত মদের জার, বোতল, গ্লাস ভেঙ্গে ফেলেন। আরবের রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। আল্লাহর আইন জারীর ফলে বিনা খরচে, বিনা চেষ্টায় মদ পান রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র আইন আর মানব রচিত আইনের মধ্যে এই তফাৎ।

রেভারেণ্ড টেলর বলেন, 'মদ্যপান, জুয়া খেলা ও ব্যভিচার—যে তিনটি অভিশাপ খৃষ্টান জগতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই তা' দূর করতে পারে।'

মদ পান ত্যাগ করা তাদের জন্য কঠিন কাজ, যারা মদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু তাদের জন্য আদৌ কঠিন নয়, যাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছেন। মদ ত' তুচ্ছ বস্তু, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান অম্লান বদনে জানমাল সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারেন। জেহাদে অংশ গ্রহণ ক'রে হাসিমুখে শহীদ হতে পারেন। ইসলাম জগতে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের জন্য মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে হন শহীদ এবং সাফল্য অর্জন করলে হন গাজী। উভয়ের জন্য পরকালে আল্লাহ্‌র বেহেস্তের দ্বার উন্মুক্ত। (আল্ হাদিস)।

৪২। মাদক দ্রব্য সেবন ঃ পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ ক'রে আমেরিকায় মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক হারে প্রচলিত। গাঁজা, আফিম, মরফিন, হিরোইন, ফেন্সিডিল, মারিজুনা ইত্যাকার বিভিন্ন মাদক দ্রব্য দুর্বলচেতা লোকদের নেশাগ্রস্ত ক'রে সমাজে অপাংক্তেয় ও হীনবল করে। নেশার আবেশে তাদের জীবনীশক্তি ও কর্মশক্তি লোপ পায়; ফলে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রোধকল্পে জোর প্রচেষ্টা পাচ্ছেন, কিন্তু তেমন সাফল্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। চেষ্টার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে বলে মনে হয়।

সিঙ্গাপুরে কেউ মাদক দ্রব্য আমদানী করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মাদক দ্রব্য গ্রহণকারীর জন্যও শাস্তির বিধান রয়েছে। অধিকন্তু তাকে বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসাধীন রাখা হয়। অনুরূপ কঠোর শাস্তির বিধান করা হলে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিশ্চয়ই লোপ পাবে—সন্দেহ নাই।

জাতিসংঘের পক্ষ হতে 'মাদকমুক্ত বিশ্ব' গড়ে তোলার জন্য বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। মানবাধিকারের ন্যায় মানব জীবন রক্ষাও জাতিসংঘের একটি অতীব জরুরী কর্তব্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সত্যিকার সদিচ্ছা থাকলে 'মাদক মুক্ত বিশ্ব' গড়ার আন্দোলনে অবশ্যই সুফল আশা করা যায়। প্রাথমিক বিধান হিসেবে প্রত্যেক দেশকেই মাদকদ্রব্যসেবীদের জন্য কঠিন শাস্তির ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত। ইসলামে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিলকুল নিষিদ্ধ (হারাম)। এ-কারণে ধার্মিক মুসলমানগণ কখনো

মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না। কিন্তু যাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নেই বা যারা ধর্মের ধার ধারে না, তাদের পক্ষে এইসব অপকর্মে লিপ্ত হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

সরকারী হস্তক্ষেপ ভিন্ন নেশাখোরদের সুপথে আনা সম্ভব নয়। অবশ্য এ কাজে সরকারের সঙ্গে জনগণের বিশেষ ক'রে যুব সমাজের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

৪৩। **ধূমপান ঃ** পাশ্চাত্যে বিভিন্ন যানবাহনে, ট্রেনে, বাসে লেখা দেখেছি—ধূমপান নিষিদ্ধ (Smoking Prohibited)। এই নিষেধাজ্ঞা যাত্রীগণ মেনে চলেন বলে মনে হ'ল, কেননা বাসে বা ট্রেনে কাউকে ধূমপান করতে দেখি নাই। কিন্তু পাথে-ঘাটে পুরুষ ও মহিলা অনেককেই ধূমপানরত দেখেছি। অনেক স্থানে সাইন বোর্ডে লেখা দেখেছি ঃ Smoking is detrimental to health. To avoid its adverse effect one should give up smoking. কিন্তু ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এটা তারা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। এক রেস্টুরেন্টের এক পাশে লেখা আছে 'ধূমপায়ীদের জন্য' অপর পাশে 'অধূমপায়ীদের জন্য'। সরকারী বিধান মোতাবেক প্রত্যেক হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও প্লেনে 'স্মোকিং' ও নন স্মোকিং' এলাকা ভাগ করা থাকে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মহিলা ধূমপায়ী। শুধু ধূমপান নয়, পুরুষ ও মহিলা অনেকেরই মাদক দ্রব্য সেবনের নেশাও রয়েছে। ইরানে সংসদে আইন পাশ হচ্ছে—ধূমপায়ীরা সরকারী চাকুরী পাবে না এবং সেখানে তামাকের চাষ বন্ধ ক'রে জমিতে অন্যান্য ফসলের চাষ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর কারণ সেখানে ধূমপান-জনিত কারণে এক বৎসরে ৪৫ হাজার লোক ফুসফুস ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেছে।

৪৪। **খাদ্যের অপচয় ঃ** পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রতিদিন যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে তা' দিয়ে একটা গরীব দেশের সব মানুষ একদিন খেয়ে বাঁচতে পারবে বলে মনে হয়। তাদের খাদ্যদ্রব্যের অপচয় কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। ইসলাম অপচয় সমর্থন করে না। কোরআন মজীদে আছে—'ইন্নাল্ মোবাজ্জেরিণা কানু এখ্ওয়ান শায়াতীন'—নিশ্চয়ই অপব্যয়-কারীরা শয়তানের ভাই। শিক্ষিত, ভদ্র ও বিত্ত ব্যক্তিগণ কেন শয়তানের ভাই হতে যাবেন?

৪৫। **পৌত্তলিকতা ঃ** পাশ্চাত্যে বিশেষ করে আমেরিকায় অনেক বাড়ীর প্রবেশ পথে মস্তকোপরী উচ্চতায় প্রস্তরনির্মিত নগ্ন নারীমূর্তি চিৎ অবস্থায় শায়িত দেখেছি। গৃহে প্রবেশকারীদের উক্ত মূর্তি দর্শন ক'রে তার নীচ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এটা কোন দেবীমূর্তি, না স্থিছক শিল্পনিদর্শন জানি না। এক বাড়ীতে এরূপ একাধিক মূর্তিও দেখেছি। ১৩৭০ নম্বর ভার্জিনিয়া এভিনিউ, নিউইয়র্কে আমার ছোট ভাই শরীফ যে বাড়ীতে থাকে, তথায় শতাধিক কক্ষ

বিশিষ্ট আটতলা ভবনে অনেকগুলো মূর্তি রয়েছে। এ-সব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে খৃষ্টান জগৎ কি ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

৪৬। **অহমিকাবোধ ঃ** পাশ্চাত্যের জনগণের বিশেষ ক'রে সরকারী চাকুরেদের অহমিকাবোধ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অনেক অফিসের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বা বসকে (Boss) একই অফিসের অধঃস্তন কর্মচারীগণ সম্মান প্রদর্শন করে না। 'বস' বাইর থেকে অফিসে প্রবেশকালে কোন কর্মচারী নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না। রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলে বসের সঙ্গে পাশাপাশি একই টেবিলে খানা খেয়ে যার যার মত নিজের বিল পরিশোধ করে উঠে যায়। কেউ-ই বসকে খাতির করে তার বিল দেয় না। কেউবা বসের সামনে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম ভোগ করে।

এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেয়—বসকে সম্মান দেখানোর কি আছে? আমি কি তার গোলাম? সে-ও চাকুরী করে, বেতন পায়, আমিও চাকুরী করি, বেতন পাই। সে ত' বিনা বেতনে কাজ করে না যে, তাকে সম্মান দেখাতে হবে। কোন পিয়ন বা দপ্তরী অফিসের কাজ ছাড়া কোন বসের বাড়ী যায় না বা তার বাড়ীর কোন কাজ করে না কিংবা বাজার করে দেয় না। তারা বলে, আমরা ত' বসের চাকর নই যে, তার বাড়ীর কাজ করবো। আমরা অফিসের চাকর, শুধু অফিসের কাজ করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু অনুন্নত দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৪৭। **বিক্ষোভ মিছিল ঃ** একদিন নিউইয়র্ক শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল দেখলাম। মিছিলকারীরা সংখ্যায় জনপঞ্চাশেক হবে। তারা যুবক ও মধ্যম বয়সী। এটি ছিল মৌন মিছিল। তারা কোন প্রকার শ্লোগান না দিয়ে নীরবে রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে চলছিল। মিছিলকারীদের হাতে ছিল আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড ও ব্যানার। লেখা পড়ে বোঝা গেল, তাদের ঘরবাড়ী বা কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। যারজন্য তারা বেকার ভাতা ও চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত।

তাদের সমস্যারপ্রতি সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল মিছিলটির উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যে যে-কোন সমস্যার বিষয় সরকারকে অবহিত করতে পারলে তার সমাধান পেতে দেরী হয় না। লক্ষ লক্ষ সাংবাদিক তাদের ক্ষুরধার লেখনীতে সকল খবর ও সমস্যার কথা ফলাও করে তুলে ধরেন। ফলে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পাশ্চাত্যে এক একটি দৈনিক পত্রিকা শতাধিক পৃষ্ঠার হয়ে থাকে। বিরাট বপুর পত্রিকায় অধিকাংশই বিজ্ঞাপন ছাপা থাকে। বড়জোর এক-চতুর্থাংশ কলেবরে সংবাদ থাকে।

৪৮। **কুকুরপ্রীতি ঃ** পাশ্চাত্যে কুকুরপ্রীতি একটি অশালীন বাতিক। কুকুরকে তারা অত্যন্ত ভালবাসে ও আদর করে। এমনকি অনেকেই কুকুরের মুখ চুম্বন করে, কুকুরকে দিয়ে নিজের গা মুখ চাটায় এবং কুকুরকে কোলের মধ্যে নিয়ে শুয়ে থাকে। সার্কাসে কুকুর নানা রকম খেলা দেখায়। কুকুর

বাজার করতে এবং ফেরী ক'রে খবরের কাগজ ও বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রী করতে পারে। কুকুর শুধুমাত্র পাহারা দেবার কাজেই ব্যবহৃত হয় না, কুকুর বাহিনী পুলিশ বিভাগ কর্তৃক আসামী সনাক্ত করণের কাজে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও কুকুর অনেক কাজে সাহায্য করে।

কুকুরের জন্য তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কুকুরের অসুখের চিকিৎসার জন্য কুকুর হাসপাতাল (Dog's Hospital) রয়েছে। তথাকার ডাক্তারের ফি মানুষ ডাক্তারের ফির চেয়ে অনেক বেশী। অবিশ্বাস্য হলেও কুকুরের সঙ্গে মানুষের অসম বিবাহের কথাও শুনেছি। অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে নাকি কোন কোন সময় এরূপ অসামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং খবরের কাগজে তার খবর ফলাও ক'রে প্রচারিত হয়।

সিলেটের ফায়জুল হক নামে এক ব্যক্তির নিকট অরল্যাণ্ডো শহরে শুনেছিলাম, আমেরিকার জনৈক ব্যক্তি একটি ঘোড়াকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে 'কোর্ট ম্যারেজ' এর জন্য ঘোড়াসহ কোর্টে যায়, কিন্তু কোর্ট অনুমতি না দেওয়ায় বিবাহ হয় না। খবরটি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পাশ্চাত্যে বিড়ালের জন্যও পৃথক হাসপাতাল রয়েছে। কুকুর বিড়ালের জন্য তারা প্রতিদিন যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে আমাদের দেশের মত একটি ক্ষুদ্র দেশের জনগণের একমাসের খরচ চলতে পারে। শুনেছি একটি বিড়ালের জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে এক শ' ডলার (বাংলাদেশী চার হাজার টাকা) ব্যয় হয়। প্রতি কুকুরের জন্য ব্যয় হয় এর দ্বিগুণেরও অধিক। এক সার্কাসে কুকুরের নাচ দেখেছি। কুকুরটি পিছনের দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক মানুষের মত নাচে। প্রায় সার্কাসেই কুকুরের খেলা দেখানো হয়। সাহেব ও মেম সাহেবরা কুকুরের চেইন হাতে ধরে সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণে বের হন।

৪৯। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ঃ পাশ্চাত্যে প্রতি বৎসর মেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় (পুরুষের ক্ষেত্রে হয় না)। আমেরিকার প্রতি অঙ্গরাজ্যের তের হতে উনিশ বছর বয়স্কা (Teens) তরুণীরা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একত্রে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়। যে প্রথম হয় তাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বা 'বিশ্বসুন্দরী' বলে ঘোষণা করা হয়। সে মোটা অংকের পুরস্কার পায়। ফ্লোরিডার ইউনিভারস্যাল ষ্টুডিওতে দেখেছি, বিভিন্ন দেশের ও অঙ্গরাজ্যের ১৩-১৯ বৎসর বয়স্কা কতিপয় তরুণী বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে নিজ নিজ দেশের ব্যাজ ধারণ ক'রে আসে।

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী 'মিস আমেরিকা' সম্মানে ভূষিত হয়। ১৯৯১ সালে হাওয়াই দ্বীপের একটি মেয়ে 'মিস আমেরিকা' হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৫০। যৌতুক প্রথা ঃ পাশ্চাত্যে বিবাহে যৌতুক প্রথা নাই। যৌতুক প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামের নীতি তারা মেনে চলছে; অথচ অনেক মুসলমানের দেশে যৌতুক প্রথা মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। আমাদের দেশে সরকার আইন পাশ ক'রে যৌতুক প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও এই দুষ্ট ব্যাধি সমাজদেহে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। এই মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রয়োজন। অসংখ্য গরীব পিতামাতা ও অভিভাবক যৌতুক প্রদানে অক্ষম হওয়ায় মেয়েদের আইবুড়ো রাখ্‌তে বাধ্য হচ্ছেন। সর্বস্তরের সমাজপতি ও নারী সমাজকে এই কুপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করা উচিৎ। অবলা নারীসমাজকে নির্যাতনের কবল হ'তে রক্ষা করতে হ'লে যৌতুক প্রথার আশু বিলুপ্তি প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে ইসলামের অনুশাসন কড়াকড়ি ভাবে না মানা পর্যন্ত যৌতুকরোধ সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজে মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অংশ পায় না জন্য তাদের মধ্যে যৌতুক দানের প্রচলন হয়। মুসলিম সমাজে মেয়েদের জন্য বর পক্ষের নিকট মহরানা ও গহণাপত্র দিবার বিধান রয়েছে অথচ কার্যক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের রীতিনীতি মুসলিম সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

৫১। গহণা ব্যবহার ঃ পাশ্চাত্য জগতে নারী সমাজে সোনার গহণা পরার বিলাসিতা নাই। দু'এক জনের কানে ছোট্ট সোনার বা পাথরের ফুল ছাড়া অন্য কোন গহণা পরিহিতা কাউকে দেখিনি। মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছেদও অতি সাধারণ। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ মহিলা হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিধান করেন। শীতকালে ফুল প্যান্ট ও সার্ট পরেন দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাই তাদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার।

আমাদের ন্যায় গরীব দেশসমূহে সোনার গহণা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া বান্ছনীয়। কেননা সোনার গহণা পরার কারণে অনেকেই হাইজ্যাকার ও ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে জানমাল হারাতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ গহণা পরার বিলাসিতা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ। অনেক পরিবারের কর্তাকে স্ত্রীর গহণার চাহিদা মিটাতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

সোনার গহণা ব্যবহারের মানসিকতা বর্জন করা সবার জন্যই মঙ্গলজনক। ডেনমার্কের মিসেস প্রতীমা জ্যাকবসন নামে এক মহিলার সঙ্গে আলাপে জেনেছিলাম, তাদের দেশে সোনার গহণা ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই সে-দেশে কোন মহিলা সোনার গহণা পরেন না।

মূল্যবান গহনা পরার বিলাসিতা অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করে—যা মানবতার পরিপন্থী এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামী বিধানে পুরুষদের জন্য সোনার আংটি, চেইন ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম (নিষিদ্ধ)। তবু অনেক মুসলিম পুরুষ এ-সব ব্যবহার করে। এটা কি তাদের বিবেককে দংশন করে না?

৫২। **অপরাধপ্রবণতা ঃ** পাশ্চাত্যের কোন কোন শহর এলাকায় দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা যে সকল অপরাধ সংঘটিত হ'য়ে থাকে, তন্মধ্যে ডাকাতী, খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, ইত্যাদি প্রধান। কিছুসংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ ও স্প্যানিশ এইসব অপরাধের নায়ক। সরকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে তাদের বেকার ভাতা দেয়া সত্ত্বেও মদ, মাদকদ্রব্য ও নারীলিপ্সা তা'দিগকে অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে। এদের জন্য অনেক স্থানের পরিবেশ ও নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সমাজদেহে এটা এক মারাত্মক ব্যাধি।

৫৩। **মৃত্যুকর ঃ** কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তির জন্য কোন উইল না ক'রে মারা গেলে তার যাবতীয় সম্পদের এক-দশমাংশ মৃত্যুকর (Death Tax) হিসেবে সরকারের প্রাপ্য। অবশিষ্ট অংশ তার উত্তরাধিকারীগণ পাবেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তি কোন প্রতিষ্ঠানে দান ক'রে গেলে, সরকার ও উত্তরাধিকারীগণ কিছুই পাবেন না।

পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার সম্পত্তি বা তার অংশ গ্রহণ করা অগৌরবের মনে করে। বরং তারা পিতামাতা কর্তৃক তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করাকে অধিক পছন্দ করে। তারা নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা স্বাবলম্বী হ'তে ইচ্ছুক।

৫৪। **চাইল্ড কেয়ার সেণ্টার ঃ** পাশ্চাত্যের কর্মব্যস্ত পিতামাতা শিশু-সন্তানদের 'চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে' রেখে অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তাদের কর্তব্য পালন করেন। কাজ শেষে সন্তানকে বাসায় ফেরৎ নিয়ে যান। শিশুরা মাতৃস্তনের পরিবর্তে 'ফিডিং বোতলে' শিশুখাদ্য বা দুধ পান ক'রে বড় হয়। মাতৃস্তন পানের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ে যে স্নেহ-মমতা গড়ে উঠে, পাশ্চাত্য জগতে তার একান্ত অভাব। এ-কারণে পিতামাতার প্রতি সন্তানের অন্তরে তেমন মহব্বত সৃষ্টি হয় না। ফলে পরিণত বয়সে তারা পিতামাতার সঙ্গে একত্রে বাস করতে আগ্রহী থাকে না। মাছের মা'র মত ভালবাসা সন্তানদের বেশীদিন আকৃষ্ট রাখতে পারে না। তারা পরিণত বয়সে পিতামাতাকে ত্যাগ করে পৃথক বাড়ীতে বাস করা অধিক পছন্দ করে। বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রতি তাদের কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে বলে তারা মনে করে না।

মাতৃস্তন পানে মা'র সঙ্গে শিশুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। হলুদ বর্ণের শালদুধ শিশুর জন্য অধিক উপকারী। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ শালদুধ বের করে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ পাক বিনা প্রয়োজনে মাতৃস্তনে শালদুধ সৃষ্টি করেন না। পাঁচ মাস পর্যন্ত মাতৃস্তন পান করা শিশুর জন্য বিশেষ উপকারী।

৫৫। **বৃদ্ধ মাতাপিতা ঃ** পাশ্চাত্যে মাতাপিতা বৃদ্ধকালে তাদের দেখা শোনার লোকের অভাবে বাড়ী-ঘর, জমি-জমা বিক্রী ক'রে 'নার্সিং হোমে' গিয়ে বাস করেন এবং সেখানেই বাকী জীবন কাটান। সরকারী, বেসকারী ও বিভিন্ন সংস্থার নার্সিং হোম রয়েছে। সেখানে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের পরিচর্যার জন্য স্টাফ নার্স,

ডাক্তার, পরিচারক-পরিচারিকা থাকেন। তাঁরা তাঁদের সুখ-শান্তি ও আনন্দ-দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। তাঁদের চলাফেরার জন্য ট্রলি, আনন্দ দানের জন্য গান, বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, খেলাধূলা, রেডিও, টিভি, বাদ্যযন্ত্র সবকিছুর ব্যবস্থা থাকে। তাঁদের সেবাযত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না। বলতে গেলে তাঁরা রাজারহালে থাকেন। বৎসরে একদিন ফাদার্স ডে, (১৫ই জুন) ও মাদার্স ডে (২১শে মার্চ) তারিখে তাঁদের ছেলে-মেয়ে ফুল, ফল ও মিষ্টান্নসহ 'নার্সিং হোমে' এসে মাতাপিতাকে দেখে যায়। এটা লৌকিকতা ভিন্ন ভাবা যায় না।

পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্কর তাঁরা 'এপাড় বাংলা, ওপাড় বাংলা' বইতে আমেরিকার সমাজের বুড়োবুড়ীদের হতভাগ্য জীবনের একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, 'চরম যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কি করে সেখানে মানুষ তাদের হৃদয়ের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো হারিয়ে যন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ হ'য়ে গেছে। সেখানে যুবক ছেলেরা চাকরী ও বিয়ে করবার পরই বাবামাকে ফেলে আলাদা ফ্লাটে গিয়ে থাকে। হতভাগ্য বাবা-মার সেবাযত্নের কোন প্রয়োজন বোধ করে না।'

ইসলাম বলে—মা'র পদতলে সন্তানের বেহেস্ত, পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, পিতামাতার সেবাযত্ন করা সন্তানের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ-সব মহামূল্যবান নীতি পাশ্চাত্য জগতে বিরল।

৫৬। গার্লফ্রেণ্ড ঃ পাশ্চাত্যে স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত ছেলেদের গার্ল-ফ্রেণ্ড এবং মেয়েদের বয়ফ্রেণ্ড থাকে। ছেলেরা নিজেদের ইচ্ছামত গার্লফ্রেণ্ডসহ যেখানে খুশী যেতে পারে এবং রাত্রিবাস করতে পারে—তাতে তাদের পিতা-মাতার আপত্তি থাকে না। বরং সম্মতি থাকে ; কেননা পিতামাতা ছেলেমেয়েদের বিবাহ ঠিক করেন না ; ছেলেরা নিজেদের পছন্দমত জীবনসঙ্গিনী বাছাই করে।

ছেলে বা মেয়ের বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হলে দেশে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছেড়ে তারা অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে বা বাড়ী কিনে পৃথক ভাবে বাস করতে পারে। অধিকাংশই তাই করে। মেয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডসহ এবং ছেলে তার গার্লফ্রেণ্ডসহ নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে। ইচ্ছা করলে তারা কোর্টে গিয়ে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে ; কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আয় একত্র করে তার উপর সরকারী ট্যাক্স বা আয়কর দিতে হয়। অতিরিক্ত আয়কর না দেবার জন্য অনেকেই বিয়ে না করে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় একত্রে বাস করে। এভাবে দশ বছর একসঙ্গে থাকলে তারা দেশের প্রচলিত নিয়মে স্বামী-স্ত্রীরূপে স্বীকৃত হয়। তখন হতে উভয়ের আয়ের উপর আয়কর কর্তন হতে থাকে।

কোন পুরুষ বিয়ে না করে তার গার্লফ্রেণ্ডকে সন্তান দান করতে পারে ; আবার কোন অবিবাহিতা মহিলা সন্তান লাভের ইচ্ছা করলে কোন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কিছুকাল একত্রে বাস ক'রে সন্তান নিতে পারে। এতে সমাজে বা আইনে

কোন বাধা নাই শুনেছি। বৈধ ও অবৈধ সন্তান সমান মর্যাদার অধিকারী, কেননা উভয়েই রাষ্ট্রের জনশক্তি ও সেবক।

৫৭। পৃথক বাসের সুবিধা ঃ পিতা-মাতাত্যাগী সন্তানদের পৃথক বাড়ী ভাড়া ক'রে বা বাড়ী কিনে বাস করতে কোন অসুবিধা হয় না, কেননা সরকার যে পরিমাণ বেকারভাতা দেন, তা' থেকে ভরণপোষণ ছাড়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে—যদ্দারা কিস্তি চুক্তিতে তারা বাড়ী, গাড়ী, ফ্রীজ ইত্যাদি কিনতে পারে।

বাড়ী নির্মাণ ক'রে বিক্রী করা বা ভাড়া দেবার ব্যবসা অনেকেই ক'রে থাকে। বিশ পঁচিশ বছরের চুক্তিতে যে-কেহ বাড়ী বা গাড়ী কিনতে পারে। প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করলেই বাড়ী বা গাড়ীর দখল পাওয়া যায়; অবশিষ্ট মাসিক কিস্তিতে চুক্তি মোতাবেক বিশ বা পঁচিশ বছরে পরিশোধ করতে হয়। মূল্য পরিশোধ হলে তখন সে বাড়ী বা গাড়ীর মালিক হয় এবং ইচ্ছামত তা' অন্যের নিকট বিক্রী করতে পারে।

৫৮। জন্ম-পরিচিতি ঃ পাশ্চাত্যে সন্তানেরা বহুলাংশে মাতার নামে পরিচিত। যদিও পিতার নামও ব্যবহৃত হয়। মাতৃপরিচয়ের কারণ স্বরূপ জানা যায়, মাতৃ উদরে সন্তান দশ মাস থাকে—এটা ত' মিথ্যা হ'তে পারে না; পিতার ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকা সম্ভব। কিন্তু মা যে আসলেই মা—এটা সর্বজন স্বীকৃত। এ-কারণে মাতার স্থান পিতার আগে। দ্বিতীয়তঃ সংসারের কর্ত্রী মাতা। মাতাপিতা উভয়েই উপার্জন করেন, কিন্তু খরচ করেন মা। মা'র হাতেই সংসার পরিচালিত হয়। তাই মা'র গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা পিতা অপেক্ষা অধিক। পাশ্চাত্যের নীতি—'লেডিস ফার্ষ্ট' (Ladies first)। অর্থাৎ মেয়েদের অধিকার সর্বাগ্রে।

৫৯। চুম্বন প্রথা ঃ পাশ্চাত্য জগতে চুম্বন করা একটি সামাজিক প্রথা। পিতামাতা, প্রেমিক, প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী, পরিচিত জন ও আত্মীয় এগানার মধ্যে একে অপরকে চুম্বন ক'রে থাকে। পথেঘাটে যুবকযুবতী একত্রে পথচলাকালে অথবা ট্রেনে-বাসে জনসমক্ষে পরস্পর খোলামেলা বারবার চুম্বন আমাদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। যারা এরূপ ক'রে থাকে, আমাদের বিবেকে তাদের বেহায়া বল্‌তে ইচ্ছে করে।

একদিন শতাধিক লোকের সাক্ষাতে এক যুবক তার সাথের এক যুবতীর সঙ্গে একে অপরকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বারবার চুম্বন করতে থাকে। জানিনা তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কিনা। স্বামী-স্ত্রীই যে হতে হবে তার কোন মানে নাই। বন্ধু-বান্ধবীও হতে পারে। এরূপ লাগামহীন চুম্বন অত্যন্ত অশালীন। ইসলামে-র দৃষ্টিতে এটি গুরুতর অপরাধ। চারিত্রিক অধঃপতনের যাত্রাশুরু চুম্বন থেকেই হয়ে থাকে।

৬০। পতিতাবৃত্তি ঃ পাশ্চাত্যের সকল দেশেই পতিতাবৃত্তি আছে বলে শুনেছি। মারাত্মক এইড্‌স রোগের বিস্তার ঘটার প্রধান কারণ পতিতালয়ে গমন। এই ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত যত চেষ্টাই হোক না

কেন, এইড্‌সের বিস্তাররোধ করা সম্ভব নয়। বিষয়টির প্রতি জাতিসংঘের দৃষ্টি প্রদান বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯২ সালে এইড্‌স রোগে মৃত্যুবরণ করে ১,৭১,৮৯০ জন এবং এই রোগে আক্রান্ত ছিল ২,৫৩,৪৪৮ জন। নিউইয়র্ক টাইমসের এক খবরে প্রকাশ বর্তমানে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন নাগরিক যৌনাচারের মাধ্যমে সংক্রমিত এইড্‌স রোগে আক্রান্ত। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এইড্‌স রোগ মোকাবিলার জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে ২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছেন। সিনহুয়া, ওয়াশিংটন। সিসিডি (এউ, এস, এ,)।

যৌন ব্যাধির প্রধান উৎসস্থল পতিতালয়। এই ব্যাধি ক্রমে শিশু, কিশোর ও তরুণদেহে আক্রমণ করে। পতিতালয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুগণ শিক্ষাবঞ্চিত ও চরিত্রহীন হয়। পরিবেশ তাদের মনুষ্যত্ব ও শিক্ষা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে। অকালে তাদের মৃত্যু ঘটে। নোংড়া পরিবেশ নোংড়া মনের জন্ম দেয়।

পতিতাগণ ও তাদের কণ্যারা এই ঘৃণ্য পেশায় জীবন কাটায়, কেননা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সরকার ও সমাজ আগ্রহী নয়। ইসলামী বিধানে তাদের সংশোধন করে সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা তৌবা পড়ে সৎজীবন যাপন করলে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা অর্জন করতে এবং পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে।

৬১। গর্ভপাত ঃ পাশ্চাত্য সমাজে গর্ভপাত ঘটানো আইনতঃ নিষিদ্ধ নয়। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের বিধান মোতাবেক গর্ভপাত ঘটানো আইন সঙ্গত বা আইনতঃ বৈধ করা হয়েছে। প্রতি বৎসর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কন্ট্রাসেপ্‌টিভ ব্যবহার সত্বেও পেটে সন্তান আসায় তারা ক্লিনিকে গিয়ে অপারেশন করায়। অনেকেই সংকোচ ক'রে ক্লিনিকে না গিয়ে বাড়ীতে ডাক্তার এনে অপারেশন করায়। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ বীচ এক জরীপে উল্লেখ করেন—আমেরিকার ওছিও নগরীর স্কুলগামী ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা উনপঞ্চাশ জন ভ্রষ্টা এবং কলেজগামী ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা চুরাশি জন ছাত্রী বিবাহপূর্বে যৌন ব্যবসায় উপার্জন ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করে। আমেরিকায় প্রতি বৎসর এক লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং পঞ্চাশ হাজারের অধিক গর্ভপাত করানো হয়।

আটলান্টার জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (National center for Disease control in Atlanta) এক রির্পোটে প্রকাশ ১৯৮৮ সালে প্রকাশ্যে গর্ভপাতের সংখ্যা তের লক্ষ একাশি হাজার দুই শ' পঁচাশি। (দি অরল্যাণ্ডো সেনটিনেল, আগষ্ট ১০-১৯৯১ পৃষ্ঠা পি, এ, ১ ও ১৮)। এ ছাড়া প্রতি বৎসর আমেরিকায় অবৈধ সন্তান জন্মে গড়ে পাঁচ লাখ। এখানে অবৈধ সন্তান সমাজে অনাদৃত নয়। তারাও বৈধ সন্তানের সমান মর্যাদা লাভ করে।

১৯৯১ সালে আমেরিকায় জাতীয় কংগ্রেসে গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে; তারা শহরে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ফলে প্রেসিডেন্ট বুশের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা সম্ভব হয় না। ওয়াশিংটন শহরে একটি স্কুল-বাসে লেখা দেখেছি—'Abortion kills children' অর্থাৎ গর্ভপাত শিশু হত্যার নামান্তর। বুঝা গেল, প্রচারকারীগণ গর্ভপাত বিরোধী। এই মতের সমর্থকের সংখ্যা অতি অল্প; তাই গর্ভপাতবিরোধী আইন পাশ করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় স্বার্থে একদিন এই আইন পাশ করতেই হবে বলে মনে করি।

৬২। যৌন অনাচার ঃ পাশ্চাত্যে যৌন অনাচার একটি সামাজিক ব্যাধি—যা' ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধির ন্যায় সমাজকে গ্রাস করতে বসেছে। কোন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমানবিক বোমার চেয়েও অধিক মারাত্মক এই ব্যাধি। শিক্ষা ও সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য জগৎ এটাকে কোন সমস্যা মনে করেন কি না বোঝা কঠিন। আইনের চোখে এটা অপরাধ বলে চিহ্নিত থাক্‌লেও তাদের সমাজে কেন গুরুত্ব পাচ্ছে না? ইসলামী আইনে যৌন অনাচারের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

পাশ্চাত্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের শিথিলতার কারণে প্রেমিক-প্রেমিকাগণ যৌন মিলনকে অপরাধ গণ্য করে না। এই অনাচার সীমাহীন। আমেরিকার জাতীয় নির্যাতনকেন্দ্রের তথ্যমতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার নয় শত মহিলা ধর্ষিতা হয়। মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্যে প্রকাশ, তথায় প্রতি মিনিটে ১'৩ জন প্রাপ্ত-বয়স্কা মহিলা ধর্ষিতা হয় স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। এই হিসেবে প্রতি বছর ধর্ষিতার সংখ্যা ৬ লাখ ৮৩ হাজার।

আমেরিকার কতিপয় পত্র-পত্রিকায় দেখেছি—পিতা তার আপন কন্যা বা কন্যাদের সঙ্গে এরূপ জঘন্য আচরণ করায় কন্যা পিতার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছে। এটি কোন একক ঘটনা নয়। বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি, এরূপ বহু ঘটনা পাশ্চাত্যে ঘটে থাকে। বন্ধু বান্ধবী পার্কে বেড়াতে গিয়ে দিবালোকে নিঃসঙ্কোচে পরস্পর মিলিত হয়। লোকে তাদের বিরক্ত না ক'রে দূর দিয়ে যায়। এ-টি স্বাভাবিক ব্যাপার ভিন্ন অনেকেই ভাবে না। একদিন ডোমেস্টিক সার্ভিস প্লেনে নিউইয়র্ক থেকে অরল্যাণ্ডো যাবার পথে 'রেস্টরুমে' (ল্যাট্রিনে) পেশাব করতে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। আমার পিছনে আরো ২/৩ জন লাইন ধরে থাকে। মিনিট দশেক পর একজন পুরুষ ও এক মহিলা একই 'রেস্টরুম' থেকে হাসিমুখে বের হ'য়ে তাদের সিটে গিয়ে বসে। এরূপ ব্যাপার অনুন্নত দেশে ভাবা যায় না।

পাশ্চাত্যের অনেকের ধারণা—চরিত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার। সরকারের আইন মেনে আমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যা-ই করিনা কেন, তাতে অন্যের কী আসে

যায়? ধর্মহীনতার কারণেই এরূপ মনোভাব জন্মলাভ করে। কিন্তু এর পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে, সমাজপতিদের তা' চিন্তা করা উচিত। দুরারোগ্য এইড্‌স রোগের আতঙ্কে তারা অস্থির, কিন্তু এইড্‌সের মূল কারণ অনুসন্ধান করা কি তাদের কর্তব্য নয়?

খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ব্যভিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তোমরা শুনিয়াছো, এই কথা বলা হইয়াছে—'ব্যভিচার করিও না'। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, যেকেহ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কু-নজরে তাকায়, সে তখনই মনে মনে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করিল। তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে পাপ করায়, তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দাও। তোমার সমস্ত দেহ দোজখে পোড়ার চাইতে বরং একটি অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।

যদি তোমার ডান হাত তোমাকে পাপ করায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। তোমার সমস্ত দেহ দোজখে যাওয়ার চাইতে বরং একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।' (মথি ১ম খণ্ড ৫: ২৭—৩০)

বাইবেলের এই নির্দেশ খৃষ্টান সমাজ পালন করলে তথায় ব্যভিচার বা অন্যায় থাকতে পারেনা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের অভাব এবং ধর্ম পালনে অনীহা ও শিথিলতার কারণে যৌন অনাচারের সয়লাব বয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের কবি ফারুক নওয়াজ এক ছড়ায় আমেরিকা সম্পর্কে লিখেছেন:

আজব দেশ আমেরিকা, সকল দেশের সেরা,
কল টিপ্‌লে খাবার আসে, চোখ টিপ্‌লে মেয়ে।'

খৃষ্টধর্মের উদারনীতি—'কেউ তোমার ডান গালে চড় দিলে, তাকে বাম গাল পেতে দেবে; কেউ তোমার সার্টটির আবদার করলে তাকে তোমার কোটটিও দেবে।' এটি বাইবেলের কথা কিন্তু কোথায় এর বাস্তব প্রয়োগ?

৬৩। আত্মহত্যা: শিকাগো মেডিক্যাল সেন্টারের এক রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকায় প্রতি বৎসর গড়ে পাঁচ হাজার তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করে। এর অধিকাংশই প্রেমঘটিত কারণে। সাধারণতঃ পনর হতে চল্লিশ বৎসর বয়স্কদের আত্মহত্যার মাত্রা অধিক। আত্মহত্যাকারীদের শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষ এবং পঁচিশ ভাগ মেয়ে। আত্মহত্যার দিক দিয়ে আমেরিকা সম্ভবতঃ বিশ্বে সর্বোচ্চস্থান দখল ক'রে আছে।

চোখের নেশায় যে প্রেম ঘটে, তা' প্রকৃত প্রেম নয়—কামলিপ্সা। সুতরাং এর স্থায়িত্ব বলে কিছু থাকে না; অনেক ক্ষেত্রে একই প্রেমিকার একাধিক প্রেমিক থাকে। এরূপক্ষেত্রে দুর্বল মানসিকতার (Sentimental) প্রেমিক আত্মহত্যা ক'রে ব্যর্থতার গ্লানি ও অন্তর্জ্বালা থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

প্রেমঘটিত কারণে অসংখ্য যুবক-যুবতী হিরোইন, ফেন্সিডিল, মারিজুনা প্রভৃতি ড্রাগসে আসক্ত হয়। ড্রাগস তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি ক'রে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ ক'রে ফেলে। শিকাগোর জনৈক সমাজকল্যাণ অফিসার

রীণা ব্রুস বলেন, জীবনের ব্যর্থতা, ভাবাবেগ ও প্রেমে ব্যর্থতার জন্য অধিকাংশ প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আমেরিকার জীবনে চারিত্রিক নৈতিকতার মূল্য অধিকাংশেরই আছে কিনা সন্দেহ। নারী-পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক অনেকেরই আত্মিক বিশ্বাস ও পরকালের চিন্তা অন্তর থেকে বিদূরীত করে থাকে।

৬৪। সামাজিক ব্যাধি ঃ মানবসমাজে অনেকেই নিজের দোষ নিজে দেখে না, দেখ্‌লেও শয়তানের চক্রান্তে তৎপ্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না; ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য জগতের সমাজপতিদের অধিকাংশই নিজেদের সামাজিক ব্যাধি উপেক্ষার চোখে দেখেন।

সমাজের জ্বর চোখে ধরা পড়ে না, থার্মোমিটারেও মাপা যায় না; কিন্তু জরাক্রান্ত সমাজের বিকার ও প্রলাপ বকা দেখে সহজেই বোধগম্য হয় যে, সে-সমাজ ব্যাধিগ্রস্থ। এবং এ-ব্যাধি মরণ ব্যাধিও হতে পারে। এই ব্যাধির হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে এম, বি, বি, এস, এম, ডি, এফ, আর, সি, এস ডাক্তারে কাজ হয় না। সামাজিক রোগ নিরাময়ের জন্য আদর্শবাদী সমাজ-চিকিৎসক প্রয়োজন। কোন ঔষধ বা ইনজেক্‌শনে সমাজের রোগ সারে না। কেবলমাত্র সঠিক আদর্শই পারে সমাজের রোগ দূর করতে। বিশ্ব-সমুদ্রে কতই না আদর্শের তরঙ্গ প্রবাহমান। তন্মধ্যে খাঁটি সোনা পরীক্ষার কষ্ঠিপাথরে একটিমাত্র টেকসই বলে প্রতিপন্ন হয়, তা' হ'ল স্রষ্টা প্রদত্ত আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই পারেন মানুষের চলার পথের নির্দেশ দিতে। তাঁর নির্দেশই বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ।

বিভিন্ন যুগে যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে বিশ্বের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। আজও যারা তাদেরই অনুসারী, তা' দিগকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে,—এটা ধ্রুব সত্য। যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সংশোধনের পথে আসেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান। তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হজরত ওমর (রাঃ) এঁর মত বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। বিশ্ববাসী চিরকাল তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। লক্ষ লক্ষ রাজা বাদশা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। কে তাদের স্মরণ করে, বা তাঁদের কবরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানায়? অথচ আল্লাহ্‌র পথের ফকির দরবেশদেরও মানুষ ভোলে না; অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষ চিরকাল তাঁদের জন্য দোওয়া করেন।

৬৫। শেষ কথা ঃ একই স্রষ্টার সৃষ্টি বিশ্বের সকল মানুষ। একই পিতার সন্তানেরা যেমন পরস্পর ভাই ভাই; তারা রক্তের সম্পর্কে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। অনুরূপ একই বিশ্বপিতার সন্তান হিসেবে প্রত্যেক মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। সবার ধমনীতে আদি পিতা হজরত আদম ও আদি মাতা হাওয়ার রক্ত প্রবাহিত। হাসি-কান্না, দুঃখ-ব্যথা, অনুভূতি সবার মধ্যেই বিদ্যমান। ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন সবার প্রাণই স্রষ্টার কাছে সমান মূল্যবান।

একের প্রতি অপরের ভালবাসা ও সহমর্মিতার নামই মানবতা। মানবতা-বোধ বর্জিত মানুষ পশুরও অধম। মানবদেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে বা আঘাত পেলে সারা দেহ তা' উপলব্ধি করে; তেমনি উদার দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের সকল মানব এক অখণ্ড সত্তা—একই দেহস্বরূপ। তারা একই জাতি; সে-জাতির নাম মানবজাতি। বিশ্বের সকল মানুষ একই বিশ্ব-পরিবারের সন্তান। সবাই ভাই ভাই। এই উপলব্ধির নামই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব।

কোন পরিবারের সুখ-শান্তি সেই পরিবারের কর্তা বা অভিভাবকদের আচার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। তদ্রূপ বিশ্বপরিবারের উন্নতি ও সুখশান্তি নির্ভর করে বিশ্বপরিবারের অভিভাবক তথা নেতৃবর্গের উপর। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিচালনার মাধ্যমে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। পক্ষপাতিত্ব, অন্যায় ও অবিচার যেমন কোন ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করে না, তেমনি বিশ্ব-জাতিরক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। বিশ্বের সকল দেশের সুখ-শান্তি বিধানই বিশ্ব-অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে তাঁদের উদার অন্তরের পরিচয়। ধ্বংস নয়, সৃষ্টি করাই মহত্বের লক্ষণ। মানবাধিকারের শ্লোগানের আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতি বিশেষকে নিপাতের ষড়যন্ত্র কি মানবতার পরিচায়ক?

মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মখ্লুকাত) ক'রে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি বিশ্বের বুকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা। স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে তাঁর বিধান মত কর্তব্য সম্পাদনই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে দুর্বলের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়ার নাম ন্যায়বিচার হতে পারে না। বরঞ্চ দুর্বলকে রক্ষা করা বা পালন করার নামই ন্যায়নীতি বা মানবতা। এটাই স্রষ্টা নির্দেশিত আদর্শ। ক্ষমতার দর্পে বা শক্তির দাপটে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করা কাপুরুষের লক্ষণ।

স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাই তার উপর অর্পিত দায়িত্বও বিরাট। এই বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে যারা সচেতন তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। বড়র দায়িত্ব বড়—একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্বকে সুখশান্তির আবাসরূপে গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেকেরই স্রষ্টার বিধান পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

বিশ্বের বুকে বিভিন্ন দেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে বা অতীতে চলেছে, তার প্রধান কারণ স্বার্থের হানাহানি। স্বার্থের কারণে মানুষ মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলে। অন্যায় পথে পা বাড়াতে তখন আর তাদের বিবেক বাধা দেয় না। অন্যায়কারী ভুলেও ভাবেনা তার অপরাধের শাস্তির কথা। যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক, তাঁরা অন্যায় করতে পারেন না। অন্যায় কাজে তাঁদের জাগ্রত বিবেক বাধা দেয়।

যেকোন দেশে বা সমাজে অন্যায়, অনাচার ও অশান্তির মূল কারণ ধর্ম-বিমুখতা। মানুষ ধর্মসচেতন হলে তার দ্বারা অন্যায় বা অপকর্ম সাধিত হওয়া অসম্ভব।

অসুস্থ ব্যক্তিকে বাঁচানোর প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রে অপারেশন ক'রে তার অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়; তেমনি স্রষ্টা বিধান রেখেছেন সমাজদেহে অপারেশন বা শাস্তির। কিন্তু তাঁর নির্দ্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা চল্‌বে না। তিনি মানুষকে বিশ্বের বুকে চলার জন্য পথ-নির্দ্দেশ বা জীবনবিধান দান করেছেন। তাঁর বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ও মেনে চলাই প্রকৃত ধার্মিকের কর্তব্য। যারা আংশিক মেনে চলে, তারা পূর্ণ-বিশ্বাসী নয়; তারা বকধার্মিক। তাদের জন্য পরকালে মোনাফেকির শাস্তি অবধারিত।

স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং মানব জাতির জন্য তাঁর প্রদত্ত জীবন-বিধানও এক ও অভিন্ন। তিনি যুগে যুগে, দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবী (প্রেরিত পুরুষ) পাঠিয়েছেন। তাঁদের সকলকেই স্বীকার করা ও সম্মান দেবার নির্দেশ মহান স্রষ্টা কোরআন মজীদে দিয়েছেন। কোন যুগের নবীকে অস্বীকারকারী বিশ্বাসী (ঈমানদার) হতে পারে না।

ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির প্রেরিত পুরুষ মুসলমানদের নবী হজরত মুসা * (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ)। কোরআন পাকে তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। মুসলিম জাতি তার প্রতিটি বর্ণ বিশ্বাস করেন।

আমরা পানি পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করি। বিশ্বের সকল মানুষ, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষরাজি সবার জন্যই পানি অপরিহার্য। সর্বত্র পানির কাজ পানি (H_2O) ক'রে থাকে। পানির মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সর্বত্র একই অনুপাতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের সব দেশে, সব ভাষায় পানিকে পানি বলে না। ভাষাভেদে ও জাতিভেদে একই বস্তু বিভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন, পানিকে ইংরেজীতে 'ওয়াটার', আরবী ভাষায় 'মাউন', বাংলায় 'জল', পারশীতে পানি বলা হয়। পানিকে যেখানে যে-নামেই অভিহিত করা হোকনা কেন, সর্বত্র পানির কাজ একই। কোথাও তার ব্যতিক্রম নাই। একই পানির বিভিন্ন নামের কারণে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে মারামারি হানাহানি বাধে না। মহান স্রষ্টার অফুরন্ত নিয়ামত পানি—যা বিশ্বের শতকরা ৮৫ ভাগ স্থান দখল ক'রে আছে (সমুদ্র ও জলাশয়ে ৭৫ ভাগ এবং ভূগর্ভে ১০ ভাগ)।

কিন্তু মানব সমাজে দেখা যায়, স্রষ্টা প্রদত্ত বিনামূল্যের পানির কারণে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও সংঘাত—যার মূল কারণ অন্যায়, অবিচার ও স্বার্থপরতা। কারো পানি বন্ধ করা বা কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারা যেমন অমানবিক, তেমনি কোন দেশকে বা জাতিকে তার ন্যায্য প্রাপ্য

* হজরত মুসা (আঃ) মিসর দেশে খৃঃ পূঃ ১৩৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ১২৩১ অব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

পানি থেকে বঞ্চিত করা অনুরূপ অন্যায় নয় কি? আমার বিশ্বাস একমাত্র অজ্ঞান ও পাগল ছাড়া সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন—এটা চরম অন্যায়। অনুরূপ ধর্মের আবেদন। ধর্মকে যেজাতি যে-নামেই অভিহিত করুন না কেন, ধর্মের মূল লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয়—তা' হ'ল স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য।

প্রথম নবী হজরত আদম (আঃ) সৃষ্টার আনুগত্য স্বীকার ক'রে পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর অধঃস্তন প্রেরিত পুরুষ হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ)—যিনি যিশুখৃষ্ট নামে খৃষ্টান জাতির নবী এবং হজরত মুসা (আঃ) —যিনি ইহুদী জাতির নবী—সবাই সৃষ্টার প্রতি একই আনুগত্য পালন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে একমাত্র সৃষ্টার আনুগত্য করার শিক্ষা দান করেছেন। তাঁদের কাজ ছিল অভিন্ন কিন্তু ভাষা বিভিন্ন। তাঁদের কথা ঐশী কিতাব 'আল্ কোরআন' মাধ্যমে জানা যায়। তাঁরা যেমন নবী ছিলেন, তদ্রূপ বিশ্বের বুকে বহু নবী বা পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের সবারই কাজ ছিল—সৃষ্টার আনুগত্য পালন করা এবং অপরকে পালন করতে শিক্ষা দান করা। সর্বশেষ নবী-নবীকুল শিরোমণি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য পালন করেছেন এবং মানুষকে তা' পালন করতে শিখিয়েছেন।

হজরত ঈসা (আঃ) এঁর উপর ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জিল বা বাইবেল, হজরত মুসা (আঃ) এঁর উপর ঐশীগ্রন্থ তৌরাত বা তোরাহ্ নাযিল হয়। কোরআনের শিক্ষা মোতাবেক মুসলিম জাতি তা' একবাক্যে স্বীকার করেন। সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর উপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিশ্ব মানবের জন্য নাযিল হয় সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল্-কোরআন বা ফোরকান (পার্থক্য নির্দেশ-কারী)। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্য এবং বিশ্বের বুকে মানবের চলার পথের নির্দেশ বা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান দান করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এই জীবনবিধানের নামই হ'ল ইসলাম। 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ (আনুগত্য) ও শান্তি। এককথায় ইহকালীন ও পারলৌকিক শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ বা তাঁর আনুগত্য পূর্ণভাবে স্বীকার করা।

বিশ্বের বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থে শেষনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর আগমনের পূর্বাভাষ দেয়া আছে—যেন মানব জাতি বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে। ইহুদী সম্প্রদায়ের নবী হজরত মুসা (Moses) (আঃ) ভবিষ্যত বাণী ক'রে গেছেন—'বণী ইসরাইল বংশের ভ্রাতৃগণ! তোমরা জেনে রাখো—বণী ইসরাইল বংশে আমার ন্যায় বা আমার আদর্শ-সম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী নবী জন্মগ্রহণ ক'রে সত্য ও সনাতন ধর্মের পূর্ণতা সাধন করবেন।'

তিনি যাঁর ইঙ্গিত ক'রে গেছেন, তিনি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ভিন্ন আর কেউ নন; কেননা তাঁর সময়েই আল্লাহ্‌র দ্বীন পূর্ণত্ব লাভ করে।

ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে হজরত ঈসা (আঃ)—যাঁকে খৃষ্টান জগত মহাত্মা যিশুখৃষ্ট বলেন, তিনি বলেছেন : If you love me, Keep my commandments, And I will pray to the Father and He will give you another Comforter that he may abide with you for ever.' St, John, 14 : 15—16.

(তোমরা যদি আমাকে ভালবাসো এবং আমার আদেশসমূহ পালন করো, তা' হলে আমি পিতার (বিশ্বপিতার) নিকট প্রার্থনা করবো এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন শান্তিদূত প্রেরণ করবেন—যিনি তোমাদের চিরসঙ্গী হবেন অর্থাৎ যাঁর বিধান তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হবে)

যিশুখৃষ্টের পরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ভিন্ন আর কোন নবীর আগমন ঘটে নাই, তিনিই সর্বশেষ নবী। সুতরাং যিশুখৃষ্ট যে-শান্তিদূতের কথা বলেছেন—তিনি শেষনবী ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারেন না।

দ্বীন ইসলামের কতিপয় বিধিবিধান খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যেমন খাৎনা দেয়া, উপাসনা, দান, পরোপকার, মৃতকে সমাধিস্থ করা ইত্যাদি। ইহুদীদের মসজিদকে 'সিনাগগ' এবং খৃষ্টানদের 'গীর্জা' বলা হয়। ইহুদীদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে হারাম হালাল রয়েছে। হালাল খাদ্যকে তাঁরা 'কোষার' বলেন। তাঁরা নামাজ পড়েন (তাঁদের নিয়মে) সকাল, দুপুর ও বিকালে দৈনিক ৩ বার। পুং শিশুদের জন্মের পর অষ্টম দিনে খাৎনা করা হয়। তাঁরা সৃষ্টার একত্বে বিশ্বাসী।

কোন দেশের অতীতের শাসনতন্ত্র পরবর্তীকালে সংশোধিত হ'লে, সংশোধিত শাসনতন্ত্রই সেই দেশবাসীর জন্য শিরোধার্য হয়। অনুরূপ স্রষ্টা কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধিত ও সংযোজিত ঐশীকিতাব 'আল্-কোরআন' মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় জীবনবিধান।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, দু'টি বিন্দুর সংযোগ সাধন করতে পারে—একটি মাত্র সরলরেখা। অনুরূপ 'স্রষ্টা' এবং তাঁর 'সৃষ্টিকে' দু'টি বিন্দু কল্পনা করলে উভয়ের সংযোগ সাধিত হ'তে পারে একটি মাত্র সরলপথে—তারই নাম দ্বীন বা জীবনবিধান।

সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এ'র মাধ্যমে আল্লাহপাক তাঁর দ্বীনকে পূর্ণত্ব দান করেছেন (আল্কোরআন)। এটা যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁরা মুসলমান ; আর যাঁরা না মেনে তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা ইহুদী, খৃষ্টান, নাসারা বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক জাতি। ইসলাম যে স্রষ্টা অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান—এটা যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা ইসলামে দাখিল হয়েছেন। যাঁরা তা' বুঝতে চেষ্টা করেননি বা উপলব্ধি করতে অক্ষম তাঁরা দূরে রয়েছেন। ইংরেজ কবি বলেছেন : 'A thing of beauty is a joy forever.'—যা সত্যিকারে সুন্দর তা' সব মানুষের জন্যই আনন্দদায়ক। সৌন্দর্যের উপলব্ধি যার মধ্যে নেই, সে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ বঞ্চিত।

হিংসার অনল মানুষকে দগ্ধীভূত করে। হিংসুক নিজেও শান্তি পায় না, অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। এ কথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। ইসলামের মতবাদ অত্যন্ত উদার—এ কথা ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মবিশ্বাসী বহু মনীষী স্বীকার করেছেন।

প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। এমনকি বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখা অন্যতম নির্দেশ। কারো প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করা, কাউকে অধিকার বঞ্চিত করা বা অবিচার, ব্যভিচার করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শুধু নিষিদ্ধই নয়, তার জন্য চরম শাস্তির বিধানও রয়েছে। বিশ্বের বুকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন এবং পরকালে শাস্তির হাত হতে রক্ষা পাবার সহজ সরল পথ (সিরাতুল্ মোস্তাকীম্) ইসলামী জীবনবিধান।

মুসলমানগণ যাঁদের নবী বলে স্বীকার করেন, সেই নবীর অনুসারী ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কোন যুক্তিতে মুসলিম জাতির প্রতি বিরূপ আচরণ করতে পারেন, তা' ভাবা যায় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়। ইহুদী-খৃষ্টান এক জোট হয়ে মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিলে তার নাম কি মানবতা? কোন উন্নত, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতির পক্ষে এরূপ করা লজ্জাকর নয়কি?

ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট ঘটনা ঃ এককালের বিশ্ববিখ্যাত পপ গায়ক মিঃ ক্যাটষ্টিভেন্স ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামী নাম হয় ইউসুফ ইসলাম। তিনি ১৯৮৩ সালে উত্তর পশ্চিম লণ্ডনের বেরেন্টে একটি বে-সরকারী ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটেনে স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে স্থানীয় কতৃপক্ষ ৮৫% ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। খৃষ্টান ও ইহুদী পরিচালিত বে-সরকারী বিদ্যালয়সমূহ ভর্তুকি পেয়ে থাকে, কিন্তু মুসলমানদের পরিচালিত বিদ্যালয়হেতু তারা ভর্তুকি পান নাই। এটা কি জাতিগত বিদ্বেষ নয়? মুসলিম শিক্ষা ট্রাষ্টের বক্তব্য—বৃটিশ সমাজে সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা বৈশিষ্ট্য হলেও, এ-ক্ষেত্রে তার প্রমাণ কোথায়?

রক্ষণশীল দলীয় বৃটিশ এম, পি, স্যার রোডস্ বয়মন বলেন, শিক্ষাগত ও ধর্মীয় দিক থেকে সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি বিপর্যয়কর ব্যাপার। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়টি আমি পরিদর্শন করেছি। বিদ্যালয়টিতে ভাল শিক্ষকও আছেন।'

এরূপ সুপারিশেও কাজ হয়নি বলে জানা যায়। বৃটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অনভিপ্রেত। পত্রিকাসূত্রে প্রকাশ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জনমেজর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 'ইউরোপের বুকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটবে এটা পাশ্চাত্য জগৎ মানতে পারে না।' এটাকি খৃষ্টধর্মের শিক্ষার ব্যতিক্রমধর্মী মন্তব্য নয়? এ-ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বৃটেনের অভিমতই সমর্থন করেন বলে কার্যতঃ প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেরাল্ড ট্রিবিউনের খবরে প্রকাশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রশাসনের দ্বি-মুখী নীতির প্রতিবাদে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ক্রোশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মিঃ লিটফেন ওয়াকার পদত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর পত্রে বলেন ঃ 'বসনিয়ায় আগ্রাসন ও গণহত্যাকে বৈধ করা হয়েছে—বলে আমি মনে করি এবং তা' আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।' তিনি আরো বলেন,—'ওয়াশিংটন সার্ব হানাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে ; যার ফলে হাজার হাজার নিরস্ত্র লোক বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ করেছে। বসনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-মুখী নীতির ফলে একটি ভয়াবহ নজির স্থাপিত হয়েছে। ইউরোপে পুনরায় গণহত্যা অনুষ্ঠিত হলো, অথচ আমরা মার্কিনীরা ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব নিশ্চলভাবে অবলোকন করা ছাড়া কিছুই করতে পারিনি।'

তিনি ক্লিনটন প্রশাসনকে মুসলমানদের অস্ত্র সরবরাহের আহবান জানান এবং বসনিয়ার প্রকৃত সীমা রক্ষার কথা বলেন। তিনি মানবাধিকার রক্ষা এবং যুদ্ধোপরাধী ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘণকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। মিঃ ওয়াকার এবং তাঁর ন্যায় আরো যে-সকল মার্কিন কর্মকর্তা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন, তাঁরা মানব জাতির ধন্যবাদের পাত্র। আমেরিকায় নিজদেশের প্রশাসনের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানাবার মত লোকের যে অভাব নাই—এটি তার বাস্তব প্রমাণ। (দৈনিক সংগ্রাম, ২/৯/৯৩ ইং)।

পাশ্চাত্য সমাজে নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় নিষ্ঠার অভাব ক্ষেত্র বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, অর্থলিপ্সা, অহমবোধ ও কামোন্মাদনা তা'দিগকে ভ্রান্তপথে নিয়ে চলেছে। তাঁরা ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করলেও অনেকেই ধর্মের নৈতিকতা পালনে পরাঙ্মুখ। এর মূল কারণ, পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাসের অভাব বলে অনুমিত।

দেখে মনে হয়, পাশ্চাত্য জগৎ দুনিয়াভি উন্নতিকেই তাঁদের মূল লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ধর্মের সততা যাচাই করার আকাঙ্খা অনেকের মধ্যেই নেই। তাঁদের এ-ভুল একদিন ভাঙ্গবে—আশা রাখি।

●

দেশে ফেরার পালা

কিসিমির 'লেক বুয়েনা ভিস্তা জামা মস্‌জিদে' অনুষ্ঠিত ভোজ সভায় সবার নিকট বিদায় গ্রহণ করি। অতঃপর ভ্রাতুষ্পুত্র সালমান-সাজিদের বাড়ী গিয়ে সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিদায় নিয়ে আসি। পরদিন নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ক্যানাডার 'কন্টিনেন্টাল এয়ার সার্ভিসের' প্লেনে সকাল ১১-৪৫ মিনিটে অরল্যাণ্ডো ত্যাগ ক'রে বিকেল আড়াইটায় নিউইয়র্কে পৌঁছি। ছোটভাই সোহ্‌রাব আমাকে তার বাসায় ফিলাডেলফিয়ার ফেয়ারলেস হিল্‌সে নিয়ে যাবার জন্য কারসহ বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে নিউইয়র্কে ছোটভাই শরীফের বাসায় যাই। সেখানে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-বিশ্রামে তিন ঘন্টা কাটায়ে সাড়ে পাঁচটায় ফেয়ারলেস হিল্‌সে রওনা হই। আটটায় পৌঁছি।

পরদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ীর নিকটস্থ একটি ক্লাব দেখতে যাই। সেখানে শ' খানেক যুবককে শরীর চর্চা, বক্সিং, কারাত, টেনিস, ভলি, বাস্কেট বল, সাঁতার ও পোলো খেলতে দেখি। ভাতিজা এরিক ও রব আমাকে ক্লাবটি দেখাবার জন্য তাদের আব্বার কাছে প্রস্তাব রেখেছিল। তারাও আমাদের সঙ্গী হয়। আমি বাংলাদেশী জেনে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আমাকে ক্লাবের উদ্দেশ্য—আদর্শ সম্বলিত একটি পুস্তিকা দেন। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করি।

ক্লাবের জনৈক সদস্য আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ দেখান। সুইমিং পুলে অনেককে সাঁতার কাটতে দেখলাম, যদিও তখন রাত দশটা। আমাদের গাইড সদস্যটি বললেন, এখানে নার্সারী-পূর্ব বয়সের শিশুদের (Pre-school boys and girls) একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সাঁতার শিখানো হয়।

ক্লাবটির অফিসে দেয়ালগাত্রে লেখা পড়ি—'Every man cannot do everything, but every man can do something.'—প্রত্যেক ব্যক্তি সবকিছু করতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই কিছু কিছু করতে পারে।

পরদিন এক বীজভাণ্ডার থেকে আমাদের গ্রামের কলেজ বাগানের জন্য কয়েক প্রকার ফুলের বীজ ক্রয় করি। এখান থেকে বিদায়ের কয়েক ঘন্টা পূর্বে আমাদের বাসায় ডঃ আব্দুস সালাম নামে বাংলাদেশী এক মেহমান আসেন সপরিবারে। তাঁদের বাড়ী সিরাজগঞ্জ জেলার চৌবাড়িয়া গ্রামে। তিনি এক সময়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক (ডীন) ছিলেন। মিসেস সালাম, তাঁদের জ্যেষ্ঠাকন্যা, জামাতা (মিঃ ফেরদৌস) ও নাতনী ফারার সঙ্গে আলাপ হয়। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, ডঃ সালামের শ্বশুর বাড়ী ঈশ্বরদী এবং তিনি দুই পুত্র ও তিনটি কন্যার জনক। বেলা একটায় মেহমানদের সঙ্গে একত্রে খানা খাই। অতঃপর তাদের বিদায় দিয়ে আড়াইটায় সোহ্‌রাবের সঙ্গে নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করি। পাঁচটায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছি।

কয়েকদিন নিউইয়র্কে ছোটভাই শরীফের বাসায় অবস্থানের পর ১০ই অক্টোবর সকাল ১০টায় ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের বিমানে লণ্ডন হয়ে ঢাকার পথে রওনা হই। আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে বিমান বদল ক'রে আমাকে অন্য বিমানে লণ্ডনে যেতে হবে। আবুধাবীতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা অবস্থান করি। এই অবসরে এখানকার মার্কেট ঘুরে দেখি এবং আরব আমীরাত সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি।

আরব আমিরাত

সাতটি ক্ষুদ্র দেশ সমন্বয়ে আরব আমিরাত রাষ্ট্র গঠিত। দেশ কয়টিঃ আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ, রাস-আল-খীমা, আজমান, ফুজারহা, উলুম কুইন। প্রতি দেশের শাসনকর্তা শেখ নামে অভিহিত। সাতটি দেশের সাত জন শেখ আমিরাতের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সাতজন শেখের মধ্য হতে তাঁদের ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট বা আমির নির্বাচিত হন।

আবুধাবী সিটি আরব আমিরাত ও আবুধাবী স্টেট উভয়ের রাজধানী। জানা গেল, বিশ পঁচিশ বছর পূর্বে আবুধাবী ছিল মরুভূমি অঞ্চল। তখন সেখানে গাছপালা, বাড়ী ঘর ছিল না। আরব আমিরাত রাষ্ট্র গঠনের পর তথায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত বিরাট বিরাট অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, পুষ্পোদ্যান ও বৃক্ষরাজি সজ্জিত রাজধানী আবুধাবী গড়ে তোলা হয়েছে।

আবুধাবী বিমান বন্দর হতে রাজধানী সিটির দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। বিমান বন্দরটি আকারে খুব বড় না হলেও সুন্দর পুষ্প সদৃশ। বিমান বন্দরের লাউঞ্জের নীচের তলায় (গ্রাউণ্ড ফ্লোরে) একটি ছোট্ট মসজিদে জোহর ও আছর নামাজ আদায় করি। দরজায় আরবীতে 'মাস্‌জিদ' লেখা থাক্‌লেও প্রকৃতপক্ষে এ-টি একটি নামাজ ঘর। বড়জোর ১২/১৪ জন মুসল্লী একসঙ্গে জামাতে নামাজ পড়তে পারেন।

আরব মুল্লুকে আরব আমিরাতের রাজধানী সিটির বিমান ঘাটিতে এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ কেন—স্থানীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করায় জান্‌তে পারলাম, টারমিনালের সন্নিকটে বড় মস্‌জিদ আছে। কিন্তু অবস্থানরত যাত্রীদের সেখানে যেতে দেয়া হয় না। তাদের জন্যই এখানে নামাজঘরটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

লাউঞ্জটি কয়েকশত সৌখিন চেয়ার ও ইজি চেয়ারে সুসজ্জিত। এখানে এস্কেলেটর ও মুভিং বেল্ট-এর ব্যবস্থা আছে। তা' ছাড়া যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কতিপয় টেলিফোন রয়েছে।

আবুধাবীর এলান শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুবাইয়ে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আরব আমিরাতসহ ভূমধ্যসাগরীয় একুশটি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবী। সবগুলো মুসলিম দেশ। এখানে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও অধুনা ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয় এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদের ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পাঠানো হয়।

আরব আমিরাতের লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ। এর শতকরা মাত্র দশজন স্থানীয় বাসিন্দা। অবশিষ্ট শতকরা ৯০জন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে তেল সমৃদ্ধ আরব দেশে চাকরী বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে বসবাস করছেন। এদেশের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল।

গ্রামবাসীদের মৎস্য শিকার ও পশুপালন প্রধান ব্যবসা। উট, দুম্বা, গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর তাদের গৃহপালিত পশু। কৃষকগণ গম, বালি, ভুট্টা, টম্যাটো, করলা, মূলা, গাজর ও বিবিধ শাকসব্জী উৎপন্ন ক'রে থাকে। এখানে ফলের মধ্যে খেজুর, তরমুজ, খরমজ, লেবু, কুল ও কলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধুনা আম, কাঁঠালের বাগান গড়ে তোলার চেষ্টা চল্‌ছে বলে জানা গেল।

অধিবাসীগণ মুসলমান কিন্তু বংশ ও গোত্রের বড়াই তাদের মধ্যে প্রকট। বনেদী বংশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে শাদী অত্যন্ত ব্যয় বহুল। জানা গেল, দুবাই শেখের এক ছেলের বিবাহে ৭ দিন ধরে গণভোজ (Open feast for all), বিবিধ আচার অনুষ্ঠান, গান বাজনা ইত্যাদি চলে। এই বিবাহে ২০ হাজার দুম্বা, কয়েক হাজার উট, গরু, খাশী, ভেড়া জবাই হয়। সাধারণ লোকের পুত্রকন্যাদের বিয়েতেও অন্ততঃ তিন দিন অনুষ্ঠান চলে। বরপক্ষ কন্যার পিতাকে ৫০/৬০ হাজার থেকে লক্ষাধিক বা কয়েক লক্ষ দিনার (১ দিনার = ১০'৬০ টাকা) মহরাণা প্রদান ক'রে থাকে। তা' ছাড়া কনেকে গা ভর্তি সোনার গহণা ও দামী পোষাক পরিচ্ছদ দিতে হয়। বিবাহে অত্যধিক খরচের কারণে সাধারণ ঘরের অনেক যুবক দেশের মেয়েকে শাদী না ক'রে বিদেশ থেকে (প্রধানতঃ মিসর, পাকিস্তান ও ভারত থেকে) সস্তায় শাদী ক'রে আনে। ফলে এদেশের অনেক মেয়ে আইবুড়ো বা চিরকুমারী রয়ে যায়। মেয়ের অভিভাবকগণ আভিজাত্যের গৌরবে অল্প দেনমহরে মেয়ে বিয়ে দিতে নারাজ। দেশের সরকার অবিবাহিতা মেয়েদের দুর্গতির হাত হতে উদ্ধারকল্পে দেশের ছেলেমেয়েদের বিবাহে বরকে মোটা অংকের এককালীন আর্থিক অনুদান এবং কয়েক লক্ষ দিনার পর্যন্ত কুসিদমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকেন। প্রায়ক্ষেত্রেই এরূপ ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকে না।

এদেশের প্রাচীনেরা শিক্ষার দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। বয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন (পুরুষ ও মেয়ে) অশিক্ষিত। কিন্তু তরুণ, কিশোর ও যুব সমাজের অধিকাংশই শিক্ষিত। সাধারণভাবে লিখ্‌তে পড়তে জানা লোককেই শিক্ষিত বলে গণনা করা হয়। সরকার শিশুদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। এখানে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত, তবে শ্রমিক, মুটে ও কুলী শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সবাই অশিক্ষিত।

আরব আমিরাতের রাষ্ট্র ভাষা আরবী। আরবী ভাষায় স্কুলকে মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে'জামেয়া' বলা হয়। আবুধাবীতে ~~এলান বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুবাইতে~~ আল্-আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

মাষ্টার্স পর্যন্ত পড়ানো হয়। এম-ফীল, ডি-ফীল, ডি-লিট, বা ডক্টরেট করার ব্যবস্থা আজো প্রবর্তিত হয়নি। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমোন্নতিদৃষ্টে আশা করা যায় অচিরেই গবেষণামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। এদেশে শিক্ষার স্তরসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) নার্সারী বা কিণ্ডার গার্টেন (শিশু শ্রেণী), (২) প্রাইমারী স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত), (৩) সেকেণ্ডারী স্কুল (১০ম শ্রেণী), (৪) হাইয়ার সেকেণ্ডারী (দ্বাদশ শ্রেণী), (৫) বিশ্ববিদ্যালয় (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)। অবশ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের আরবীতে পৃথক পৃথক নাম আছে।

এদেশে ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে বিদেশীদের পরিচালিত কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে দুবাইয়ে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল' অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি সিরাজগঞ্জ জেলার চরবেলতৈল গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক মতিউর রহমান কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮৭ সাল হতে পাবনা জেলার বেড়া থানার আমিনপুর গ্রামের অধ্যাপক মোঃ নূরুল আলম রইসী অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যালয়টি সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। তিনিও একজন সুসাহিত্যিক ও সমাজসেবক। স্কুলটির বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিন শত। তন্মধ্যে বাংলাদেশী ছাত্র শতকরা ৮৫ জন। পাকিস্তানী ১২% এবং ভারতীয় ও অন্যান্যদেশীয় ৩%। শিক্ষকসংখ্যা ১৩ জন ঃ বাংলাদেশী—৬, ভারতীয়—৬ ও পাকিস্তানী—১ জন। প্রতি ছাত্রছাত্রীর ভর্তি ফি ২০০ দিনার, রেজিষ্ট্রেশন ফি—১০০, মাসিক বেতন ঃ কেজি শ্রেণীর ১০০ ও ১১০, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ১২০, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৪০ এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১৬০ দিনার। বাসভাড়া ঃ দুবাইয়ের প্রতি ছাত্রের ৬০ দিনার এবং শারজাহ-এর ছাত্রপ্রতি ৭৫ দিনার দিতে হয়।

সরকার বিদ্যালয়টিকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেন না। বরং বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারকে প্রতি বৎসর বাংলাদেশী মুদ্রায় এক লক্ষ টাকার অধিক লাইসেন্স ফি দিয়ে থাকেন। তা' ছাড়া স্কুল ভাড়া লাগে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য স্কুলটির ৪ খানা বাস আছে। তা' ছাড়া মেডিক্যাল ক্লিনিক, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদিও রয়েছে।

স্কুলটিতে ইংরেজী মিডিয়ামে শিক্ষাদান করা হয়। বাংলাদেশী ছাত্রদের জন্য বাংলাশিক্ষা বাধ্যতামূলক। অবশ্য ইরাণী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় ছাত্র-দের জন্য বাংলার পরিবর্তে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আরবী সবার জন্য অবশ্যপাঠ্য।

স্কুলটিকে ভিত্তি ক'রে সাহিত্য সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুস্তক প্রদর্শণী ও বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের মধ্যেও সাহিত্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। অত্র বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ আবিদুর রহমান 'শব্দগুচ্ছ' নামে একটি বাংলা কবিতা ও ছড়ার বই লিখেছে। বইটি পড়েছি। তাতে শিশু মনের অভিব্যক্তি ৫২টি কবিতা রয়েছে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দোওয়া করি।

জানা গেল, কয়েক বৎসর পূর্বে দুবাই সফরকালে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্কুলটি পরিদর্শন ক'রে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন ক'রে সাধ্যমত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা জনাব অধ্যাপক মতিউর রহমান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে কতিপয় প্রস্তাব রাখেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বৈদেশিক শিক্ষা পরিদপ্তর বা শিক্ষা সেল গঠনের প্রস্তাব, বিদেশে পাঠরত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দানের সুযোগ দান এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় তাদের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুবিধা প্রদানের দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

আরব আমিরাতসহ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবী ঃ

	দেশের নাম	আয়তন (বঃ মাঃ)	লোকসংখ্যা ১৯৯০	রাজধানী
১।	আল্‌জিরিয়া	১৩,৯০,০০০	২,৫১,০০,০০০	আল্‌জিয়ার্স
২।	ইউ, এ, ই, (সংযুক্ত আরব আমিরাত)	৫৬,০০০	২২,০০,০০০	আবুধাবী
৩।	ইয়েমেন	৩,৫২,০০০	১,৪৫,০০,০০০	সানা
৪।	ইরাক	২,৯০,০০০	১,৮৯,০০,০০০	বাগদাদ
৫।	ঈজিপ্ট (মিশর)	৬,৬৮,০০০	৫,৪৮,০০,০০০	কায়রো
৬।	ওমান	১,৪০,০০০	১৬,০০,০০০	মাস্কট
৭।	কাতার	৭,০০০	৩.১৫,০০০	দোহা
৮।	কুয়েত	১২,০০০	২১,০০,০০০	কুয়েত সিটি
৯।	জর্ডান	৬৫,০০০	৩৫,০০,০০০	আম্মান
১০।	জি, সি, সি, (গালফ কনসুলেট কমিটি)			গালফ
১১।	জিবুতি	১৫,৩৩৪	৫,০০,০০০	জিবুতী
১২।	তিউনিশিয়া	১,১০,০০০	৮১,০০,০০০	তিউনিস
১৩।	বাহ্‌রাইন	৬,৪০,০০০	৫,০০,০০০	মানামা
১৪।	মরক্কো	২,৯৮,০০০	২,৬২,০০,০০০	রাবাত
১৫।	মৌরিতানিয়া	৬,৮৮,০০০	২০,০০,০০০	নয়াকচট
১৬।	লিবিয়া	১১,৭৪,০০০	৪৫,০০,০০০	ত্রিপোলী
১৭।	লেবানন	৬,৭০০	৩৩,০০,০০০	বৈরুত
১৮।	সিরিয়া	১,২৩,০০০	১,২৪,০০,০০০	দামেস্ক
১৯।	সুদান	১৬,৭০,০০০	২,৫১,০০,০০০	খার্তুম
২০।	সোমালিয়া	৪,২৫,০০০	৭৮,০০,০০০	মোগাদিসু
২১।	সৌদি আরব	১৫,৫৪,০০০	১,৬৮,০০,০০০	রিয়াদ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা আরবী ; কিন্তু দেশটি ইহুদীগণ দখল ক'রে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ফিলিস্তিনীগণ ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে দীর্ঘ দিন যাবৎ তাদের দেশ পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

হিথ্রো এয়ার পোর্টে

যথাসময়ে আবুধাবী হতে ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের বিমানে রওনা হ'য়ে সকাল ৬-৫০ মিনিটে লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পেঁৗছি। একপক্ষকাল পূর্বে নিউইয়র্ক থেকে টেলিফোনে লণ্ডনে আলী আসগারকে আমার হিথ্রো বিমান বন্দরে পেঁৗছার খবর জানিয়েছিলাম। তাকে আরো বলেছিলাম, হিথ্রো থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে আমাদের গাল্‌ফ এয়ার লাইনসের বিমান ছাড়বে রাত দশটায়। সুতরাং ১৫ ঘন্টার অধিক আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের কিছু অংশ লণ্ডনে তাদের সঙ্গে কাটাতে চাই। সে সকাল আটটার মধ্যে বিমান বন্দরে এসে আমাকে লণ্ডনে নিয়ে যাবে টেলিফোনে জানিয়েছিল।

আলী আসগার হিথ্রো বিমান বন্দরের প্রধান ইমিগ্রেশন অফিসারের নিকট তাঁর অনুমতির জন্য ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ নিম্নরূপ দরখাস্ত করে ঃ

Dear Sir,

MR. M. A. HAMID

The above named retired College Principal (both my wife and I were his students) will arrive at Heathrow from Newyork enroute to Bangladesh on Friday, 11th October, 1991 at 6·50 A. M. by United Airlines. His Dhaka flight by Gulf Air is scheduled for 10 P. M. that night,

As Mr. Hamid would be spending over 15 hours at the Airport Lounge, my wife and I would be very grateful If he would be allowed to visit us at our residence (196, Canterbury Road). If he is allowed to leave the Airport, I would collect him from there and take him back to the Airport in the evening for his onward journey to Dhaka.

I enclose a copy of an affidavit which I sent to Mr. Hamid a few months ago for his visa.

Yours faithfully

(Sd) M. A. Asghar.

আলী আসগার একপক্ষকাল পূর্বে দরখাস্ত করেই নিশ্চুপ থাকেনি। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে অনুমতি লাভের জন্য ; কিন্তু ১০ই অক্টোবরের মধ্যে অনুমতি না পাওয়ায় সে দরখাস্তের একটি কপিসহ ১১/১০/৯১ তারিখে সকাল ৭ টায় হিথ্রো বিমান বন্দরে আসে এবং প্রধান ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অনুমতি পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হয় না।

আমাকে তার বাসায় যেতে দেয়া দূরের কথা, আমার সঙ্গে লাউঞ্জে সাক্ষাতের অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হয় না। কয়েক ঘন্টা চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হওয়ায় সে গালফ এয়ার অফিসের টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ জানায়। টেলিফোনে আলাপ করার জন্য আমাকে গাল্‌ফ কাউন্টারে ডাকা হয়। বেলা ১২টায় তার সঙ্গে ফোনে আলাপ করি। আমার হারানো কাপড়ের ব্যাগটি পাওয়ার খবর তাকে পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলাম। ব্যাগটির মধ্যে আমার লেখা কিছু-সংখ্যক বই ছিল। আলী আসগারের জন্য ১০ খানা বই রেখে অবশিষ্ট বইগুলো আমেরিকায় বিতরণ করেছিলাম। তার জন্য আনা দশখানা বইয়ের কথা টেলিফোনে তাকে জানাই এবং বলি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বইসহ বাইরে আসছি। তাকে আর এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে বলি।

দুঃখের বিষয় লাউঞ্জের বাইরে যাবার অনুমতি মেলে না। এক পর্যায়ে বাইরে যাবার জন্য প্যাকেটটি হাতে নিয়ে বিনা অনুমতিতেই গেট পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করি, ভিতর থেকে প্যাকেটটি আলী আসগারকে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গেটে পৌঁছার পূর্বেই এয়ার পোর্টের জনৈক কর্মকর্তা ধরে ফেলেন। তাঁকে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গেট পর্যন্ত যেতে দেয়া হয় না। তাঁকে বলি, আমার সঙ্গে আপনি দয়া ক'রে গেট পর্যন্ত চলুন মাত্র দুই মিনিটের জন্য ঃ আমার ছাত্রটিকে বইগুলো দিয়েই আপনার সঙ্গে ফিরে আসবো। কিন্তু তিনি সম্মত হন না। আমাকে সঙ্গে ক'রে লাউঞ্জে নিয়ে যান।

কিছুক্ষণ পর আমি গালফ এয়ার লাইনসের ক্লেইম অফিসার (Claim officer) আমার পূর্ব পরিচিত জনাব হাফিজ সাঈদকে টেলিফোনে বলি—লাউঞ্জের বাইরে অপেক্ষারত আমার প্রাক্তন ছাত্র মিঃ আলী আসগারকে আমার লেখা কয়েকটি বই দিতে চাই। সে ৬/৭ ঘন্টা যাবৎ বাইরে প্রতীক্ষা করছে—এ-কথাও জানাই। তিনি বলেন, 'দুঃখিত, যেতে পারবেন না, তবে আপনার বইগুলো মিঃ আলী আসগারের বাসায় পৌঁছে দেয়া হবে, তার ঠিকানাসহ বইয়ের প্যাকেটটি গালফ এয়ারের কাউন্টারে জমা দিন।' শেষ পর্যন্ত তাই করি। আলী আসগারের সঙ্গে আর টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। যাঁর নিকট প্যাকেটটি জমা দেই, তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই—বইগুলো যেন অবশ্যই তাকে পৌঁছে দেয়া হয়। তিনি আমাকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমার বাসা মিঃ আলী আসগারের বাসার দিকে, আগামীকালই তাকে বই দিতে পারবো।'

দুঃখের বিষয় কয়েক মাস আগেও আলী আসগারের চিঠিতে জেনেছি—বইগুলো সে আদৌ পায়নি। এমনকি এয়ারপোর্টে খোঁজ ক'রেও সে বইয়ের কোন হাদিস করতে পারেনি। আমি এ ব্যাপারে জনাব হাফিজ সাঈদকে একাধিক চিঠি লিখেও কোন উত্তর পাইনি। বাংলা ভাষায় লেখা বই, তাঁরা ত' বাংলা জানেন না। ভাবি, বইগুলো কোথায় গায়েব হল! এর উত্তর হয়তো কোনদিনও পাব না।

হিথ্রো এয়ারপোর্টে ঢাকার ৪৮, পুরান পল্টনের দেওয়ান আব্দুর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমেরিকায় থাকেন। তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধপিতা আলহাজ্ব রিয়াজ উদ্দিন দেওয়ানকে ঢাকার বিমানে তুলে দিবার জন্য তিনি এখান পর্যন্ত আসেন। বৃদ্ধ মুরব্বীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি বলেন, ঢাকায় তাঁর আরো তিন ছেলে আছে, তাদের নাম আব্দুল কাদের, আব্দুল হান্নান ও মাসুম। তারা কে কি পড়ে-তাও জানান। ১২ই অক্টোবর সকালে আমরা ঢাকায় পৌঁছি। বৃদ্ধ ব্যক্তি বিদায়কালে আমাকে একবার তাঁর বাড়ী যেতে বলেন। আমি তাঁকে বলি, সময় ও সুযোগ পেলে যাবার চেষ্টা করবো। গত বৎসর একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছি। আমি কথা রাখায় তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং প্রাণভরে দোয়া করেন। সালাম জানায়ে বিদায় গ্রহণ করি।

আস্‌সালাম। আল্লাহ্‌ হাফেজ।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট—১

লেখক-পরিচিতি

সরদার মোঃ আব্দুল হামিদ একজন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, গবেষক ও লেখক। চলনবিলের গুরুদাসপুর থানার খুবজীপুর গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ তাঁর জন্ম হয়। পিতা আলহাজ্ব দবির উদ্দিন সরদার একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

সরদার হামিদ ১৯৫০ সালে রাজশাহী গভঃ কলেজ হ'তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত বি, এস-সি, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ডিস্টিংশন (Distinction)-সহ বি, এস-সি, পাশ করেন এবং ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে রসায়নে এম, এস-সি,-তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রীয় কর্মী ছিলেন।

১৯৫৩ সাল হতে তিনি সাতক্ষীরা কলেজে অধ্যাপনা জীবন শুরু করেন। অতঃপর গাইবান্ধা কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, পাবনা এড্ওয়ার্ড কলেজ, যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজ এবং বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। তিনি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবির মহীপুর হাজী মহসীন কলেজে (মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত) গভঃ ডেপুটেড অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯৭২—১৯৭৫)। ১৯৮১-৮৪ পর্যন্ত তিনি গভঃ এ, এইচ, কলেজের উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ছিলেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালের ২০শে মার্চ হতে ১৯৮৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি বগুড়া সরকারী মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজ গ্রামে একটি কলেজ ও দাখেল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৬ সালে নাটোর নবাব সিরাজদৌলা কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। গুরুদাসপুর থানাকেন্দ্রে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিল চলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ তাঁর আর একটি অবদান। তিনি কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কল্যাণে পশ্চাৎপদ চলনবিল অঞ্চলে বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পোষ্ট অফিস, ক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরী, পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে।

রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি বই ছাড়াও তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখক ঃ ১) চলনবিলের ইতিকথা, ২) চলনবিলের লোকসাহিত্য (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত), ৩) জ্ঞানের মশাল, ৪) রসায়নের তেলেসমাতী, ৫) কর্মবীর সেরাজুল হক, ৬) পল্লীকবি কারামত আলী, ৭) শিক্ষার মশালবাহী

রবিউল করিম, ৮) আমাদের গ্রাম, ৯) পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী, ১০) হজ্বের সফর, ১১) দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া, ১২) বঙ্গাব্দ সমাচার প্রভৃতি। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই গবেষণাধর্মী ও তথ্যসমৃদ্ধ।

তিনি পাকিস্তান আমলে লণ্ডন হতে প্রকাশিত 'আওয়ার হোম' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি (১৯৫৩-৭০), ঢাকার দৈনিক পয়গাম'এর নিজস্ব সাংবাদিক (১৯৬৭-৬৯) এবং পাবনা হতে প্রকাশিত মাসিক 'আমাদের দেশ' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন (১৯৫৮-৭০)। এতদ্ব্যতীত 'হামারা ওয়াতন' (লয়ালপুর), বোলানের ডাক (কোয়েটা), আল ইসলাহ (সিলেট) এবং বাষিক অভিযান, সোপান, পদক্ষেপ, পাঠশালা, চলনবিল, চলনবিলের ঢেউ, চলনবিলের চেরাগ, চলনবিলের হাওয়া, অনুসন্ধানী, নয়াজিন্দেগী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তিনি বঙ্গাব্দের বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট করার জন্য ১৯৫৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলা-একাডেমী কর্তৃপক্ষ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কে সভাপতি ক'রে একটি উপ-সংঘ গঠন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমী তাঁর প্রস্তাব হুবহু গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন বাংলাদেশ সরকার বঙ্গাব্দ সরকার অনুমোদন করেন। যার ফলশ্রুতিতে বৈশাখ হতে ভাদ্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন হ'তে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিনে গণনা করা হয়। অতিবর্ষে (৪ দ্বারা বিভাজ্য বঙ্গাব্দে) চৈত্র মাস ৩১ দিনে ধরা হয়।

সরদার হামিদ চলনবিল অঞ্চলের বহু সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক। তা' ছাড়া নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের জীবন-সদস্য ঃ
বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বৃহত্তর রাজশাহী কল্যাণ সমিতি (ঢাকা), সিলেট কেন্দ্রীয় মসলিম সাহিত্য সংসদ, বগুড়া শাহ্ সুলতান চক্ষু হাসপাতাল, নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী, পাবনা শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সমিতি, গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা-সংঘ, খুবজীপুর নজরুল প্রগতি সংঘ, চলনবিল উন্নয়ন পরিষদ, সেরাজুল হক সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তিনি চলনবিল জাদুঘর ও চলনবিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ লোকসাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সমিতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ (ঢাকা) এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থার সদস্য।

২৭-১১-১৯৯২ তারিখে পাবনা জেলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সরদার হামিদের সাহিত্যসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'পল্লীরত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ও শহর-পল্লীর বিভিন্ন সংস্থা তাঁকে খেতাব ও সম্বর্দ্ধনাদানে সম্মানীত করেছেন।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'তমঘা-ই-খিদমত' (টি, কে,) খেতাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ডক্টর শামসুজ্জোহা হত্যার প্রতিবাদে তিনি টি, কে, খেতাব বর্জন করেন এবং নিজ থানায় ডঃ জোহার নামে 'বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৬৯)।

সরদার আবদুল হামিদ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে কতিপয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ঃ

১। চলনবিলের ইতিকথা (ঐতিহাসিক গ্রন্থ, পৃঃ ৫১৮, প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৭)।

ক) **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্** গ্রন্থটির 'আশীর্বাণী'-তে লিখেছেন ঃ

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হামিদ (টি, কে,) সাহিত্যসেবী ও সমাজসেবক। তিনি অক্লান্ত কর্মী। তাঁর রচিত বহু সদ্‌গ্রন্থের মধ্যে তাঁর নবতম অবদান 'চলনবিলের ইতিকথা'। এ-টি গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ রচনা। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি— ৩০/১১/১৯৬৭।

খ) প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর (রাঃ বিঃ) ডঃ মাযহারুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

একটি বিলকে কেন্দ্র ক'রেও যে একটি গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে অধ্যাপক হামিদ নিষ্ঠার সঙ্গে এই গ্রন্থ রচনায় তা যথাযথভাবে প্রমাণ করেছেন। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আমাদের সম্মুখে একটি নতুন সম্ভাবনাময় দিক উন্মোচন করেছে এবং বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করেছে।...

গ) সুসাহিত্যিক জনাব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্ লিখেছেন ঃ

বইখানা যে একটা প্রামাণ্য দলিল হবে এবং ভাবী ইতিহাস রচয়িতা ও গবেষকদের জন্য একটি মহামূল্য দিগদর্শনী হবে, তাতে সন্দেহ নাই।...

ঘ) প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব সানাউল্লাহ্ নূরী (রূপকার) লেখেন ঃ

আবদুল হামিদ সাহেবকে প্রাচীন যুগের একটি শিলালিপি বলে মনে হয় আমার। তাঁকে দেখ্‌লে কিছুতেই বোঝা যাবেনা, একটি জীবন্ত ইতিহাস তিনি। আর জানার এতখানি ঔৎসুক্য এবং সৃষ্টির এত উত্তাপ নিয়ে তিনি বাস করছেন। মফঃস্বল শহরের একটি অজ্ঞাত গলিতে পড়ে আছেন। খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার কোন লোভ আজও তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি বিশ্বাস করেন—কাজটাই বড়।...

(ঙ) OUR HOME (Feb, 1969) of London says ঃ The book contains vivid description of the area where the beel (a yast lake) is situated. The Author in his usual modesty says that he is not a Historian, but the book proves him to be a wonderful Historian.

While describing Particular area of East Pakistan, the Author gives a short enthological history of the then undivided India. The Author depicts the nature, habit and the general way of the rural people. Readers will enjoy the book very much. ...

চ) সুলেখক সৈয়দ মুর্তজা আলী (সাবেক বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী) লিখেছেন ঃ

... এ-টি শুধু চলনবিলের ইতিহাস নয়, এ-টি একটি গেজেটিয়ার। নানা রকমারী তথ্য উৎসুক পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে সক্ষম হবে।... গ্রন্থের ভাষা সাবলীল ও বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। অবহেলিত অঞ্চলের ইতিহাসের প্রতি লেখকের একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রম স্বীকার নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।...

ছ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় লিখেছেন (১-১-১৩৭৫) ঃ

চলনবিলের কাহিনী গ্রন্থকার উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।...

জ) Mr. A. K. M. Abdul Azeez (Ex. D. D. P. I., Rajshahi Division) writes ঃ Your researches into the history, geography and its people, past and present, are really worth-studying. It has ben a real serviee to the people by revealing many interesting and unknown facts. ...

ঝ) পশ্চিম বঙ্গের (ভারতের) বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ডক্টর দুলাল চৌধুরী লিখেছেন ঃ অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ লিখিত 'চলনবিলের ইতিকথা' বাংলার মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোগ বলে স্বীকৃত। কিম্বদন্তী নির্ভর ইতিহাস রচনা একটি দুঃসাধ্য গবেষণা। হামিদ সাহেব দেশ-কালের মৃত্তিকা থেকে আহরণ করেছেন কাহিনীর কণিকাগুলি এবং গভীর নিষ্ঠা ও অনুশীলনের সাহায্যে তিনি রাজশাহী-পাবনা জেলার 'চলনবিলের' একটি মনোজ্ঞ ইতিকথা সংকলন করেছেন।... অধ্যক্ষ হামিদ তাঁর গ্রন্থের পাতায় পাতায় রচনার প্রসাদগুণ যেমন বজায় রেখেছেন, তেমনি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন তথ্যকে এক অখণ্ড সৌন্দর্যভূমিতে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থটি জ্ঞান-নির্ভর অথচ সুখপাঠ্য।

একদিকে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে বিজ্ঞান মনস্কতা সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থটিতে। আঞ্চলিক এই ইতিহাসগুলির উপাদান অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের 'গণ ইতিহাস' (Peoples' History) রচনার সহায়ক হবে। অধ্যক্ষ হামিদ একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁকে জানাই অভিনন্দন।

ঞ) Professor M. Moslem Ali (Jt. Secy, M/o Cultural Affairs) writes ঃ It is indeed a store-house of innumerable informations of a very important region. ...

২। চলনবিলের লোকসাহিত্য (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, জুন, ১৯৮১)।

ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবদুল খালেক বলেন (রেডিও বাংলাদেশ, রাজশাহী, ২/৮/৮২ ইং) ঃ

চলনবিলের লোকসাহিত্য সংগ্রহের মাধ্যমে সরদার মোঃ আব্দুল হামিদ সাহেব দেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার সুযোগ আমাদের ক'রে দিয়েছেন। তাঁর এ-উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার-যোগ্য। চলনবিলের লোকসাহিত্য যে আমাদের দেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এ-কথা আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বল্‌তে পারি। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই চমৎকার। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

খ) বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক লোকসাহিত্য বিশারদ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন ঃ জনাব হামিদের এই গ্রন্থ যারা জেগে ঘুমায় তাদের সকলের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিক এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।...

গ) Professor Muhammad Abul Hossain, M. Phil. (London). Principal, Govt, A. H. College, Bogra, Bangladesh, writes :

The Author of 'Chalan Beeler Lokesahitya' Sarder Md. Abdul Hamid is professionally a professor of Chemistry but inherently a Social worker, Author and Researcher. His latest publication—a collection of hidden gems scattered throughout a Particular region of Bangladesh, is a significant addition to our highly rich cultural heritage. His untiring efforts has unearthed to us a chapter of our glorious past.

The Language he has used in the book is so simple and interesting that it will be equally liked by our common folk and elite.

ঘ) Mr. Shafiuddin Sarder, a famous wriier and Educationist (of Natore, Bangladesh) writes :

Chalanbeeler Lokesahitya is a document of the sustained labour you underwent in collecting the noble and rare pieces of folk-love, folk-literature and hidden feelings of our area, this book is simply a pride of we-people, who live in this Chalanbeel range. I have no language to give vent to my pentap feelings in extending my thanks to you for this work.

ঙ) অশিতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ কবি রোস্তম আলী কর্ণপুরী (বগুড়া) লিখেছেন ঃ

'চলনবিলের লোকসাহিত্য' নিজস্ব জাতীয় সম্পদ হিসেবে বাঙলা সাহিত্যের মণিকোঠায় স্থান লাভ করবে ; জাতি ধন্য হবে, গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হবে—এই আশা রাখি।...

চ) অধ্যাপক শেখ সালেহ আহমদ, প্রধান, বাংলা বিভাগ (বগুড়া সরকারী আঃ হঃ কলেজ) লিখেছেন ঃ

লেখক রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক হলেও তিনি একজন নিষ্ঠাবান সমাজ সেবক, গবেষক ও সুসাহিত্যিক। তিনি কয়েকটি মৌলিক ও গবেষণা-মূলক গ্রন্থের প্রণেতা। তেমনি একটি মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনা হল আলোচ্য 'চলনবিলের লোকসাহিত্য'।...

চলনবিলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান ও গুরুত্ব লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন তথ্য সহযোগে যথাসাধ্য প্রামাণ্য ক'রে তুলেছেন। চলনবিল এলাকায় লোকসাহিত্যের ছড়াছড়ি। এসব অমূল্য সম্পদ ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে সংগ্রহের অভাবে। লেখক অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে লোক-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদকে সংগ্রহ ক'রে শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন শাখার পরিচয় প্রদানে লেখক পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।...

৩। **দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া** ভ্রমণ কাহিনী, প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯০)।

ক) নিউজিল্যাণ্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রিয়তোষ মৈত্রেয় লিখেছেন ঃ অধ্যাপক সরদার আব্দুল হামিদ সাহেবের 'দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া' গ্রন্থটি পড়ে ভাল লাগল। এতে সহজ ক'রে অষ্ট্রেলিয়া-বাসীদের জীবনযাত্রা, শিক্ষাব্যবস্থা, বাজার, সুপার বাজার, রাস্তাঘাট ইত্যাদির বিশেষ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তা' ছাড়া গ্রন্থকার এসব দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে টেকনলজীর ভোগবাদ প্রাধান্যের একটা ভাল বিবরণ সহজ বাংলায় তুলে ধরেছেন।...

খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

'দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া' বইটি পড়লাম। আপনার প্রাণবন্ত বিবরণ উপ-স্থাপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বইটিতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেককিছু আছে। আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে বইটি লিখেছেন। এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।...

গ) জনাব মুহঃ শামসুল হক কোরায়শী (কলেজ পরিদর্শক, রাজশাহী বোর্ড) লিখেছেন ঃ

অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ রচিত 'দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া' পড়ে অত্যন্ত প্রীত হলাম। লেখক গভীর আন্তরিকতার সাথে একজন যথার্থ ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে অষ্ট্রেলিয়াকে দেখেছেন এবং প্রতিটি বিষয় এত নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পড়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। যেকোন পাঠকের কাছেই বইটি ভাল লাগবে। অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত সব জীবজন্তু এবং উন্নত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি পড়ে অষ্ট্রেলিয়া না দেখেও আমাদের মত লোকের সীমিত জ্ঞানের গণ্ডী সম্প্রসারিত হল অনেকাংশে।...

ঘ) জনাব আ, খ, ম, গোলাম মোস্তফা, (উপ-পরিচালক, যশোর বোর্ড) লিখেছেন ঃ অধ্যাপক আব্দুল হামিদ একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী ও সমাজসেবক। তাঁর লিখিত 'দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া' একটি ভ্রমণকাহিনীমূলক পুস্তক। কিন্তু এই পুস্তকখানিতে একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। পুস্তকটি অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, লৌকিক ও ধর্মীয় আচার আচরণ প্রভৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে চমৎকার সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায়—যা সবশ্রেণীর, সব বয়সের পাঠকের কাছেই সহজে বোধগম্য ও আকর্ষণীয়।...

ঙ) জনাব সালাহ উদ্দিন পাঠান (দৈনিক ইত্তেফাক—১৭/১/৯১ তারিখে) লিখেছেন ঃ

... লেখক অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁর ভ্রমণের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দুইশ' বারো পৃষ্ঠার এই বইটিতে অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ-দর্শন, রাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা, দর্শনীয় স্থানসমূহ স্থান পেয়েছে। এছাড়া বইটিতে রয়েছে সেখানকার প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, কৃষি ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির স্বচ্ছ বিবরণ।... সবচে বড় কথা অষ্ট্রেলিয়ার সাবিক ব্যবস্থায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। একটি উন্নত রাষ্ট্র-কাঠামোর সুন্দর উদাহরণ এই দেশটি।

চ) সাহিত্যসেবী ও গবেষক মিঃ সমর পাল (সচিব, গাইবান্ধা জেলা পরিষদ) লিখেছেন ঃ

'দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া' একটি ভ্রমণকাহিনী। সচরাচর যে ধরণের ভ্রমণ-কাহিনীমূলক গ্রন্থ আমাদের পরিচিত—এটি তা' থেকে আলাদা। রোজ নামচার মত মনে হলেও এতে রসজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমাহার খুঁজে পাওয়া যায় অতি সহজেই। সাবলীল ভাষা এবং উপস্থাপনার সৌকর্য এতই আকর্ষণীয় যে, একদমে পড়ে গেলেও কোথাও বাধা পেতে হয় না। ...

ছ) জনাব এম, এ, মান্নান (সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রীণডেল্টা ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ঢাকা) লিখেছেন ঃ

... বইটিতে পরিষ্কারভাবে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের জীবন যাপনের বর্ণনা ও তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার চিত্র পরিস্ফুট। উল্লিখিত জীবনব্যবস্থার প্রতিফলন আমাদের সমাজে হলে আমরা উন্নত মর্যাদার অধিকারী হতে পারতাম; আমাদের অনেকের মধ্যেই উন্নত সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত হোত। আমার মনে হয়, বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হলে অষ্ট্রেলিয়ান পাঠকবর্গ খুব খুশী হতেন। ...

জ) পাবনার বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট ও সাহিত্যামোদী মোঃ আব্দুল আজিজ খান লিখেছেন ঃ

... লেখক একজন সুদক্ষ শিল্পীর মত সুন্দরভাবে বইটিতে তাঁর অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সময় চোখেদেখা অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভবন, রাস্তাঘাট, মানুষের আচার-ব্যবহার ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। ফলে বইখানি হয়ে

উঠেছে সুন্দর একটি ভ্রমণকাহিনী। বইটি প্রতি মানুষের মনে অজানাকে জানার জন্য এক নতুন স্পৃহার সৃষ্টি করতে যে পারঙ্গম তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। লেখক বইটিতে উল্লেখ করেছেন, 'কোথাও কোন বাড়ীর, দোকানের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে কোন প্রকার শ্লোগান, নির্বাচনী পোষ্টার বা কালির আঁচর দেখতে পাই নাই। সব দেয়াল ফুটফুটে পরিস্কার।' এই বিবরণটিতে অষ্ট্রেলিয়ার মানুষের সমাজজীবনের মার্জিত রুচির পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। ... মনে হয় যেন লেখক নিজদেশে কুসংস্কারমুক্ত, সুরুচীসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে একান্ত প্রয়াসী। সর্বশ্রেণীর লোকের জ্ঞানার্জনের জন্য বইটি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

৪। **হজ্বের সফর** (ভ্রমণকাহিনী, প্রকাশ ঃ ১৯৭৪, পৃঃ ১৬৬)।

ক) মুহম্মদ নূরুল হক, টি, কে, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ঃ মোঃ আব্দুল হামিদ বিরচিত 'হজ্বের সফর' বইখানি গভীর অভিনিবেশ সহকারে আগাগোড়া পড়েছি। হজ্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক বই-ই পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে দ্বিধা সংকোচ নেই—এ ধরণের বই খুব কমই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

লেখক অতীব দরদ, আন্তরিকতা ও মোলায়েম ভাষায় হজ্বের প্রতিটি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বইখানি পড়া শুরু করলে শেষ না ক'রে উঠার উপায় নেই। অভিনব পদ্ধতিতে লেখা 'হজ্বের সফর' বইখানি হজ্বগমনেচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে পরম দিশারী বলে গণ্য হবে। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সাহেবকে মোবারকবাদ জানাই এজন্য যে, তিনি আমাদের অপূর্ব সওগাত দিলেন, সত্যই যার তুলনা নাই। বইখানি বাংলার ঘরে ঘরে সযত্নে রক্ষিত ও গঠিত হোক—একান্তভাবে এই কামনা করি।

খ) অধ্যাপক এম, এ, সামাদ (ফরিদপুর জেলাবোর্ডের মাসিক পত্রিকা 'গণমন' জুলাই, ১৯৭৬) ঃ আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ মহীপুর হাজী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ, পেশায় রসায়নের অধ্যাপক, নেশায় লেখক, আদর্শে মুসলমান। ... জনাব হামিদ ১৯৭০ সালে হজ্ব করেন। স্বাধীনভাবে লটারীতে হজ্বের অনুমতি পান নাই। আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে তিনি সৌদী আরব গমন ক'রে হজ্ব করেছেন। এ কাহিনীটা একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হ'য়ে থাকলেও ঘটনাটা নিঃসন্দেহে দৃঢ়তার পরিচায়ক। একান্ত নিষ্ঠা এবং আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে এত প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে হজ্বে যেতে পারতেন না। ... বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে। পড়লে রসুলের দেশের প্রতি একটা টান অনুভব হয় নিঃসন্দেহে। ...

গ) **অধ্যাপক খন্দকার খলিলুর রহমান** (দৌলতপুর বি, এল, কলেজ) ঃ 'হজ্বের সফর' বইটি পড়ে আমি যার পর নাই খুশী হয়েছি। পড়ার সময় মনে হয়েছে যেন আমি নিজেই পবিত্র আরব ভূমি সফর করছি। ... বইখানির সবচেয়ে আকর্ষনীয় দিক হচ্ছে হজ্বের মসলা মাসায়েলগুলো খুব

সুন্দর এবং হজ্বের দোওয়াগুলো চমৎকারভাবে অনুবাদসহ পরিবেশিত হয়েছে। এদিক থেকে বইখানা বাংলা ভাষায় অনুপম তাতে সন্দেহ নেই। হজ্বগমনেচ্ছুকদের জন্য বইখানা খুবই সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এ-বইটার আরও একটা আকর্ষণীয় দিক রয়েছে তা' হল, কথ্য আরবীর কতকগুলো শব্দ এবং বাক্যাংশের বাংলায় অনুবাদ। আরবী বইয়ের ভাষা ও কথ্য আরবী ভাষায় অনেক অমিল। তাই সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও অনেক আরবী জানা মওলানা সাহেবও হজ্বে গিয়ে বিপদে পড়েন। ভাষা বোঝেন না। এ-সব দিক লক্ষ্য রেখেই লেখক ২ নং পরিশিষ্টে ক্ষুদ্র অভিধান সংযোজিত করেছেন। এটি সত্যই বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। ...

৫। পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী (ভ্রমণকাহিনী, প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)।

ক) অধ্যাপক আব্দার রশীদ (রাজশাহী গভঃ কলেজ) রাজশাহী বেতার-কেন্দ্র হতে (৬-৭-১৯৬৬) ঃ স্বল্প পরিসর বইটির মধ্যে অধ্যাপক হামিদ পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দেখা জায়গাগুলি এবং ঐ-সব জায়গার মানুষ ও তাদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে একটি মোটামুটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ... ভ্রমণকাহিনী লেখকের পক্ষে যে খোলাচোখ, কৌতূহলী মন ও সজাগ অনুভূতি দরকার অধ্যাপক হামিদ সমস্তগুণের অধিকারী। ...

খ) বাংলা একাডেমীর পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি কে, এম, শমশের আলী মণ্ডল-ধরণ, বগুড়া) মাহে নও, আষাঢ়, ১৩৭৫ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ

নিছক সফর কাহিনী হলেও রসায়নের অধ্যাপক সাহেব দৃষ্ট স্থানসমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে রস পরিবেশন করেছেন তা' নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।... পরিশিষ্টে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের যে উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তা' নিঃসন্দেহে সফরপিপাসুদের অনেক কাজে লাগবে। ...

গ) বিদগ্ধ কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা গভঃ কলেজ) ঃ ... বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকের পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিশক্তি আর সমাজদরদী ও সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মন হামিদ সাহেবের জাগ্রত। তাই 'পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী' শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের খুঁটিনাটি সমাচার হিসাবেই প্রয়োজনীয় নয়; স্মৃতির পাতায় যে কাহিনী নানাস্থানে জাগ্রত দেখেছেন, তাতে তিনি উদ্বেল ও মনোজ্ঞ হ'য়ে যেভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছেন সে-এক সাহিত্য-সাধনার ফল্গুস্রোত। ...

৬। কর্মবীর সেরাজুল হক (জীবনীগ্রন্থ; প্রকাশ ঃ আগষ্ট, ১৯৬৬)

ক) হারামণির লেখক অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন লিখেছেন ('বই' পত্রিকা মার্চ, ১৯৬৯) ঃ

জনাব আব্দুল হামিদ এই অখ্যাত সমাজ ও সাহিত্য-সাধকের জীবনী রচনা ক'রে আমাদের উপকার করেছেন। ... গ্রন্থখানা সত্যই আমাদের সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিশেষ কাজে লাগবে।

খ) OUR HOME (Feb. 1968) of London : This is a biography of a Bengali educational, social and political worker and of a great Orator. He is one of those who can be reckoned as stalwart, who roused the Muslims of Bengal to consciousness. He is one of those who are responsible for spreading education in rural areas of the part which was then known as North Bengal.

The biography is written wilh all details. The language is splendid and descriptions are admirable. Readers both at home and abroad will enjoy it and will surely derive inspiration from the book....

গ) **অধ্যাপক মোঃ মতিউর রহমান** (মাহে নও, ভাদ্র, ১৩৭৫) ঃ

... নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও একটি অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোক আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় কিভাবে অবিচল থাকতে পারেন, সেরাজুল হকের জীবনী তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। লেখক অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে সেরাজুল হকের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্ভাব্য সকল পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।...

ঘ) সিরাজগঞ্জের এ্যাডভোকেট ও সাহিত্যিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান খাঁ ঃ

জনাব হামিদ সাহেব গভীর সমুদ্রের তলদেশে যেখানে সাধারণ মানুষের জ্ঞান গেঁ ছে না, সেখানে ডুবুরীর মত রত্ন আহরণ করিয়া উহা সাধারণ্যে উপহার দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এ-ক্ষেত্রে তিনি সুনাম-দুর্নাম, অর্থের অপচয় বা পরিশ্রমের মূল্যের বিচার করেন নাই। ...

ঙ) চলনবিল অঞ্চলের তাড়াশ থানার বিনসারা গ্রামের **আলহাজ্ব মুরশিদুল ইসলাম খন্দকার** লিখেছেন ঃ মরহুম মগফুর মৌলানা সেরাজুল হক সাহেবের মত প্রতিভাশালী, জনদরদী, বাগ্মী, কবি, সুসাহিত্যিক ও জননায়কের জীবন চরিত লিখিয়া দেশের যথার্থই কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার ভাষা সুললিত। ঘটনা বিন্যাস ও জীবনের মর্মকথা উদ্ঘাটিত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ...

চ) বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক জনাব আমীনুদ্দীন শাহ (শাহ্জাদপুর, সিরাজগঞ্জ) ঃ

বিল-চলনের নয়নমণি খ্যাতনামা সমাজসেবক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, পল্লীদরদী ও গরীবের বন্ধু এম, সেরাজুল হকের জীবনী একখানা উপাদেয় গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় মওলানা সেরাজুল হকের ছিল অপূর্ব জঙ্গী জীবন। তাঁর হাতিয়ার ছিল অসি নয় মসী। আর এই মসী দিয়েই তিনি সারা জীবন দেশের ও দশের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম ক'রে গেছেন। তাঁর জন্মভূমি তাড়াশ তথা সমগ্র চলনবিল চিরদিনই উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এতদঞ্চলে ইদানিং যা কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার সবটুকুর গৌরব সেই রণক্লান্ত সৈনিক সেরাজুল হকেরই প্রাপ্য। ... তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবনী গ্রন্থের অভাব

সমাজ অনুভব ক'রে আসছিল। আপনি সে-অভাব পূরণ করায় আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

৭। পল্লীকবি কারামত আলী (জীবনী-গ্রন্থ, প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৬৯)।

ক) বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এম, এ, সাত্তার (কেনি রোড, কুষ্টিয়া) লিখেছেন ঃ লেখকরা সাধারণতঃ নাম, যশ ও অর্থের প্রত্যাশী হ'য়ে বড় বড় লোকের জীবনী লিখে থাকেন। নিভৃত পল্লীর অজ্ঞাত রত্নাবলীর সন্ধান খুব কম লোকই করেন, কারণ এতে যশ বা অর্থের কোনটাই লাভ হয় না। যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় ক'রে যখন এ ধরণের কোন বই লিখা বা ছাপা হয়, তা' গ্রাহকের অভাবে প্রায়ই অবিক্রীত থেকে যায়। ফলে লাভ হওয়া দূরে থাক, প্রচুর আর্থিক ক্ষতিই হয়।

এতটা ক্ষতি ও অসুবিধা সত্ত্বেও অধ্যাপক হামিদ কর্তব্যবোধের তাড়নায় অজ্ঞাত অবহেলিত দেশপ্রেমিকদের জীবনালেখ্য দেশের ও দশের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর ত্যাগ ও গুণগ্রাহীতা প্রণিধানযোগ্য। অত্যন্ত দরদী ও সংবেদনশীল মনের অধিকারী না হ'লে এই ধরণের জীবনী লিখ্‌তে আগ্রহী হওয়া যায় না। ডুবুরী যেমন সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে, মৌমাছি যেমন বনে জঙ্গলে ঘুরে মধু আহরণ ক'রে বিশ্ব মানবের উপকার সাধন করে, সরদার এম, এ, হামিদও তেমনই পল্লীর অবহেলিত ও বিস্মৃত দেশপ্রেমিক ও কর্মীদের জীবনী দেশবাসীর নিকট পরিবেশন ক'রে সর্বসাধারণকে দেশপ্রেম ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। ...

খ) চট্টগ্রাম সরকারী ইসলামিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ঃ

... কত প্রতিভা অযত্নে অনাদরে আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে—তার সন্ধান রাখে কে? আধুনিক সাহিত্যের ভাব, ভাষা, রীতি ও শৈলীর সঙ্গে হয়ত এইসব কবিদের রচনার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিরকালীন মানুষের মনের সঙ্গে বিশেষতঃ পল্লীর অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত কোটি কোটি মানুষের মনের মণিকোঠায় এদের স্থান বিশিষ্ট বর্ণাঢ্যতায় উজ্জ্বল। তাই এঁদের পরিচয়কে, এঁদের কবি-কৃতির সামগ্রিক অবদানকে সযত্নে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে। সুখের বিষয় সরদার এম, এ, হামিদ এই প্রয়োজনের বিষয় উপলব্ধি করেই এক অজ্ঞাত উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ...

কোন গৌরবমণ্ডিত আখ্যান, পরিকীর্তিত আলেখ্য বা মহিমান্বিত চরিত্র নিয়ে নয়, বরং অখ্যাত-অবজ্ঞাত বিষয় আর সাধারণের অসাধারণকে নিয়েই সরদার এম, এ, হামিদের সনিষ্ঠ মন সদাতৎপর। তেলে মাথায় তেল দেওয়া নয়, যে মাথায় তেল দেওয়ার কেউ নেই, সে-মাথায় তেল দেওয়ার মহত্তম সাধনায় ভাস্বর সরদার এম, এ, হামিদের সমগ্র কর্মজীবন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিও এ কথার যথার্থতা সপ্রমাণ করে। ...

গ) বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (দৈনিক আজাদ, ১৯-১-১৯৬৯) ঃ

পল্লী নিয়ে দেশ। দেশ চিন্‌তে হলে পল্লী চিন্‌তে হয়। পল্লী চিনতে হলে চিনতে হয় পল্লীর মানুষকে। বিন্দুকে বাদ দিয়ে সিন্ধুর সাথে যে পরিচয় তা' পুরোপরি পরিচয় নয়। অধ্যাপক সরদার আব্দুল হামিদ হাত দিয়েছেন পল্লীর এমন একজন মহান বিপন্ন বন্ধুর জীবনীতে যিনি আমরণ দেশের সর্বহারাদের জন্য দেহমন মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি অকাতরে উজাড় ক'রে বিলিয়ে গেছেন। সরদার আবদুল হামিদকে জীবনীকার পেয়ে পল্লীকবি কারামত আলী ধন্য হয়েছেন। সরদার আবদুল হামিদও কবি কারামত আলী সম্বন্ধে লিখতে পেরে ধন্য হয়েছেন। পল্লীপ্রেমিক পাঠকদের বইখানি এক নজরে পড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করি।...

৮। শিক্ষার মশালবাহী রবিউল করিম (জীবনী-গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৪, প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৭৯)।

ক) বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ সচিব জনাব মোঃ কেরামত আলী (বর্তমানে মন্ত্রী) লিখেছেন ঃ

জনাব রবিউল করিমের মত একজন আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের জীবনী পাঠ ক'রে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। অনেক বাধাবিপত্তি, ব্যক্তিগত ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে অবিচল নিষ্ঠার সহিত কাজ ক'রে শিক্ষাঙ্গনে তিনি যে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন সেজন্য আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যাঁরা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নানাবিধ জনকল্যাণমূলক ও সৃজনশীল কাজে রত আছেন, জনাব রবিউল করিমের জীবন-বৃত্তান্ত তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি। এরূপ একজন মহৎব্যক্তির জীবনকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে আপনি সমাজের অনেক উপকার করেছেন। ...

খ) চলনবিল অঞ্চলের প্রখ্যাত সাহিত্যিক এ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান খাঁ-(সিরাজগঞ্জ) ঃ

'শিক্ষার মশালবাহী রবিউল করিম' গ্রন্থখানা গতকাল বেলা দু'টায় আমার হাতে এসেছে। আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যে তা' পড়া শেষ না ক'রে বইটা রাখ্‌তে পারলাম না। আমি সবটুকু অত্যন্ত আগ্রহ ও সতর্কতার সঙ্গে পড়েছি, মনে হ'ল অতীতের ঘটনাগুলো যেন আমার সম্মুখে কেউ চলচ্চিত্রের ছায়াছবির মত তুলে ধরছে। লেখকের বৈজ্ঞানিক মন, দৃষ্টিশক্তি আর সাহিত্যিক সুলভ মনোভাব ও অন্তর্দৃষ্টি ঘটনাগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে—ভুল হয়নি এতটুকু; যা সত্য তাই বলেছে, অতিশয়োক্তি নেই কোথাও। গুরুভক্তি তাকে অন্ধ করেনি, তার বর্ণনা ও আলোচনায় রয়েছে সংযম ও সত্যনিষ্ঠা। এভাবে বই লেখা সত্যি কঠিন। অসাধ্য সাধিত হয়েছে। এত কথা তার স্মরণে ছিল ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। মন নয়তো যেন ক্যামেরা, ধরে রেখেছে অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। ... চরিত্র গঠন ও সমাজসেবার আগ্রহে উদ্দীপ্ত করতে অনেক শিক্ষণীয় কথা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত আছে। ...

গ) বাংলাদেশ তাত্ত্বিক সংসদের সেক্রেটারী ডাঃ নজির উদ্-দীন (ফকিরা-পুল, ঢাকা) ঃ

... 'শিক্ষার মশালবাহী রবিউল করিম' বইখানা পড়লাম। বইখানি আমার পরিবারের প্রয়োজনে লক্ষ টাকার সওদা। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের সওগাতস্বরূপ বাংলাদেশের তথা বিশ্বের শিশুদিগকে উৎসর্গীত (১৯৭৯)। বইখানাকে আন্তর্জাতিক মানুষ গড়ার অনন্য শিক্ষণীয় দলিল হিসাবে গণ্য করা যায়। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সরকারী বেসরকারী চেষ্টায় এই বইখানি ছেপে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। ...

৯। **জ্ঞানের মশাল** (সংকলন-গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৮, প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৭৫)।

ক) দিনাজপুর হ'তে প্রকাশিত মাসিক নওরোজ, মে, ১৯৬৪ ঃ 'জ্ঞানের মশাল' নবীনদের জন্য লেখা, কিন্তু এতে প্রবীণদেরও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। ... শুরুতেই কোরআন পাকের অমূল্য বাণী, পরে অমূল্য হাদিস এবং তারপরে ছাহাবাগণের ও মণীষীগণের বাণী সংগ্রহ ক'রে বইখানাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নবীনদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ধাঁধাঁ ও তার উত্তর এবং শব্দ গঠন খেলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, জানা ভাল প্রভৃতি বিষয়ও 'জ্ঞানের মশালে' স্থান পেয়েছে। ... বইখানা প্রতি গৃহে রাখার উপযুক্ত।

খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গোলাম সাক্‌লায়েন (রেডিও কেন্দ্র রাজশাহী থেকে—২৯-৮-৬৫ ইং) ঃ

... মশাল যেমন আলো জ্বালিয়ে আঁধার সরিয়ে দেয় এবং চারিপাশকে আলোকিত ক'রে তোলে, তেমনি 'জ্ঞানের মশাল' তোমাদের মত কচি-কাঁচাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দেবে। ...

গ) সিরাজগঞ্জ হতে প্রকাশিত পাক্ষিক 'যমুনা' (২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) ঃ

... আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ডুবুরীর ন্যায় জ্ঞান-সমুদ্র হইতে টুকরা, টুকরা জ্ঞানের-মণি আহরণ করিয়া সকলকে উপহার দিয়াছেন। ... এই গ্রন্থে বহুবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং এইরূপ একটি সুখপাঠ্য অনুসন্ধিৎসা-মূলক জ্ঞানের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ... এই সংগ্রহে দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মহাত্মা লোকের বাণী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে উদার মনোভাব ও বিশ্বজনীন আবেদন ও মানুষ হিসাবে সমান মূল্যবোধ। ... সত্যই গ্রন্থকার 'জ্ঞানের মশাল' হস্তে আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করিতে সৎসাহসের সহিত অগ্রগামী। (ভাইয়া, তারার মেলা)।

১০। **আমাদের গ্রাম** (গবেষণা-গ্রন্থ ; পৃঃ ১৮০ প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৭৮)।

ক) বাংলা একাডেমীর (ভূতপূর্ব) মহাপরিচালক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ঃ

বইটি আপনার পরিশ্রমের সার্থক ফসল বলেই মনে করি। 'আমাদের গ্রাম' বইটি সকলেরই অনুকরণীয় ; বিধায় আপনি প্রশংসার দাবীদার। ...

খ) প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক আল্ কামাল আব্দুল ওহাব (মাসিক-বই, জানুঃ ১৯৭১) ঃ

যাঁরা গ্রামের কথা ভাবেন তাঁদের জন্য বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। ...

১১। 'রসায়নের তেলেসমাতী' (বিজ্ঞানের যাদু ; প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৭৫)।

ক) অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ (সরকারী আঃ হঃ কলেজ, বগুড়া) ঃ

'রসায়নের তেলেসমাতী' বইখানা বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান মেলার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ... বইটি ক্ষুদে বিজ্ঞানী ও ম্যাজিশিয়ানদের কাছে নিঃসন্দেহে আদর পাবে। ...

১২। বঙ্গাব্দ সমাচার (বঙ্গাব্দ সংস্কারের প্রস্তাবসহ ; প্রকাশ ঃ ১৫/৪/১৩৯৫)।

বাংলা কোন মাস কত দিনে, তার নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় গ্রন্থকার ১৯৫৬ সাল হ'তে বাংলা তারিখ বিভ্রাট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বৈশাখ হতে ভাদ্র পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন হতে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিনে এবং অতিবর্ষে (৪ দ্বারা বিভাজ্য বঙ্গাব্দে) চৈত্র মাস ৩১ দিনে গণনার প্রস্তাব করেন, ১৯৫৯ সালে প্রস্তাবটি জাতীয় সরকারের নিকট পেশ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কে সভাপতি ক'রে একটি উপসংঘ গঠন করেন (১৯৬৩)। তিন বৎসরকাল উপ-সংঘের সদস্যবর্গ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে ৫ই আষাঢ়, ১৩৯৫ (ইং ১৯/৬/১৯৮৮) গৃহীত বঙ্গাব্দ সংস্কার অনুমোদন করেন।

'বঙ্গাব্দ সমাচার' গ্রন্থটিতে বাংলা সালের জন্মকথা, বঙ্গাব্দ সরকারের প্রস্তাব ও সমর্থকবৃন্দ, বাংলা একাডেমীতে গৃহীত বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত, সরকারী অনুমোদন এবং বাংলা ইংরেজী তারিখের সমন্বয়কল্পে একটি নতুন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

●

পরিশিষ্ট—২

নামপঞ্জী

অধ্যাপক মজীদ কাদ্দরী ৯২
অরুণা ১৭, ১৯
আজিজুর রহমান ফিরোজী ৮
আজিজুল হক ১৫, ২২
আতিকুজ্জামান ৯
আদনান কাসু ৮৫
আদনান আল মোবারক ৯২
আনছার সেখ ৯৪
আনিসুর রহমান খসরু ডাঃ ১১
আবদেল কবির ইল্‌মহ ৯১
আব্দুল আজীজ মিয়া ৮, ৭০
আবু তাহের মিয়া ১০৩
আবুল হোসেন আলহাজ্ব ৯
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য ৭১
আব্রাহাম লিংকন ৩৯, ৪১
আব্দুর রশিদ মোঃ ৭, ১৫, ১৮
আব্দুর রহমান ৯২
আব্দুর রহিম মোঃ ৭, ১১
আব্দুল ইলাহ্‌ ৯১
আব্দুল মান্নান ৮
আব্দুল মোমেন চক্রবর্তী ৭১
আব্দুল লতিফ কাসু ৮৫
আব্দুল হাই ৮৬, ৯০
আব্দুল হাই মওলানা ২২
আব্দুল হামিদ শাহ্‌ ৬৩
আব্দুল্লাহ্‌ হাকিম ১০৩
আব্দুল্লাহ্‌ হাকিম মওলানা ১০৩
আব্দুল বাতেন জামাল আহমেদ ৯২
আলমগীর মহীউদ্দিন ৭
আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ৪৭
আলী আসগার ৭, ১৫
আশরাফুজ্জামান খান ১০৪
আশা ২৯
আহমেদ দীদাত ২৩
আব্দুর রহমান দিনাজী ৭১
আব্দুর রাজ্জাক মওলানা ১০৩
আব্দুস সোবহান ডাঃ ৬৯
ইউসুফ আখতার ২২
ইমাম ওয়ারিতদীন মোহাম্মদ ৯৪
ইমাম দাউদ ৯২
ইব্রাহীম বি, সাঈদ ৯২
ইয়াছিন আলী মাষ্টার ৬৯
উইলসন ৫০
উইলিয়াম টেল্ট ৩০
উইলিয়াম ডজ পারডো ৮৪
উমেদ আলী ৬৫
উসমান আবোভাট হাফিজ ৮৭, ৮৯
এনায়েতুল মনছুর ১০৩
এ, এম, আজহার ব্যারিষ্টার ১৫, ২
এ, এম, আব্বাস ব্যারিষ্টার ১৫,১৬
এডুইন অল্‌ড্রিন ৮২
এরিক ২৯
ওমর ২৯
ওয়াল্ট ডিজনী ৭৩
কর্ণেল গাদ্দাফী ৬৯
কলম্বাস ১১১
কাজী মতিউর রহমান ১০৩
কাজী শামসুর রহমান ৫৮, ৮৩
(ছরুকাজী)
কায়েদে আজম ১৬, ২১
কেলী ৮৪
খলিল ওয়াকার ৯২

খালেদা জিয়া বেগম ১০৩
খরশীদ জাহান ডেইজী ৬৫
খোরশেদ আলম (খুশী) ৯
গর্ডন কোপার এল ৮২
গুল্‌শান আরা,ডাঃ ১১
গোলাম নবী ২২
চার্লস কর্ণার্ড ৮২
চার্লস দ্বিতীয় ৫০
জর্জ ওয়াশিংটন ৩০
জর্জ বার্নাড শ' ৯৮
জন এস্‌পোসিটো অধ্যাপক ৯৪
জয়নুল আবেদীন মাহবুব ৮
জহিরুল আলম ১০৩
জহিরুল আলম (ডলার) ১০৩
জহরুল ইসলাম ১১
জাফ্‌রুল্লাহ্‌ ডক্টর ১৫
জাহানারা শরফুদ্দিন ৯
জাহিদ আলম আলহাজ্ব ৯
জাহিদ ৯
জিয়াউদ্দিন আহম্মদ ডাঃ ১০৩
জিয়াউর রহমান শহীদ ১০৩
জিল্লুর রহীম ডঃ ১০৪
জেড, এ, সুলেরী ২২
ডাঃ আব্‌দ-আল্‌ রহমান মামসা ৯০
,, ফিরোজা বেগম ৬৩
,, মণিরুজ্জামান ৭২
,, মুরাদ খান ঠাকুর ৭১, ৮০
,, মুরাদ ৮৩
,, মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী ৯১
,, রানু ৮৫
,, মোঃ সাঈফ (অপু) ৬৫
,, শাকিল আহমেদ ৮৬
,, শাকির এম, ডি, ১০৪
,, শাহ্‌ আবু বক্কার ৬৩
,, সৈয়দ খালিদ লতিফ ৭২, ৮৩
,, সিরাজুল ইসলাম আলহাজ্ব ৬৪, ৭০, ৮৩, ৯০
ডাঃ হাবিব সিদ্দিকী ১০৪
ডিউক অব ইয়র্ক ৫০
ডেভিড ডিউক ১০৮
তারেক ৭২
দানিয়েল লাইবাস ৯৩
দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ৯৪
নজরুল ইসলাম ৯, ৬৯
নাঈম মোহায়মেন ১০৬
নাছিম মোঃ ১০৩
নাজমা ৬৯
নাদিম ১৫
নাবিল ১১
নাসিমা খান ৯২
নাসির উদ্দিন আহমেদ ১০৪
নাসির উদ্দিন তরফদার ৬৮
নিয়ামতুল্লাহ্‌ রাজা ৯
নীল আর্মস্ট্রং ৮২
নূরুল আলম রইসী ৯৪
নূর মোহাম্মদ মিয়া ৬৯
নূরুল ইসলাম (দুলাল) ৭, ১১
নূরুল কবীর শিকদার ১০৩
প্রমথ নাথ বিশী ৮৬
পিয়াল ২৯
প্রেসিডেন্ট মিঁতেরা ১০৫
ফজলুর রহমান ২২
ফারুক বখ্‌ত চৌধুরী ১০৩
ফারুক আদম ৮৬
ফায়সাল সেত্তার উদ্দিন ৬৪
ফিরোজা বেগম ডাঃ ৬৩
বশির আহমেদ ৮৬
বশির মুহম্মদ ৯১
বাবু ১১
বিপ্লব ১১
বেইটা ড্রস্তি ৪০
বেগম বেলী ১৬
বেটি অ্যানে হানটিংটন ৮৪
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ৩৮

বেহজাদ বশির ৯১
ভিনসেন্ট জোসেফ ৯৪
মতিউর রহমান কাজী ১০৩
মফিজ-উল হক ৮
মহসীন আলী ৬৯
মহাত্মা গান্ধী ১৬
মরিয়ম লাহাজ ৯২
মহিদুল ইসলাম (মহিদ) ৯
মাইকেল কলিন্স ৮২
মাইকেল হাড্‌সন ডঃ ৯৩
মাজেদা আসগার ৯, ১৬
মারজুকী দারুসমান ১০৬
ম্যালিসা ৬৯
মাহমুদ হাসান খান ৯০
মাহ্‌বুবুর রহমান চৌধুরী ২২
মারভিন ডিমালী ৯৩
মিউরিক আহমেদ মওলানা ৯২
মিসেস ঠাকুর ৭১
মিসেস লতিফ ৭২
মেজর পিয়ারে চার্লস ৪৮
মেরিলী হোসেন ২৯, ৮৪
মোখ্‌লেছুর রহমান ডঃ ৭, ১৫, ২০
মোস্তফা হারুণ ৭
মোহাম্মদ আলী ক্লে ১০৪
মোহাম্মদ আলী খান সৈয়দ ৯২
রওশন এরশাদ ৬৫
রফিক ৯
রব ২৯
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ৩, ৭১
রডনি কিং ১০৫
রহমান আলী কসিম ৯১
রামনাথ বিশ্বাস ৮
রিয়াজ খান মোঃ ৯২
রুজভেল্ট ৫০
রুবিনা ১৬
রেবেকা ১৭, ১৯
শমশের আলী (হেলাল) ১০৩
শরীফুল আলম এস, এম, ৯, ২৯
শহীদ জিয়াউর রহমান ১০৩
শাকির মোহাম্মদ ডাঃ ১০৪
শাহজাহান মামুদ ৯২
শাহাদৎ আলম ৯
শেখ সুজা ২২
শেখ মোঃ খোরশেদ ১০৩
সওকত আলী ১০৩
সবুজ ১১
সাজিদ ৮৫
সাদী ৭১
সাদেকুল হক ৬৮
সানী ৭২
সাবিনা ১৬
সামী ৭১
সামী-উয-জামান ৮৭, ৯০
সালেহা ১৫
সুভ্‌লী হারশী মিল্টন ৩৫
সালমান ইসলাম ৮৫
সালমা ৮৬
সুলাইমান নিয়াং ডঃ ৯৩
সুলতান আহমেদ ২২
সুসান ৮৩
সেতার উদ্দিন অধ্যাপক ৬৪
সেলিম কোরায়শী ২২
সেলিম খানানী ৯০
সেলিম ৮৬
সোহ্‌রাব হোসেন মোঃ ২৯, ৪৪, ৪৯
সোহায়েল হাশমী ৯২
সৈয়দ জাফর ১০
হাফিজ আঃ রহমান প্যাটেল ৯১
,, সাব্বির আহমেদ বেহ্‌লীম ৭৫,
,, সাঈদ ১৪
হাবিব সিদ্দিকী ডাঃ ১০৩
হামিদুর রহমান ব্যারিষ্টার ২২
হামেদী কাদের ৯২
হাসান আল্ তুরাবী ডঃ ৯৩

হাসান মাহ্‌মুদ (সোহেল) ৯
হেনরী হাডসন ৫০
হেল্‌মস্‌ ১০৮
হেলাল চৌধুরী ১০৩

স্থানপঞ্জী

অরল্যাণ্ডো ৭৬
আন্দালুসিয়া ৩৬
আফগানিস্তান ১০০
আল্‌জিরিয়া ১০০
ইরাক ১০০
ইয়ার্ডলি ২৯
ঈজিপ্ট ১০০
উড্‌হাভেন ৪৪
এনাপলিস ৩৬
এলিস আইল্যাণ্ড ৬৭
ওয়াশিংটন ডি, সি, ৪৪
করাচী ২০
কলোম্বিয়া ৪৪
কিসিমি ৭০
গেটিসবার্গ ৩৮
গ্লেনফিওর্ড ৩৬
জার্মানী ১০, ১৯
জেনেভা ১৫, ১৭
ট্রেনটন ২৯
টেম্পা ৭৮
দোহা ১২
নায়েগ্রা ৭৬
পেনসেল্‌ভেনিয়া ৩০, ৪৪
পেনস্‌বাড়ী ৩৬
ফলসিংটন ২৯
ফ্রান্স ২০
ফিলিস্তীন ১০০
ফিলাডেলফিয়া ২৯, ৩২
ফেয়ারলেস হিলস্‌ ২৯
ফ্লোরিডা ৭০
বাল্টিমোর ৪৪
বার্মা ১০০
ব্রিমেন (জার্মানী) ১৫
বীচমণ্ড ৪৪
ব্রুকহাভেন ৪৪
ভার্জিনিয়া ৪৭
ভার্জিনিয়া এভিঃ ২৯
ভারত ১০০
মারীল্যাণ্ড ৪৪, ৪৭
লণ্ডন (১৩-২৮)
লং আইল্যাণ্ড ৪৯, ৬৫
লেকবুয়েনাভিস্তা ৮৯
লেবানন ১০০
শ্রীলঙ্কা ১০০
সানফ্রান্সসিস্কো ৫০
সুইজারল্যাণ্ড ১০
হারশী ৩৪
হ্যারিসবার্গ ৩৬
হিথ্রো ১২

বিষয় পঞ্জী

অঙ্গরাজ্য ১১৪
অপসংস্কৃতি ২৮
অভিষেক ১২৫
আয়কর ২৫
ইউনিভার্স্যাল ষ্টুডিও ৭৫
ইত্তেহাদুল মুস্‌লেমীন ১০০
ইসলামিক কমিউনিটি ১০৪
,, প্রোপাগেশন সেন্টার ২৩
,, সোসাইটি ২৪
,, সেন্টার ২৪, ১০৪
,, পার্টি অব বৃটেন ২৪
,, ষ্টাডিস সেন্টার ২৪
ইহুদী প্রভাব ১৩১
ইংরেজ শাসনের প্রভাব ২৭
উৎসব দিবস ১২৫
এ্যাম্ফেট্রান্যাট্‌স্‌ মেমোরিয়াল ৮২
ওকিং মস্ক ২৪

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ৪৯
ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮
ক্যামডেন ব্যুরো ১৬
ক্যাপিটাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি ৪৮
কংগ্রেসের ক্ষমতা ১২৯
ক্রীতদাসপ্রথা ৩৯
কেনেডি স্পেস সেন্টার ৮২
গ্রাম দর্শন ৩১
গুপ্ত সংস্থা ১২৮
গেটিস্‌বার্গ ভাষণ ৩৯
গেটরল্যাণ্ড জু ৮০
জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮, ৯৩
জনমত (পত্রিকা) ২৫
জাতিসংঘ ৪৯
ট্রাফালগার স্কয়ার ৯৯
ট্রেনটন মসজিদ ৩১
ডিজনী ওয়ার্ল্ড ৭৩
দি গার্ডেন অব আল্লাহ্‌ ৭৫
দৈনিক জনকণ্ঠ (ঢাকা) ১০২
,, দিনমান ১০৩
নতুন দিন ২৫
নতুন দেশ ২৫
নতুন রাজধানী ৪৭
নিউইয়র্ক টাইমস ১০২
নির্বাচন ১১৮
পাকিস্তান হাউস ১৫
প্ল্যানেটরিয়াম ১৭
পেনশন ২৭
বাকিংহাম প্যালেস ১৪
বাঙ্গালী সংস্থা ২৪
বাংলাদেশী মহিলা সমিতি ২৪
বুশ গার্ডেন ৭৮
বৃটেনের তথ্য ২৫
বিশ্ব-পরিবার ৫
বিশ্ব মুসলিম সংস্থা ১০০
বিশ্বশক্তি বলয় ১২৮
বিবিধ তথ্য ১৩১
বেকারভাতা ২৫
ভয়েস অব বাংলাদেশ ১০২
ভেরাজানা ব্রীজ ৪৯, ৫৭
মদপান ১২, ২৫
মাথাপিছু আয় ২৫
মার্টিন বেক থিয়েটার ৪৯, ৬২
ম্যাজিক কিংডম ৭৪
ম্যাডাম টুসাড মিউজিয়াম ১৭
মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান ২১
মেট্রোপলিট্যান মিউজিয়াম ৪৯, ৬০
রিজেন্ট পার্ক ১৬
রীডম্যান কার ৩১
লাগারডিয়া ৭৬
শিক্ষাব্যবস্থা ২৪
শিশুপার্ক ৩২
ষ্ট্যাচু অব লিবার্টী ৪৯, ৬৫
ষ্টেট মিউজিয়াম ৩৬
ব্রুসউইক মসজিদ ৪৯
স্বাধীনতা যুদ্ধ ১১৩
সী-ওয়ার্ল্ড ৭৪
সুরঙ্গপথ ১৯
সুরমা (পত্রিকা) ২৩, ২৫
সেন্ট্রাল পার্ক ৫৯
সাপ্তাহিক পত্রিকা ঃ
,, ঠিকানা ১০২
,, প্রবাসী ১০২, ১০৯
,, বাঙ্গালী ১০২
হাইড পার্ক ১৪
হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮, ৯২
হামারা ওয়াতন ১৫
হারশী চকলেট ৩৪
হ্যাকনি টাউন হল ২৯
হোয়াইট হাউস ৪৬

গ্রন্থ-সমালোচকদের নামপঞ্জী ঃ

আ. খ. ম. গোলাম মোস্তফা ১৯২
অব্দুল আজিজ খান ১৯২
আবুল কালাম আজাদ অধ্যাপক ১৯৯
আব্দার রশিদ অধ্যাপক ১৯৪
আব্দুল খালেক ডঃ ১৯০
আমীনুদ্দীন শাহ্ ১৯৫
আল্ কামাল আব্দুল ওহাব ১৯৯
আশরাফ সিদ্দিকী ডঃ ১৯৮
এ, কে, এম, আব্দুল আজীজ ১৮৯
এম, মোসলেম আলী অধ্যাপক ১৮৯
এম, এ, মান্নান ১৯২
এম, এ, সাত্তার অধ্যক্ষ ১৯৬
এম, এ, সামাদ অধ্যাপক ১৯৩
কবি রোস্তম আলী কর্ণপুরী ১৯০
কে, এম, শমশের আলী কবি ১৯৪
কেরামত আলী মোঃ ১৯৭
খন্দকার খলিলুর রহমান অধ্যাপক ১৯৩
গোলাম সাকলায়েন ডঃ ১৯৮
দুলাল চৌধুরী ডঃ ১৮৮
নজির উদ্দীন ডাঃ ১৯৮
নূরুল হক টি, কে, ১৯৩
প্রফেসার আবুল হোসেন ১৯০
প্রিয়তোষ মৈত্রেয় ডঃ ১৯১
প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ১৮৯, ১৯৭
ফজলুর রহমান এ্যাডভোকেট ১৯৭
মতিউর রহমান অধ্যাপক ১৯৫, ১৯৬
মনসুর উদ্দিন অধ্যাপক ১৯৪
মাযহারুল ইসলাম ডঃ ১৮৮
মুফাখখারুল ইসলাম কবি ১৯৪
মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্ ১৮৮
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৮৮
মুরশিদুল ইসলাম আল্হাজ্ব ১৯৫
শামসুল হক কোরায়েশী ১৯৫
শেখ সালেহ আহ্মদ ১৯১
সমর পাল ১৯২
সফিউদ্দিন সরদার ১৯০
সানাউল্লাহ্ নূরী ১৮৮
সালাউদ্দিন পাঠান ১৯২
সৈয়দ মুর্তজা আলী ১৮৯

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

১। পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য ১২৫·০০
২। চট্টলবিলের ইতিকথা ১০০·০০
৩। চট্টলবিলের লোকসাহিত্য ৩০·০০
(বাংলা একাডেমী প্রকাশিত)
৪। দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া ৭৫·০০
৫। হজ্বের সফর ২৫·০০
৬। পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী ২৫·০০
৭। জ্ঞানের মশাল (২য় সংস্করণ) ২৫·০০
৮। কর্মবীর সেরাজুল হক ২৫·০০
৯। শিক্ষার মশালবাহী রবিউল করিম ১৫·০০
১০। পল্লীকবি কারামত আলী ১০·০০
১১। বঙ্গাব্দ সমাচার ১০·০০
১২। আমাদের গ্রাম ১০·০০
১৩। রসায়নের তেলেসমাতী ১০·০০
১৪। Degree pract. chemistry ৩৫·০০
১৫। Intermediate chemistry ১৮·০০
(Q. A.)
১৬। উঃ মাঃ ব্যবহারিক রসায়ন ৩২·০০
১৭। অবিস্মরণীয় প্রাণ (সম্পাদিত) ২০·০০
১৮। পল্লী শিক্ষক ,, ১৭·০০

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। আমাদের দেশ, পৈলানপুর, পাবনা (বাংলাদেশ)।
২। সাদেক বুক ডিপো, ১৮২, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা—১২০৫
৩। মদীনা প্রকাশনী, ৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা—১১০০
৪। কামরুল প্রকাশনী, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম—৪০০০
৫। আনজুমন বিপনী, ১৫৫, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম—৪০০০
৬। মেসার্স বুক ম্যান, ১৯৩ বিপনী বিতান (২য় তলা) চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম।
৭। খুলনা নিউজ কর্ণার, ২৫, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।
৮। ফারুক লাইব্রেরী, মালোপাড়া, রাজশাহী।
৯। তৌফিক বুকএণ্ড পেপার হাউস, পাবনা।
১০। ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ষ্টেশন রোড, সিরাজগঞ্জ।
১১। মুসলিম বুক ডিপো, ৩, আকবরিয়া মার্কেট, বগুড়া।
১২। কিশোর লাইব্রেরী, কাচারী রোড, নওগাঁ।
১৩। পুথিমেলা, ঢাকা রোড, নাটোর।
১৪। রফি বুক হাউস, সিংড়া, (নাটোর)।
১৫। চলনবিল বুক ডিপো, চাঁচকৈড়, থানা গুরুদাসপুর, (নাটোর)।

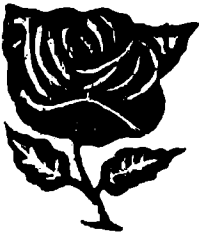

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

সেন্ট পল ক্যাথাড্রল, লন্ডন।

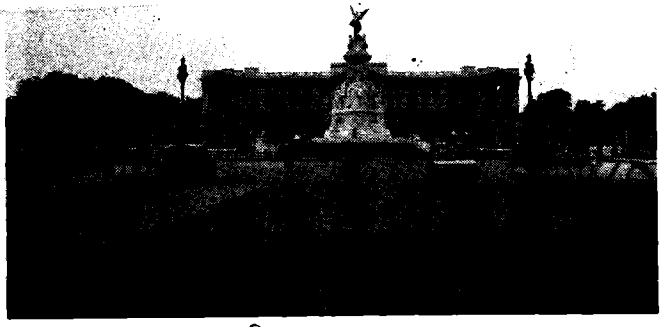

বাকিংহাম প্যালেস, লন্ডন

টাওয়ার ব্রীজ, লন্ডন।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

ব্যারিষ্টার আব্বাসের বাস ভবন
পাকিস্তান হাউস, লন্ডন ।(পৃঃ ১৫) ।

বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন ।(পৃঃ ১৭)

ব্যারিষ্টার আব্বাসের মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান,
য্যাকনি টাউন হল, লন্ডন ।(পৃঃ ২১)

উক্ত মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত
অধ্যক্ষ সরদার এম, এ হামিদ ।(পৃঃ ২২)

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রীজ, লন্ডন।

লন্ডন টাওয়ার।

ষ্ট্যাভিষ্টক স্কয়ার পার্কে
মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তরমূর্তি।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

রাজধানী ভবন ওয়াশিংটন ডি.সি.

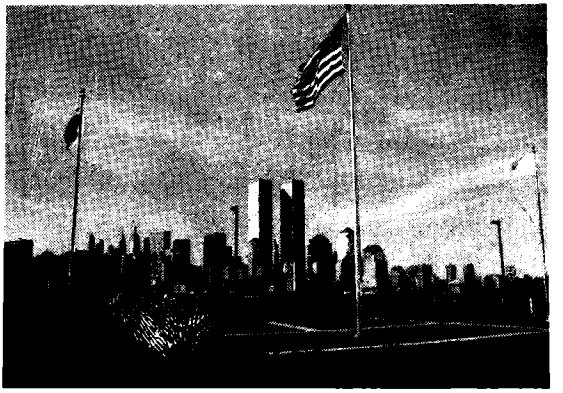

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নিউইয়র্ক। ১১০ তলা ভবনদ্বয়

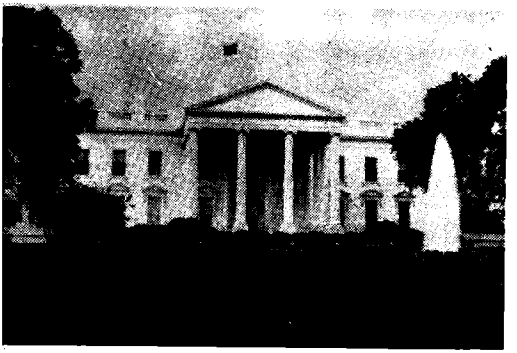

হোয়াইট হাউজ (আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ভবন)।

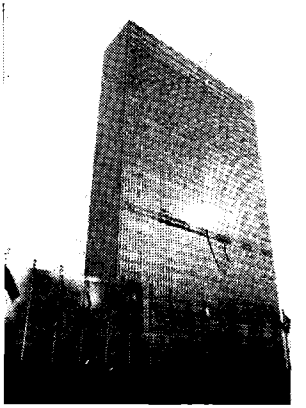

জাতিসংঘ ভবন, নিউইয়র্ক।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

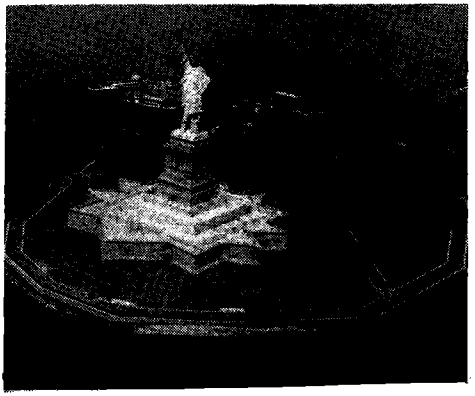

ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি, নিউইয়র্ক (পৃঃ ৬৫)।

জাতিসংঘ ভবনের গেটের মূর্তি, নিউইয়র্ক। (পৃঃ ৫১)

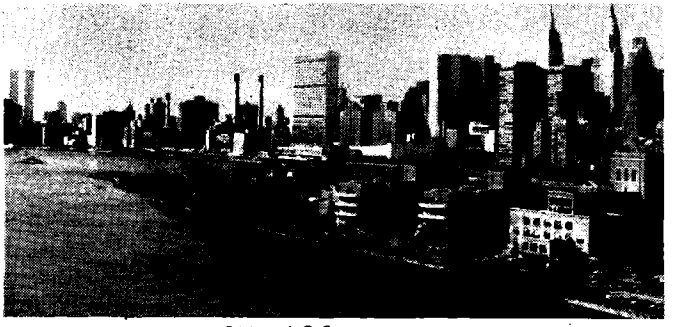

নিউইয়র্ক সিটির একাংশ।

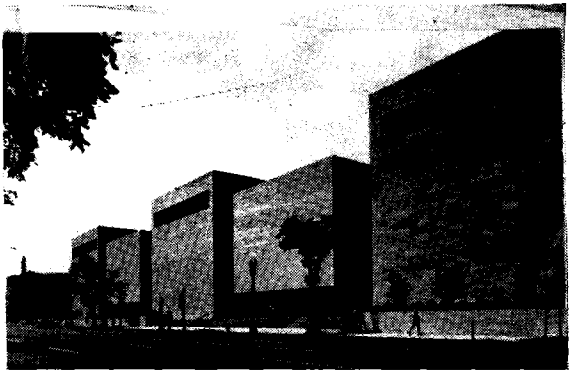

এয়ার স্পেস মিউজিয়াম, ওয়াশিংটন ডি, সি,

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

ইসলামিক আর্ট মেট্রোপলিট্যান মিউজিয়াম. নিউইয়র্ক (পৃঃ ৪৯)।

সৈন্যদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ, গেটিসবার্গ। (পৃঃ ৩৮)

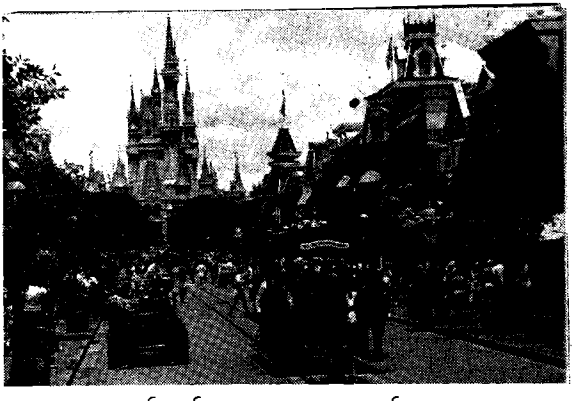

ম্যাজিক কিংডমে প্রবেশপথ, ফ্লোরিডা

স্বাধীনতা উৎসবের দৃশ্য. ফিলাডেলফিয়া।

জাতিসংঘের ডেলিগেট প্রবেশপথ।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

আটলান্টিক সমুদ্রসৈকতে, স্মার্না, ফ্লোরিডা (পৃঃ ৮৪)

সেন্ট্রাল পার্ক, নিউইয়র্ক। –পৃঃ ৫৮
ছরু কাজী ও স্কুলের শিশুদের সঙ্গে

ডিজনী ওয়ার্ল্ডে মনোরেল, ফ্লোরিডা পৃঃ ৭৩

ইমিগ্রেশন মিউজিয়াম (পৃঃ ৩৬)
এলিস আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক

বুশ গার্ডেন, টেম্পা। পৃঃ ৭৮

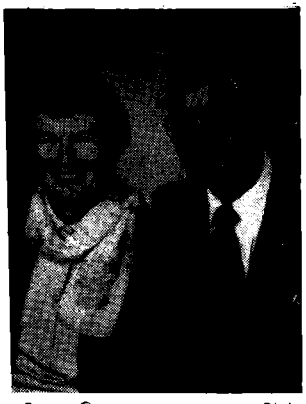

মিঃ ও মিসেস পারভো (পৃঃ ৮৪)।

তৃতীয় ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার সোহরাব হোসেনসহ লেখক (পৃঃ ২৯)।

বেগম শরীফ (মালেকা পারভিন) ও পিয়ালসহ (পৃঃ ২৯)।

ডাঃ ফিরোজা বেগম, তার মাতা, ছেলে ও জামাতাসহ (পৃঃ ৬৪)

ইঞ্জিনিয়ার সোহরাব হোসেনের তিন পুত্রের সঙ্গে (পৃঃ ২৯)।

৫ম ভ্রাতা শরীফুল আলম (কোলে পুত্র পিয়াল) ও অতিথিদের সঙ্গে (পৃঃ ৬৮)।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম নিউইয়র্ক (পৃঃ ৬০)

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ি মাউন্ট ভারনন।

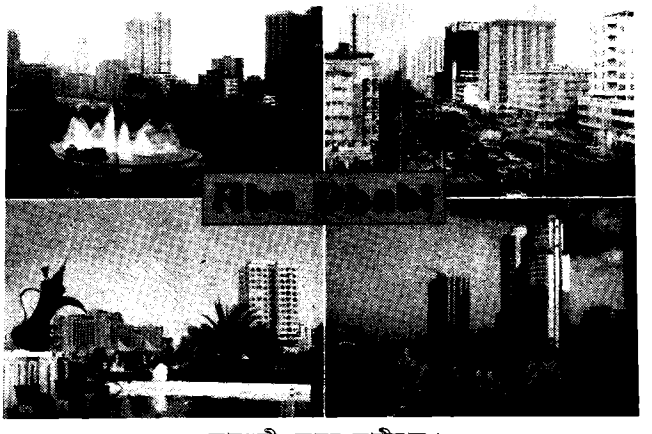

আবুধাবী, আরব আমীরাত।

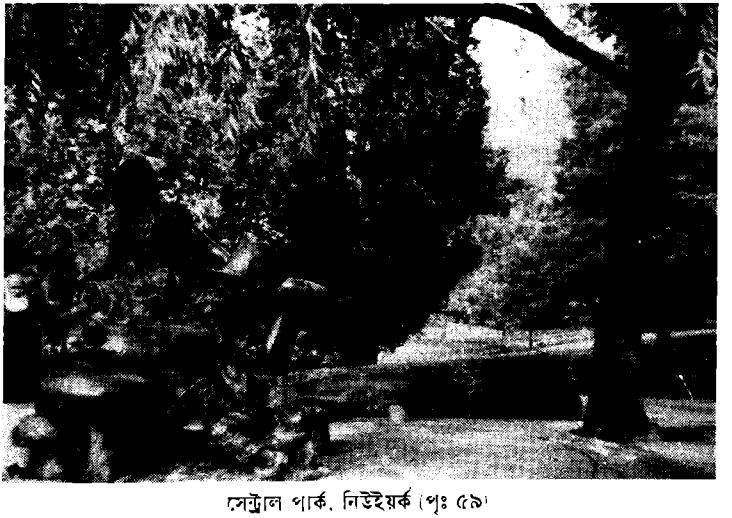

সেন্ট্রাল পার্ক, নিউইয়র্ক (পৃঃ ৫৯)

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

গেটরল্যান্ড, অরল্যান্ডো
(কুমীরের চিড়িয়াখানা) (পৃঃ ৮০)।

ক্রোকোডাইল জু (Zoo), অরল্যান্ডো পৃঃ ৮১।

বুশ গার্ডেন, এরোপ্লেন খেলনা পৃঃ ৭৮।

জাম্পারু শো (কুমীরকে খাওয়ানো) পৃঃ ৮১

কুমীরের দাঁতের গেট (প্লাষ্টিক নির্মিত)।

ডলফিন শো, সী—ওয়ার্ল্ড (পৃঃ ৭৪)।

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

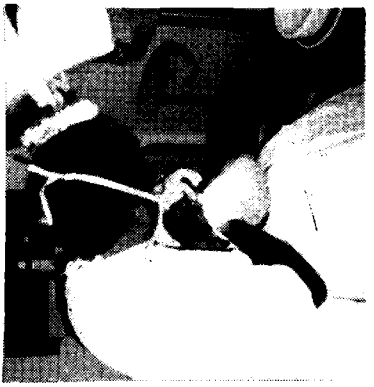

ডাঃ মুরাদ খান ঠাকুর
(লেখকের দাঁত তুলছেন) (পৃঃ ৭১)

ডাঃ মুরাদ ও তাঁর পরিবারবর্গ (পৃঃ ৭৮)

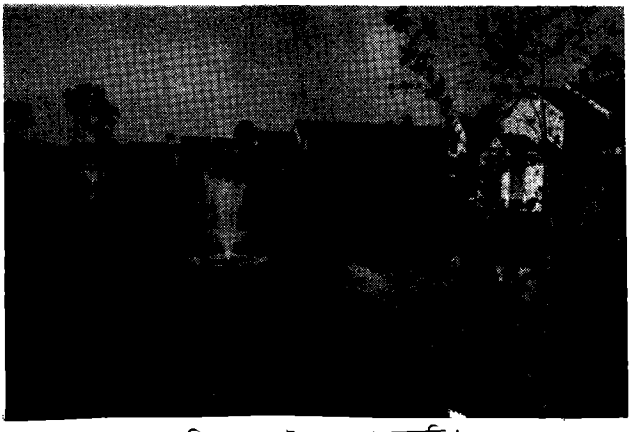

কেনেডি স্পেস সেন্টার, কেপ কেনেডি।

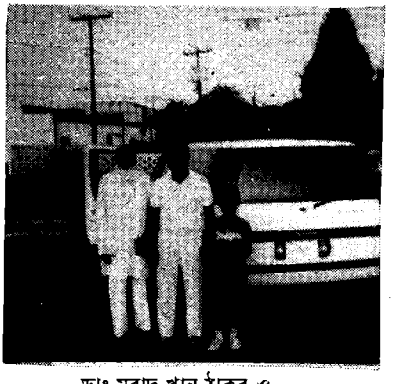

ডাঃ মুরাদ খান ঠাকুর ও
তাঁর পুত্র সামীসহ (পৃঃ ৭১)

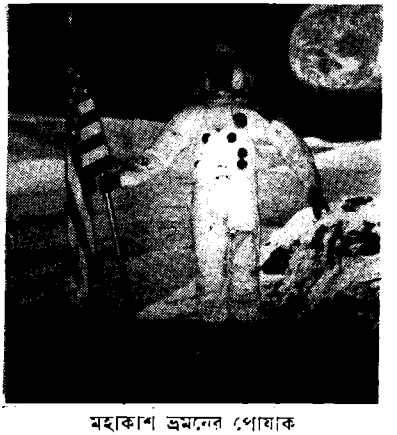

মহাকাশ ভ্রমনের পোষাক
পরিহিত (লেখক)

পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

পরিবার পরিজন সহ প্রেসিডেন্ট লিংকন এবং
পাশে প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন

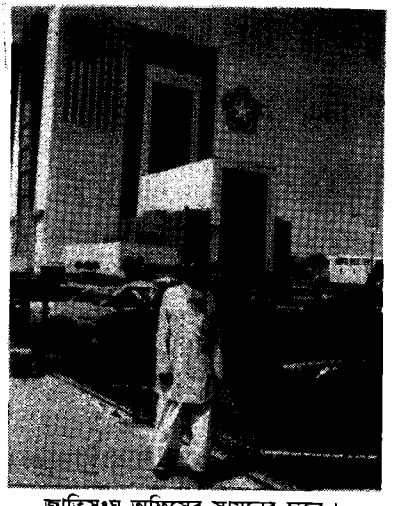

জাতিসংঘ অফিসের সামনের চত্বর।

মহসীন আলীর ছেলে মেয়ে (পৃঃ ৬৯)

মেহমানদের সঙ্গে লেখক

নায়েগ্রা জলপ্রপাত নিউইয়র্ক পৃঃ ৭২

ডাঃ সিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সালমান (কোলে) ও আদনান কাসু। (সালমানের বন্ধু)।

ছোটভাই ডাঃ সিরাজের সঙ্গে নায়েগ্রা জলপ্রপাতে

পঞ্চম ভ্রাতা শরীফুল আলমের সঙ্গে পৃঃ ৯

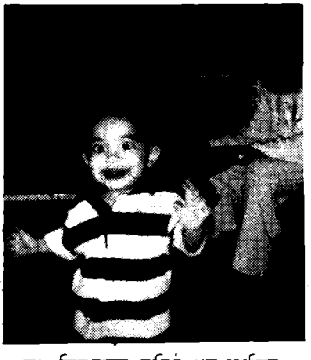

ডাঃ সিরাজের কনিষ্ঠ পুত্র সাজিদ।

ছবু কাজী, সুসান, আদিল ও ডাঃ সিরাজ (নিজ বাসায়)

বুশ গার্ডেনের কয়েকটি পাখীঃ

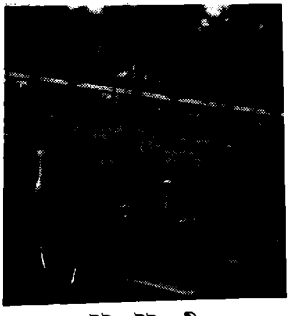

উটও উটপাখী

বকজাতীয় এক প্রকার পাখী

ফ্লেমিংগো

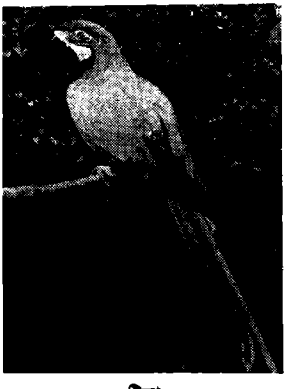

টিয়া

একদল ফ্লেমিংগো

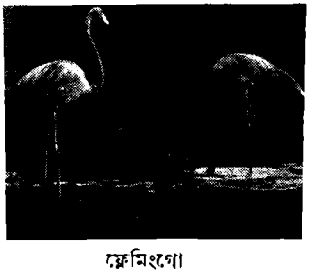

ফ্লেমিংগো

পাখীর খেলা

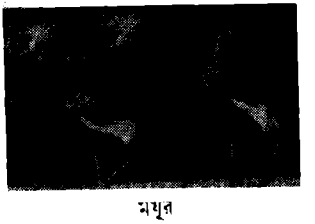

ময়ূর

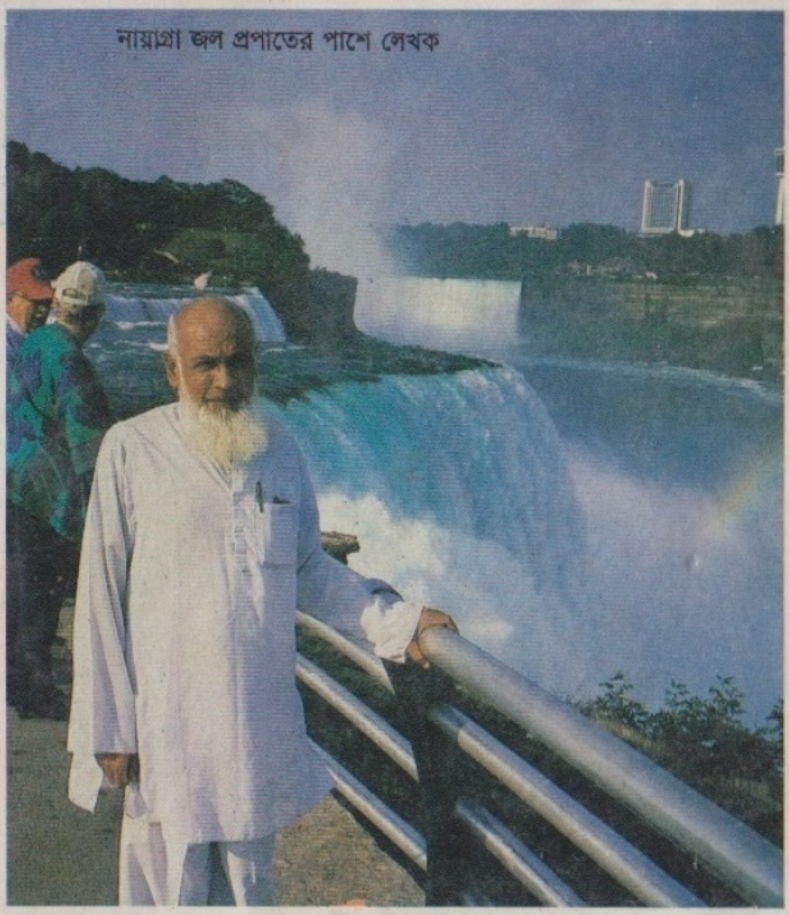

নায়াগ্রা জল প্রপাতের পাশে লেখক

সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

উত্তর বঙ্গের চলনবিল ও তার আশে পাশের কয়েকটি জেলায় সাহিত্য, শিল্প ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে নিবেদিত এই মহান ব্যক্তি ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া সাঙ্গ (রসায়ন শাস্ত্রে এম,এস-সি) করে ১৯৫৩ সালে পেশাগত জীবন শুরু করেন। জীবনের সিংহভাগই তিনি অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৬টি। তিনি বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা, সাংবাদিকতা ও লন্ডনের Our Home পত্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ শামসুজ্জোহা প্রতিবাদে একদা তিনি "তঘমায়ে খেদমত" খেতাব বর্জন করেন। তিনি অনেক স্কুল, মাদ্রাসা, ক্লাব, পাঠাগার, কলেজ ইত্যাদির পত্তন করেন, যা তার জীবনের অম্লান স্মৃতি হয়ে আছে। বেশীর ভাগ সময় তিনি সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, রংপুর, পাবনা, বগুড়া ও যশোহর অঞ্চলের কলেজসমূহে অধ্যাপনা করেন। তিনি বাংলা একাডেমী এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের আজীবন সদস্য, চলনবিল উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি এবং তাঁর প্রস্তাবিত "বঙ্গাব্দ সংস্কার" বাংলা একাডেমী ও তৎকালীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ এম, এ, হামিদ খ্যাত এই ব্যক্তি তাঁর নিজের এলাকায় সাহিত্য, শিল্প বা সমাজসেবামূলক কাজের ব্যাপারে যে কোন ডাক এলে এই বয়সেও সমান উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গত ১৯৯১ সালে তিনি পাশ্চাত্য দেশ তথা মার্কিন মুল্লুকে ভ্রমণ করেন, তারই ফসল হচ্ছে এই "পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থটি। তথ্য ও বর্ণনায় একটি উপাদেয় বই। ইতিপূর্বে তিনি অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের ওপর "দেখে এলাম অষ্ট্রেলিয়া" প্রকাশ করেন। আজ ৬৪ বছর বয়সেও তিনি একজন প্রানবন্ত যুবক। তাঁর জ্ঞান, মেধা, কর্মপদ্ধতি অবলোকন করলে স্বভাবতই মনে হয় তিনি উত্তর বঙ্গের একটি চলমান ইনষ্টিটিউশন। তাঁর সত্যাশ্রয়ী, শিক্ষাব্রতী ও কল্যাণকামী জীবন সম্পর্কে যতই বলা হবে, মনে হয় আরো কিছু বলার আছে। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

—মোস্তফা হারুণ